বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

তৃতীয় খণ্ড

[পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান]

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম, বি. এস-সি., টি. ই. এন্ড ডব্লু
এস. বি. সি. এস. (Eng—Tele Com) প্রেসিডেন্ট পুরস্কার
প্রাপ্ত, এ্যাসোশিয়েশন ফর ওভার সিজ টেকনিক্যাল স্কলারশিপ
জাপান, স্থায়ী সদস্য, এশিয়ান ষ্টুডেন্টস এন্ড কালচারাল
অর্গানাইজেশন টোকিও, (জাপান)। বিজ্ঞান না
কোরআন? বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ১ম, ২য়,
৩য়, ৪র্থ খণ্ড, জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ) পৃথিবী
নয় সূর্য ঘোরে, মানব জাতির মুক্তির
পথ, সর্ব ধর্মে বেহেশ্‌ত দোজখ,
রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ্,
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

মম প্রকাশ

www.pathagar.com

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০০৪
প্রকাশ কাল ঃ জুন ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ রফিক উল্যাহ

মম প্রকাশ ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে এ. জেড. এম. তৌহিদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষরবিন্যাস জীবন কম্পিউটার, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ১৭০ টাকা

ISBN : 984-8418-16-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মা

মরহুমা হালিমা খাতুনের

রূহের মাগফেরাতের

উদ্দেশ্যে—

[লেখক]

www.pathagar.com

"আমার কথা প্রচার কর লোকদের মধ্যে, উহা একটি বাণীই হউক না কেন, আর যদি বনি ইস্রাইলদের তৌরাতের (ঘটনা) বর্ণনা কর তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু যে কেহ আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলিবে- সে যেন নিজের স্থান অনুসন্ধান করে দোযখে।"

[আলহাদিস—সহীহ বুখারী (তজরীদ) হাঃ নং-৯৭/৬৮। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ]

"তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা কর এবং যেখান হইতেই তুমি উহাকে গ্রহণ কর না কেন তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই।" (হাদিস)

"আমি তোমাদের মধ্য হইতে এরূপ রসুল প্রেরণ করিয়াছি- যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তোমাদিগকে নির্মল করে এবং গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যাহা অবগত ছিলে না তাহা শিক্ষা দান করে।" (কোরআন)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পদার্থবিজ্ঞান

বিষয়	পৃষ্ঠা
আলোর ধর্ম	১০
আলোর গতি ও প্রয়োজন	১১
আলোর উৎস কি	১১
নিরাজ	১৪
হযরতের দেহে কি অস্ত্রোপচার হয়েছিল	১৭
হযরত কিসের সাহায্যে নভোভ্রমণ করেছিলেন	১৮
সময়ের প্রশ্ন	২০
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত	৩১
সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ	৩৪
সৃষ্ট জীবের জোড়া	৩৫
লোহা ও আত্মায় মরিচা ধরে	৩৯
আমাদের কথা রেকর্ড হচ্ছে	৪২
বিচারের দিন আমাদের কার্য দেখানো হবে	৪৩
জড় দেহে প্রাণ	৪৫
পৃথিবী স্থির	৪৮
সৃষ্টি তত্ত্ব	৫০
বায়ু প্রবাহ	৫২
রসায়নবিজ্ঞান	৫৯

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)	৮০
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়ক	৮৩
রাষ্ট্রের উৎপত্তি	৮৬
ইসলামী মতবাদ	৮৮
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৯১

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
নেতার প্রয়োজন ---- ---- ----	৯৭
রাষ্ট্রপতির কর্তব্য ---- ---- ----	৯৯
সুবিচার ---- ---- ----	১০২
রাষ্ট্রপতি ও বিচারকের বিচার ---- ---- ----	১০৭
ন্যায়বিচারক মুহাম্মদ (দঃ) ---- ---- ----	১০৯
সাম্য ও স্বাধীনতা ---- ---- ----	১১৯
সৃষ্টি পদ্ধতিতে সাম্য ও অসাম্য ---- ---- ----	১১৯
হযরতের (দঃ) দৃষ্টিতে সাম্য ও অসাম্য ---- ----	১২১
স্বাধীনতা ---- ---- ---- ----	১২৮
হযরত মুহাম্মদের (দঃ) আন্তর্জাতিক চুক্তি ---- ----	১৩০
যুদ্ধ পরিচ্ছেদ ---- ---- ---- ----	১৩৩
কোন পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (দঃ)কে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হয়েছিল ----	১৩৩
মদিনার পথে হযরত ---- ---- ----	১৪১
যুদ্ধ কি প্রয়োজন ---- ---- ----	১৪৭
যুদ্ধ কি শান্তি আনে ---- ---- ----	১৪৯
পূর্বের নবীরা কি যুদ্ধ করেছেন ---- ---- ----	১৫১
হযরতের (দঃ) জীবনে প্রধান প্রধান যুদ্ধের ফলাফল কি ----	১৫২
বদর যুদ্ধ ---- ---- ----	১৫৩
বদর যুদ্ধের ফলাফল ---- ---- ----	১৫৯
ওহোদের যুদ্ধ ---- ---- ----	১৬১
ওহোদ যুদ্ধের ফলাফল ---- ---- ----	১৬৮
হুদায়বিয়ার সন্ধি ---- ---- ----	১৭১
ধর্ম প্রচারক মুহাম্মদ (দঃ) ---- ---- ----	১৮৪
মক্কা বিজয় ---- ---- ----	২০২
বিদায় হজ্বের বিদায় বাণী ---- ---- ----	২০৪

www.pathagar.com

সূচনা

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকবৃন্দ কতটুকু আনন্দ পেয়েছেন জানি না। এ মহানবীর জীবন ইতিহাস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব যে ধরার ক্ষমতা কারো নেই। মহাসাগরের অভ্যন্তরে কি লুকিয়ে আছে- মহাকাশের মাঝে কত কোটি তারকা জ্বলছে ও গ্রহ নক্ষত্র ছুটাছুটি করছে এ হিসাব দেবার সাধ্য কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ঋষি-মণীষীরই নেই। তবু সাধনা চলছে, অসীমের সন্ধানে ছুটছে অজানাকে জানতে ও বুঝতে। ঠিক অনুরূপ মনোভাব নিয়েই পথ ধরলাম- সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, বৈজ্ঞানিকের জনক, সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটনকারী, পয়গম্বর শিরোমনি হযরত মুহাম্মদের জীবনের দু-একটি কথা লিখতে। প্রথম খণ্ডে লিখেছি সমাজবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান। দ্বিতীয় খণ্ডে যৌনবিজ্ঞান (নর-নারীর সৃষ্টি রহস্য)। তৃতীয় খণ্ডে লিখতে চেষ্টা করেছি- আকাশ-বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

আকাশ-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ- 'আলমিরাজ'। অর্থাৎ মহাকাশ-ভ্রমণ। ইতিপূর্বে হযরত মুহাম্মদের (দঃ)-এ মিরাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। যুগে যুগেই হবে এবং এ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিয়ে বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই। মুসলমানদের মধ্যেই অনেক লেখক অবিশ্বাসী বিজাতীয়দের কঠিন প্রশ্নের কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারবেন না ভয়ে আল-মিরাজকে স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সম্পন্ন হয়েছে বলে লিখেছেন। কেননা তাঁরা কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন নি- কিভাবে মাত্র ৫ ঘণ্টা সময়ে কোটি কোটি মাইল পার হয়ে এক একটি আকাশের দূরত্ব পাড়ি দিয়েছেন এবং সপ্ত আকাশ যা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তা কিভাবে একটি রাত্রির কিয়দংশে অভিযান করা সম্ভব হয়েছে। এ বইটিতে বাস্তব প্রমাণে চেষ্টা করেছি এর সমাধান দিতে।

আর একটি কঠিন প্রশ্ন অবিশ্বাসীদের নিকট হতে মেলে যে হযরতের দেহ ছিল মাটির উপাদানে তৈরি যা হযরত নিজেই ব্যক্ত করেছেন। মাটির মানুষ কিভাবে বিদ্যুতের তৈরি 'বোরাকের' সাহায্যে অভিযান করেছেন? কিভাবেই বা তা সম্ভব?

বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক (নীল আর্মষ্ট্রং এডুইন প্রভৃতি) চাঁদে অভিযান করে আকাশ ভ্রমণ যে সম্ভব সাধারণ মানুষের পক্ষে- তা প্রমাণ করেছেন।

তাদের দেহ যদি আকাশ ভ্রমণের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে তবে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) পক্ষে কেন তা সম্ভব হবে না তার যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেছি বৈজ্ঞানিক প্রমাণে। তাঁর হৃদয় চিরে কিভাবে তা নির্মল করা হলো কার আদেশে,- কোন্ শক্তিশালী বস্তু এ হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে তাঁকে সপ্তাকাশ ভ্রমণের উপযোগী করা হলো তার যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেছি এ ক্ষুদ্রজ্ঞানে।

পদার্থবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে থাকবে আরও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। হযরত মুহাম্মদের অঙ্গুলি নির্দেশে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত, সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা বর্তমান ও অতীতে কোন বৈজ্ঞানিকের দ্বারাই সম্ভব হয় নি। এ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এই বলে- "হে মানব ও জ্বেন সম্প্রদায়! যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও,- তবে অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা ঐ আধিপত্য অতিক্রম করিতে পারিবে না।" (৫৫ ঃ ৩৩)

একমাত্র আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসুলদের এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁরা যুগে যুগে এরূপ ঘটনাসমূহ করে দেখিয়েছেন। হযরতের মহাবানী হতেও এ তত্ত্ব আমরা জানতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ

"আল্লাহপাক আমার অন্তরে এক অনুগ্রহের জ্যোতি নিঃক্ষেপ করেছেন। আর আমি

www.pathagar.com

এতে অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করলাম। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে এর সব তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম।"

অলক্ষে থেকে কোন্ মহাশক্তি হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) এ অপরূপ ক্ষমতা দিয়েছেন তা আমরা দেখব এ বইখানি হতে। এ পরিচ্ছেদে আরও থাকবে 'আত্মার' বিবরণ। কোথা হতে এসেছে, কার ইশারায়। কার কাছেই বা আবার ফিরে যাবে। আত্মা কি তবে একটা পৃথক পদার্থ?

কথা ও কার্যপ্রণালী বিনিষ্ট হয় না। প্রতিনিয়তই রেকর্ড হচ্ছে। বর্তমানে আবিষ্কৃত টেপ-রেকর্ডার ও টেলিভিশন যেমন কথা ও ছবি অক্ষতভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে তেমনি রোজ হাশরের বিচার দিনে মানুষের সব কার্যবিধি প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ সত্যের কোন ভুল নেই। এ ছাড়া এ পরিচ্ছেদে আরও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি- 'জড় দেহে প্রাণ'- পৃথিবী স্থির'- প্রভৃতি আলোড়নকারী তত্ত্ব।

বইটির শেষ পরিচ্ছেদ- 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান'। কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) একটি রাষ্ট্রের পত্তন করলেন- নবী হয়ে কেন তাঁকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল এর ঐতিহাসিক পটভূমি। যুদ্ধ আল্লাহর নির্দেশ কিনা?- যুদ্ধ কি প্রয়োজন?- পূর্বের নবীরা যুদ্ধ করেছেন কিনা এসব প্রশ্নের জবাব। এ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের যুগ-যুগের জন্য কি থিওরী দিয়ে গেলেন,- সাম্য ও স্বাধীনতার কি দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন,- রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চরিত্র কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তা দেখাবার সামান্যতম প্রয়াস পেয়েছি, সত্যধর্মের পত্তন বদর যুদ্ধের কারণ, এর ফলাফল, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের জয় না পরাজয়?- এসব জটিল বিসয়ের উপর আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। সফলকাম কতটুকু হয়েছি জানি না। বিজ্ঞান বিভাগে চাকরি করেছি। বিজ্ঞান নিয়েই গবেষণা। তবুও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করি। এ হিসাবে দায়িত্ব মনে করেই সামান্য কিছু ধ্যান-ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি। আর পাশাপাশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরতের (দঃ) রাষ্ট্রপরিচালনা, তাঁর সুমহান চরিত্র, নাগরিকদের প্রতি মায়া দয়া, দান, শিক্ষা, ভরণপোষণের দায়িত্ব কিভাবে স্কন্ধে নিয়েছিলেন— তা দেখাবার সামান্যতম প্রেরণা দিতেই এ প্রচেষ্টা। বইটির তৃতীয় সংস্করণ বাংলাদেশ ও প্রথম সংস্করণ ভারত-এ নতুন কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করা হলো– (১) হোদায়বিয়ার সন্ধি ও এর প্রতিক্রিয়া (২) সুবিচার (৩) ন্যায়বিচারক মুহম্মদ (দঃ) (৪) ধর্মপ্রচারক মুহাম্মদ (দঃ) (৫) মক্কা বিজয় (৬) বিদায় ভাষণ ইত্যাদি। জ্ঞান-বিজ্ঞানী, ওলি, গউস, শিক্ষক ও সাধকদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে চললাম পথে। ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে আমাকে সংশোধনের পরামর্শ দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

'আল্লাহ আলীমুল হাকিম।'

[লেখক]

ঠিকানা ঃ
মুহাম্মদ নুরল ইসলাম
সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, অয়ারলেস (অবঃ)
'অবকাশ'
লতিফপুর কলোনী
পো+জেলা—বগুড়া
বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পদার্থবিজ্ঞান

নতুন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে, নতুন আবিষ্কারের পথ নির্দেশ করে, নতুন সংযোজনার পন্থা নিরূপণ করে একটা জাতিকে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে তুলে দেওয়া যায়। বিজ্ঞানের অভিনব অভিযানের পূর্বে মানুষ চাঁদে যাওয়া দূরের কথা এক দেশ হতে অন্য দেশে গিয়ে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করবার চিন্তা পর্যন্ত করতে পারত না। তাদের যান ছিল আল্লাহর দেওয়া দু-পা, শকট ছিল গরুর গাড়ি, উটের পিঠ, ঘোড়ার পিঠ, গাধার পিঠ, নৌকা ইত্যাদি যা ব্যবহার করে ঘণ্টায় দু-মাইল থেকে তিন মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। মোটর, ট্রেন, বাস, উড়োজাহাজ, রকেট প্রভৃতির পরিকল্পনা ছিল তাদের নিকট অবাস্তব। অসম্ভবের পিছনে চিন্তা করবার অবকাশ, জ্ঞানের সূক্ষ্মতম দাঁড়ি-পাল্লায় ন্যায়বিচার করবার ক্ষমতা, বিজলী বাতিতে দিক-দিগন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করবার বুদ্ধি, পাতাল-পুরীর রহস্য উদ্ঘাটন করবার আনন্দ, সাগরের তল থেকে মুক্তা প্রবাল আহরণ করবার কৌশল, মহাযানে মহাশূন্যে বিচরণ করবার অসীম সাহস তাদের বুকে ছিল না। ছিল হিংসায় ভরা মন, পকেটশূন্য ধন, বুদ্ধিহীন মাথা, হৃদয় ভরা কপটতা আর শরীর ভরা অলসতা।

যে যুগে বিজ্ঞানের এই অবদান ছিল না, যে যুগ ছিল অন্ধকারের যুগ, ঠিক সে যুগেই বিজ্ঞানের থিওরী হাতে নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। জ্ঞানের বাহক, সত্যের বাহক, শান্তির বাহক এই মহাপুরুষ যুগ যুগের দুর্গম পথের মাঝেই রচনা করলেন তাঁর দুর্গ। এ দুর্গের অভ্যন্তরেই চল্‌ল তাঁর বিরামহীন গবেষণা। একদিন নয়, দুদিন নয় সুদীর্ঘ পঁচিশটি বছর। এই গবেষণাগারেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। বুঝতে পারলেন, যে উপাদান নিয়ে তিনি পরীক্ষার কাজ চালাবেন তা হতে হবে স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল এবং নিখুঁত। ধৈর্যের অভাব ঘটলে, বিশ্বাসের শিথিলতা আসলে, অবসাদ এবং অলসতার মোহে পড়লে তাঁর উদ্দেশ্য সব ব্যর্থ হবে। তাই একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করতে তাঁকে সংযমী এবং সাবধানতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সমগ্র প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। মাথা নত করতে হবে এক মহাশক্তির কাছে যে শক্তি দেবে তাঁকে অফুরন্ত প্রেরণা ও জ্ঞানের উৎস। এই পরীক্ষণাগারে হাত তুলে তাই হৃদয় মন সঁপে দিয়েই তিনি প্রার্থনা করতেন—

"হে খোদা! আমার হৃদয়ে আলোক দান কর। আমার কবরে আলো, আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে, আমার ডাইনে বামে, আমার ঊর্ধ্বে, আমার অধঃস্থলে, আমার কর্ণে, আমার চোখে, আমার কেশে, আমার চর্মে, আমার মাংস, রক্ত ও অস্থিতে আলোক দান কর। হে আল্লাহ! আমার জন্য আলো বৃদ্ধি কর, আমাকে আলোক দান কর এবং আমাকে জ্যোতির্ময় কর।"[১]

সাধনা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। চেয়েছেন আলো। পেয়েছেনও আলো। ভিতরেও তাঁর আলো। বাইরেও তাঁর আলো। আলোর মশাল হয়েই দিকে দিকে আলো বিকিরণ করলেন। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র তাঁর আলোর কাছে হার মানল। আর হার মানল বলেই চাঁদ ও সূর্য তাঁর শরীরের ছায়া দিতে পারল না। যে সূর্য সারা বিশ্বকে আলোকিত করে, যে চাঁদ তার স্নিগ্ধ কিরণে ভুবন মোহিত করে সে চাঁদ এবং সূর্যও হার মানল কোন্

টীকা ঃ ১—তিরমিজি—সংগৃহীত হাদিসের আলো, আজাহার উদ্দিন, এম. এ. ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪ ও সহীহ বুখারী—হাঃ নং ১০০১। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ।

www.pathagar.com

জ্যোতির কাছে? নিশ্চয়ই সে এক মহাজ্যোতি যার জ্যোতির বদৌলতেই চাঁদ-সূর্য আলোকিত।

হযরতের বাণীও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন,

"আনা নুরুল্লাহে ওয়া কুল্লু শাইয়েম মেন নূরী।"

অর্থাৎ—"আমি আল্লাহর সৃষ্ট নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতেই সৃষ্ট।"[২]

এ আলোর ধর্ম কি? এ আলোর গতি কি? এ আলোর উৎস কি? আমাদের জানা প্রয়োজন।

আলোর ধর্ম

আলোর স্বাভাবিক ধর্ম সোজা পথে চলা। বাধা পেলে প্রতিফলিত হয়। স্বচ্ছ মাধ্যম পেলে তা ভেদ করে চলে যায়। আলো অন্ধকার মানে না। দুর্গম পথকে ভয় করে না। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুকে উদ্ভাসিত করে, তাই বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়।

এই আলোর মধ্যে আর রসুলুল্লার (দঃ) সাধনাপ্রাপ্ত আলোর মধ্যে কি কোনো প্রভেদ আছে? আছে এবং অনেক বেশি পরিমাণে প্রভেদ আছে। স্বাভাবিক আলো কঠিন বস্তুকে ভেদ করতে পারে না। ভুতল, সাগরতল আলোকিত করে না। পাষাণহৃদয়ে এ আলো তার জ্যোতি নিক্ষেপ করতে জানে না। অন্ধ যুগের অন্ধ মনে এ আলো তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু যে আলো হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর গবেষণাগার হতে আশীর্বাদ রূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে আলো কঠিন, তরল বস্তু মানে না। পাষাণহৃদয়ের অণু পরমাণু ভেদ করে সোজা পথে চলে যায়। এ আলোর প্রভা ভূতল, সাগরতল, কান্তার মরু, দুর্গম গিরি পাড়ি দিয়ে স্বাভাবিক আলোর কিরণকে হার মানিয়ে দেয়। এ মহাজ্যোতি শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধ ধ্যান ধারণার অবসান ঘটিয়ে দেয়।

শক্তিশালী আলোক রশ্মি যা বৈজ্ঞানিকরা আধুনিক জগতে ব্যবহার করে দূরকে নিকটে এনেছেন, অণু পরমাণুর অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন, ছায়া দেখতে, বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছেন, শরীর বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছেন তাদের মধ্যে এক্স-রে, গামা-রে, রন্টজেন-রে, কসমিক-রে উল্লেখযোগ্য। সন্দেহাতীতভাবে এসব আলোকরশ্মির ব্যবহার মানুষকে জ্ঞানদান করেছে, নতুন আবিষ্কারের পথ সুগম করেছে। আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে প্রাণভরে দেখবার এবং উপভোগ করবার সুযোগ দিয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রের চিত্র নিয়ে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার আগ্রহ বাড়িয়েছে। এক কথায় বলতে হয় আলোকশক্তি না থাকলে এ বিশ্ব থাকতো মৃত, স্পন্দনহীন। এ আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আল্লাহ আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক সৃষ্টি করলেন। আদি পুস্তক বাইবেলের প্রথম অধ্যায় প্রথম থেকে চতুর্থ চরণে এ কথার উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

(১) "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

(২) পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল। আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিত করিতেছিলেন।

(৩) পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল।

(৪) তখন ঈশ্বর উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।

(৫) আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস।"

টীকা ঃ ২—সহীহ হাদিস—সংগৃহীত বিশ্বনবী-গোলাম মোস্তফা।

www.pathagar.com

আলোর গতি ও প্রয়োজন

আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এত প্রচণ্ড গতিবেগ আর কোন পদার্থ বা শক্তির নেই। শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৩২ মিটার অর্থাৎ ১১ শত ফুট। বিদ্যুতের গতি ও আলোর গতি একই তাই এই দুটি প্রধান শক্তির দ্বারাই যত অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। মানুষ যা কোনদিন ভাবতে পারে নি, যা কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি, যা কোনদিন তার চিন্তাশক্তির মধ্যে আসে নি তা সাধন করছে এ দুই বৃহত্তর শক্তির উপর নির্ভর করে।

আলোক শক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তি সত্যি জগৎকে আলোকিত করছে। গভীর অন্ধকার রাত্রি আসলেই বুঝা যায় আলোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব কত বেশি। দিবস এই আলোর প্রভা নিয়েই রাতের অন্ধকার দূর করে। আলো কার্যক্ষমতা দান করে, শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করে। চোখের উপর পড়ে দৃষ্টিশক্তি আনয়ন করে। বৈজ্ঞানিকদের প্রধান উপকরণ এই আলোক। আলো ছাড়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে না। আলো ছাড়া এ বিশ্ব অন্ধকার।

আলোর উৎস কি?

কোন্ বস্তু হতে আলোকরশ্মি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে? কোন্ উৎস থেকে বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তাপ পাচ্ছে? কোন্ উৎস যুগ যুগ ধরে তাপ বিকিরণ করেও নিষ্প্রভ হচ্ছে না?

মহান আল্লাহ তাঁর মহাবাণী কোরআনে বলেছেন,

"এবং আমি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছি।"[১]

আকাশের কোলে বিরাজমান এই প্রদীপ্ত প্রদীপটি সূর্য, যা অস্বাভাবিক গতিতে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে ও প্রয়োজন অনুযায়ী এ বিশ্বে তাপ বিকিরণ করে চলছে। সৃষ্টির পর থেকেই চলছে তার এ বিরামহীন কাজ। কেউ তার গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে নি। এর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বৈজ্ঞানিকদের মতে ৪ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও বহির্ভাগের উত্তাপ ১২ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আশ্চর্য! আমাদের যে কোন প্রদীপ বা আলোর উৎস এই ভাবে তাপ বিকিরণ করলে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে নিষ্প্রভ হয়ে যেত। কিন্তু এ জ্যোতি কোটি কোটি বছর ধরে বিশ্বের প্রতিটি পদার্থকে তাপ দান করেও নিষ্প্রভ হচ্ছে না। বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রতি সেকেন্ডে সূর্য $১০^{২৬}$ ক্যালরী মুক্ত করে। অর্থাৎ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে তা ৫×১০^{৩৮} টি হাইড্রোজেন পরমাণু—অর্থাৎ ৮০ কোটি টন হাইড্রোজেন ধ্বংস করে। সূর্যের বয়স অনুযায়ী হিসাব করলে হাইড্রোজেন পরমাণু এর অভ্যন্তরে আর থাকবার কথা নয়। সূর্যের আলো দেবারও কথা নয়। যা হোক, আমার কথা সেটা নয়। আমি বলতে চাই যে এমন শক্তিশালী ও প্রচণ্ড জ্যোতিসম্পন্ন সূর্য কেন এক মহাজ্যোতির কাছে আলোর দিক দিয়ে হার মেনেছে? এ মহাজ্যোতি হযরত মুহাম্মদের (দঃ)। সূর্যের জ্যোতি প্রতিটি ঘন পদার্থের ছায়া সৃষ্টি করতে পারলেও হযরত মুহাম্মদ (দঃ) শরীরের ছায়া সৃষ্টি করতে পারে নি।[২] চলুন দেখি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কি না।

একটা সার্চলাইটের পাশাপাশি একশত ওয়াটের একটা বাল্ব ফিট করলে দেখা যায় যে

টীকা ঃ ১—কোরআন, সূরা নবা। আয়াত—১৩।

টীকা ঃ ২—তফসীরে আজিজী ঃ সংগৃহীত কোরআন তর্জমা—আবদুল হাকিম। ৩০ পারা, ১৯১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

একশত ওয়াটের বাল্বটি যে আলো বিকিরণ করছে তার প্রভাবে সার্চলাইটের আলো বিকিরণের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না। উপরন্ত একশত ওয়াটের বাল্বটি সার্চলাইটের আলো হরণ করে সার্চলাইটের কোন ছায়াও দিতে পারছে না। আমাদের বিশ্বনবী বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদকে (দঃ) সার্চলাইটের সঙ্গে এবং সূর্যকে একশত ওয়াটের বাল্ব-এর সঙ্গে তুলনা করলে এ রহস্যের দ্বার উন্মোচন হয়ে যায় আর আমাদের মত মূঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধ্যান ধারণার অবসান ঘটে।

বিশ্বের গৌরব, সৃষ্টিজগতের গৌরব, মানব জাতির গৌরব, সাধককুলের গৌরব পয়গম্বরদের নেতা হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) জড়জগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই তুলনা করা চলে না। তথাপি সূর্যের পাশাপাশি এই মহামানবকে রেখে তুলনা করেছি শুধু আমাদের মত মূঢ় মানবদের চোখে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিতে। এ অপরাধের জন্য আমি এ মহাজ্যোতির কাছে ক্ষমা চাই।

আলোর একটা বিশিষ্ট গুণ এই যে—যে বস্তুকে ভেদ করে চলে যায় সে বস্তুকে আলোকিত করে। আর ভেদ করতে না পারলে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়। আলোর নিজস্ব কোন রূপ নেই। বস্তু গুণের উপরেই আলোর রূপ নির্ভর করে। যেমন কোন আলো লাল, কোনটি নীল, কোনটি হলুদ, কোনটি সবুজ ইত্যাদি। রসুলুল্লার (দঃ) আলোর প্রভায় ঠিক তদ্রূপই ঘটে থাকে। যারা তাঁর এই আলোককে গ্রহণ করতে পারে তারাই আলোকিত হয়। যাদের হৃদয় অভ্যন্তর দিয়ে এ আলোক ভেদ করে চলে যায় তাদের হৃদয়ের কোন ছায়া পড়ে না। আর যাদের হৃদয় কঠিন তারা এ আলো গ্রহণ করতে পারে না। তাই সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, ফলে বস্তুটি স্বচ্ছ হয় না এবং আভ্যন্তরীণ গুণ বিকশিত হয় না। এর ফলেই বস্তুটি কোনরূপেই (লাল, নীল, সবুজ) রূপ লাভ করে না। আর কোনরূপেই যদি বস্তুটি রূপায়িত না হয় তবে সেটাকে ঘোর কাল বলা ছাড়া উপায় থাকে না। যারা এই মহাবৈজ্ঞানিকের এই মহাজ্যোতি আজও গ্রহণ করতে পারেন নি তারা নিশ্চিত জানবেন যে তাদের হৃদয় ঘন বস্তুতে (Opaque materials) সৃষ্টি। এদের লক্ষ্য করেই কোরআন বলেছে,

'কাল্লা বাল্ রানা আলা কুলুবিহিম মাকানু ইয়াক ছেবুন।' অর্থাৎ

'কখনও না বরং তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদের অন্তর সমূহে মরিচা ধরিয়াছে।'[১]

এ বিষয়ে ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

রাশিকৃত বালিকে একত্রিত করলে সেটা ঘনবস্তু বা Opaque material এ রূপ নেয়। কিন্তু এই বালিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছ পদার্থ অর্থাৎ গ্লাসে রূপান্তরিত করতে পারি। এই ঘন বস্তুকে রূপান্তরিত করা আর না করা নির্ভর করে আমাদের প্রচেষ্টা ও রাসায়নিক কৌশলের উপর। আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করে, মনের উপর ক্রিয়া সাধন করে আমরা এই জড় আত্মাকে স্বচ্ছ আত্মায় রূপান্তরিত করতে পারি এবং এর মধ্য দিয়ে অবাধ গতিতে ইচ্ছামত এই আলোর প্রভা প্রবেশ করাতে পারি। মুসলিম বিশ্বে এ পরীক্ষা অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে।

জাগতিক আলোর উৎস আমরা দেখলাম, এবারে দেখব মহাজাগতিক আলোর উৎস,

টীকা ঃ ১ –কোরান, সূরা তৎফিক। আয়াত–১৪। ৩০ পারা।

www.pathagar.com

যে উৎস থেকে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই আলোকিত হচ্ছে। কোরআন এ কথার সাক্ষ্য দান করে।

"আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলো।"[১]

হযরত বলেছেন–"আউয়ালো মা-খালাকাল্লাহ নূরী।"[২]

অর্থাৎ 'আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা আমারই নূর।'

উপরে বর্ণিত কোরআন ও হাদিসের তত্ত্ব হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহাজাগতিক আলোর উৎস আল্লাহপাক স্বয়ং। তাঁর এ পবিত্র আলোর উৎস হতেই সৃষ্টি হলো শুরু। আর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তা হলে দেখা যায় যে, মহাজগতের দ্বিতীয় আলোক উৎস হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ্‌র জ্যোতি বা সৃষ্ট আলোক হতেই তিনি হলেন সৃষ্ট। আর তাঁর সৃষ্টি থেকেই আরম্ভ হলো এ বিশ্ব সৃষ্টি।

আলো থেকে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) সৃষ্টি। আলোয় গড়া তাঁর মন। আলোর দীপ্তি তাঁর চোখে মুখে, আলোর রওশনীতে ভর্তি তাঁর হৃদয়। এ ধারণা কেউ করতে পারে না। এ কল্পনা কারো চিন্তাশক্তিতেই আসে না। তবুও এটাকে সত্য বলেই মানতে হয়, কেননা এরও যে প্রমাণ আছে। আর সে প্রমাণ দিচ্ছেন আর কেউ নয়––স্বয়ং হযরত (দঃ)। এ ছাড়া তাঁর একান্ত প্রাণের সাথী, প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ)– যিনি ছায়ার মত সর্বদা হযরতকে (দঃ) অনুসরণ করতেন–তিনি বলেছেন, "মহানবী (দঃ) আলোকেও যেরূপ দেখিতেন, অন্ধকারেও সেইরূপ দেখিতেন। সম্মুখে ও পশ্চাতের বস্তু তিনি সমভাবে দেখিতে পাইতেন।"[৩]

হযরতের প্রার্থনার মাঝে আমরা দেখেছি যে তিনি আলোক চেয়েছেন। তাঁর হৃদয়ে, ভিতরে-বাইরে ডানে ও বামে, উপরে ও নিচে, কেশে চর্মে, কানে ও চোখে, রক্ত ও মাংসে, অস্থি ও মজ্জাতে তিনি আলোক চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন জ্যোতির্ময় হতে। সত্যই কি তাই? তিনি কি জ্যোর্তিময় হয়েছিলেন?

হযরতের প্রার্থনার মাঝে আমরা যে আলোক দেখেছি সেটাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে তাঁর জ্ঞানগরিমা, বুদ্ধিকৌশল, শক্তি ও সামর্থকে ধরে নিয়েছি ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু আলোকের প্রকৃত অর্থ ধরে নিলে এসব গুণাগুণ আসে না। আসে আলোর স্বভাব ও আলোর বৈশিষ্ট্য। আলোতে বস্তু উদ্ভাসিত হয়, তাই দৃষ্টি সম্মুখে আসে। এবার তাহলে দেখা যাক্ তাঁর নিজস্ব কোন আলো ছিল কি না যার প্রভাবে বস্তুর অন্ধকার ছিন্ন করে উদ্ভাসিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ-

"একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মুচকিয়া হাসিলে আমি তাঁহার দাঁতের আলোতে সূচের ছিদ্র দিয়া সূতা পরাইয়াছিলাম।"[১]

এ বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ নেই। স্বচ্ছ বস্তুর উপর আলোকরশ্মি

টীকা ঃ ১ –কোরআন, সূরানূব। আয়াত ৩৫।

২ –হাদিস–সংগৃহীত, বিশ্বনবী–গোলাম মোস্তাফা।

৩ –সংগৃহীত, হাদিছের আলো-আজহারউদ্দিন এম. এ. ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৩।

টীকা ঃ ১ –সংগৃহীত, হাদিছের আলো–আজহার উদ্দিন, এম. এ। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩।

www.pathagar.com

পড়লে তা ঝলসে উঠে। দাঁত তদ্রূপ স্বচ্ছ নয়। এখান থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে অন্য বস্তুর উপর পড়া এবং তাকে উদ্ভাসিত করা সম্ভব নয়। আমাদের দাঁত নিয়ে প্রমাণ করলে তা বোঝা যায়। ওপরের বাণীটি মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা হযরতের (দঃ) চিরসঙ্গিনী ও সত্যবাদিনী পবিত্রা নারী হযরত আয়েশার (রাঃ) মুখ থেকেই এ বাণী আমরা পেয়েছি। এ বাণী সত্য বলে ধরে নিলে বলতে হয় হযরতের দাঁত থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাঁর দাঁত কি তবে আলোর তৈরি? হযরতের বাণী হতে বুঝা যায় যে তাঁর সর্ব শরীরটাই আলোর তৈরি। কেননা তিনি বলেছেন ঃ

'আমি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নূর এবং সমূদয় বস্তু আমার নূর হতেই সৃষ্টি।'

আল্লাহপাক তাঁর মহাবাণীতেও এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

"ক্বাদ যা কুম মিনাল্লাহে নূরুন ও কেতাবুম মুবিন।"[২]

অর্থাৎ–"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিয়াছে আল্লার-নূর এবং সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।"

"হে নবী, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি। এবং তুমি তাঁহারই আদেশে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও প্রদীপ্ত প্রদীপ স্বরূপ।"[৩]

"আমি তাহার জন্য আলোক সৃষ্টি করিয়াছি যদ্বারা সে লোকদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।"[৪]

আমরা তাহলে বতে পারি যে আলোর স্বভাব ও গুণাগুণ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এবারে আলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবার একটু আলোচনা করে দেখি এ সব বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল কি না।

আলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য তার গতিবেগে। এমন গতিবেগ সৃষ্ট পদার্থের আর কোন বস্তুর মাঝে দেখা যায় না। বিশেষ করে জড় বস্তুর মাঝে এরূপ গতিবেগ অস্বাভাবিক। জড় বস্তুতে সৃষ্ট হযরতের (দঃ) দেহ। তাই তাঁর দেহের গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে এটা অবাস্তব। তবুও আমরা হযরত মুহাম্মদের (দঃ) জীবন আলোচনা করে একটা অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই তাঁর নভোভ্রমণ। এ ঘটনা হযরত নিজেই শুধু বলেন নি; কোরআনেও দেখতে পাই এর প্রমাণ; হযরতের সাহাবাবৃন্দ এ ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তার সত্যতাও প্রমাণ করেছেন। ঘটনাটি আমরা একবার দেখে নিই।

মিরাজ

"তিনিই পবিত্রতম–যিনি একদা নিশীথে তদীয় সেবককে পবিত্র মসজিদ কাবাশরীফ হইতে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করাইয়াছিলেন–যাহার সীমাকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছি–যেন আমি তাহাকে আমার কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকরী পরিদর্শক।"[১]

"সেই সুদৃঢ় শক্তিশালী তাহাকে শিক্ষা দান করিয়াছেলন–যিনি মহাশক্তির অধিকারী।

২ –কোরআন–সূরা মায়েদা, আয়াত–১৫ এর শেষাংশ।

৩ –কোরআন–সূরা আজহাব। আয়াত ৪৫– ৪৬।

৪ টীকা ঃ ৪ কোরআন–সূরা আনআম, আয়াত-১২২ এর অংশ।

১ –কোরআন–সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত–১।

www.pathagar.com

তাহাতেই সে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সে সমুন্নত গগনপ্রান্তে ছিল। তৎপর সে নিকট হইতে নিকটতর হইয়াছিল। এমনকি দুই ধনুকের ব্যবধানে ছিল অথবা আরও সন্নিকটবর্তী হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার সেবকের প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার তাহাই প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন। তখন যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তদীয় অন্তকরণ তাহা অসত্য ধারণ করে নাই। তবে কি তোমরা তদ্বিষয়ে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল সেই সমুন্নত তরুর সন্নিকটে? উহারই সন্নিধানে স্বর্গধাম। যখন উহা সেই তরুকে যেরূপভাবে আবৃত করিবার আবৃত করিয়াছিল। তখন তাহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত অথবা অতিক্রান্ত হয় নাই। নিশ্চয়ই সে স্বীয় প্রতিপালকের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করিয়াছিল।"[২] সূরা বনি ইসরাইলে বর্ণিত আয়াত নিয়ে আমরা আলোচনা করে দেখি হযরত (দঃ) সত্যি নভোভ্রমণ করেছিলেন কি না।

পবিত্র মসজিদ ঃ বলতে মক্কার বিশ্ব-বিশ্রুত 'কাবাকে' বোঝায়। আরবীতে এ পবিত্র পুণ্যধামকে 'মাস্‌জিদুল হারাম' বা 'খানায়ে কাবা' বলা হয়।

দূরবর্তী মসজিদ ঃ জেরুজালেমে অবস্থিত 'বায়ুতল মোকাদ্দেস', আরবীতে যাকে 'মস্‌জিদুল আকসা' বলা হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে রজব মাসের ২৭ তারিখে হিজরতের এক বছর পূর্বে এ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কাবা থেকে বায়তুল মোকাদ্দেসের দূরত্ব ছ'শো মাইল। অথচ কিভাবে এ ছ'শো মাইল পথ অতিক্রম করে হযরত একই রাতে নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিলেন এবং সেদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা বিশ্বাস করবার মত বিশ্বাসী কমই মেলে। কেউ বলে হযরত স্বপ্নের মাধ্যমে বেহেশত, দোজখ, আরশ-কুরসী ও নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ করেছিলেন আবার কেউ বলে এটা তাঁর আধ্যাত্মিক চোখের ফলশ্রুতি –সশরীরে বাস্তব পরিভ্রমণ নয়। প্রকৃত বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে কিন্তু এটা কাল্পনিক, আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগের ঘটনা নয়, বাস্তব। হযরতকে যাচাই করতে অবিশ্বাসী কোরেশগণ যখন জেরুজালেম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ও কাবা হতে জেরুজালেমের পথের বর্ণনা দিতে বলে তখন হযরত প্রতিটি উত্তর ও প্রত্যেক স্থানের বিবরণ সঠিকভাবেই দিতে সক্ষম হন। এতে অবিশ্বাসীদের চোখ স্থির হয়ে যায় এবং বিশ্বাস না হলেও অন্তর তাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

পরবর্তী যুগে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এ নিয়ে আলোড়ন চল্‌তে থাকে। তাঁদের মতে নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পিছনে যে সব অসাধারণ গুণাবলীর দরকার তা মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা পৃথিবীর উপরে মাত্র ৫২ মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডল অবস্থিত। এর উপরে আর বায়ুমণ্ডল নেই। আছে হিলিয়াম, ক্রিপটন, জিয়ন প্রভৃতি হালকা গ্যাসীয় পদার্থ। বায়ুস্তর ভেদ করে এসব হালকা গ্যাসীয় পদার্থের অভ্যন্তরে এসে কোন জীবজন্তুর প্রাণরক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা দেহের আভ্যন্তরীণ চাপ ও বহির্ভাগের চাপ সম্পূর্ণ পৃথক। এই চাপের সমতা রক্ষা করা জীবের পক্ষে কঠিন। এই যুক্তি প্রদর্শন করে চোদ্দশ বছর কেটে গেছে এবং বিজ্ঞানীদের চোখে হযরতের নভোভ্রমণ বা মিরাজ উপেক্ষিত হয়েছে।

---

[২] –ঐ–সূরা নজম। আয়াত ৫-১৮,

টীকা ঃ-২–জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ- "যখন কুরাইশ (আমার মিরাজের কথাকে) মিথ্যা বলিল, আমি হাতিমে দাঁড়াইলাম এবং খোদা বায়তুল মোকাদ্দেসকে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন এবং আমি উহা দেখিয়া তাহাদিগকে উহার নিদর্শনসমূহ বাতলাইতে লাগিলাম" (সহীহ্ বুখারী তজরীদ)–মিরাজ পরিচ্ছেদ, তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ [হাঃ নং ১/৪০৭]

www.pathagar.com

যারা বা কিছুটা বিশ্বাস করত তাদের কাছেও এটা একটা রহস্য হয়ে তাদের মনকে তোলপাড় করে তুলত। বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অবশ্য এটা অত্যন্ত সহজ ছিল। কেননা তারা জান্‌ত হযরত জীবনে মিথ্যা বলেন নি। 'আল আমীন' ছিল তাঁর উপাধি। তাছাড়া সব কথাই যেখানে তাঁর সত্য বলে প্রমাণিত সেখানে মিরাজের ঘটনা অসত্য হবে কেন? মক্কা হতে জেরুজালেম পর্যন্ত পথের বর্ণনা যিনি একই ঘটনার মাঝে তুলে ধরেছেন এবং যারা এ পথের সন্ধান জানে তাঁদের চোখে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে [১] তখন মক্কা হতে সপ্তাকাশের বর্ণনা ও সিদ্‌রাতুল মুনতাহার এর ঘটনাবলী সত্য না হয়েও পারে না। না দেখে পথের বর্ণনা তিনি এত নিখুঁতভাবে দেবেনই বা কি করে? কল্পনারও তো একটা পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতির ঊর্ধ্বে কি করে এমন সব রহস্যজনক ঘটনার ক্রমবিকাশ ঘটে। বেহেশত্‌, দোজখ, আরশ, কুরসী প্রভৃতির যা বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা কোরআন, বাইবেল ও পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সঙ্গেও মিল আছে। এসব গ্রন্থও তিনি কোনদিন পড়েন নি।

বিজ্ঞানের যতই উৎকর্ষ সাধিত হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হযরতের কার্যাবলী ও বাণী ততই নিখুঁত ও খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণ ও জ্ঞান সীমিত। তাই মহাবৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদের (দঃ) প্রমাণ ও জ্ঞানের সীমায় তারা না পৌঁছাতে পেরে হাবুডুবু খায়। চোদ্দশ বছর ধরে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যেখানে জোর গলায় প্রমাণ করে দেখাতেন যে মহাশূন্যের মহাকাশে মানুষ বিচরণ করতে পারে না সেখানে তারাই বিংশ শতাব্দীর শেষে প্রমাণ করে দেখালেন যে মানুষ গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, শূন্য হতে মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারে। নতুন আবিষ্কার করে নতুনের সন্ধান দিয়ে তাঁরা চোদ্দশ বছরের পুরাতন বৈজ্ঞানিকদের হতাশাকে খণ্ডন করতে পারেন। আমেরিকার নভোচারী ও তাঁর সহচরবৃন্দ পৃথিবী হতে দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরের চাঁদের সাথে মিতালী পেতে বিশ্বকে অবাক করে দিলেন। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এখন চলছে প্রতিযোগিতা। কে প্রথম মঙ্গলগ্রহে, কে বুধ, শুক্র, ইউরেনাস ও নেপচুনে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে। মহাকাশ ভ্রমণ করা নাকি সম্ভব নয়? মহাশূন্যে বিচরণ করা নাকি অসম্ভব? আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপের সমতা রক্ষা জীবের পক্ষে নাকি কঠিন? হযরতের নভোভ্রমণ নাকি মিথ্যা? সাহস আছে এ বিংশ শতাব্দীতে একথা বলার যে চাঁদে যাওয়া অসম্ভব? নির্বোধ কোন চিন্তাবিদের এখন একথা বলার কি কোন অবকাশ আছে যে নভোচারী গ্যাগারিন[১] স্বপ্নে, সাধনায় বা আধ্যাত্মিক শক্তিবলে হযরতের মত মহাশূন্যে বিচরণ করেছেন? জানি এখনও এ ধরনের বহু লোক আছে। আমেরিকার নভোচারীদের এমন বাস্তব ঘটনা ও সাফল্য সত্ত্বেও বহু আমেরিকান্‌ই আজও স্বীকার করতে চান না যে তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন।

নভোচারীদের মহাশূন্যে বিচরণের পূর্বে তাঁদের দেহকে তন্ন তন্ন করে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। একদিন দু'দিন পরীক্ষা করে উপযুক্ত বলে তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। মাসের পর মাস তাদের শারীরিক সহিষ্ণুতার কৌশল, রক্তচাপ, হৃদয় ক্রিয়া; বুদ্ধির পরিমাপ; পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা প্রভৃতি যাচাই করে নভোভ্রমণের উপযুক্ত কি না বিচার করা হয়। এরপর যারা নভোভ্রমণের উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় শুধু তাদেরই অতি সাবধানে সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি দিয়ে মহাকাশ বিচরণে পাঠান হয়।

টীকা ঃ ১ –রাশিয়ার নভোচারী বৈমানিক গ্যাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই মার্চ তারিখে সর্বপ্রথম নভোভ্রমণ করে বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করেন।

www.pathagar.com

হযরতের দেহে কি অস্ত্রোপচার হয়েছিল?

হযরত মুহাম্মদের (দঃ) মহাকাশ ভ্রমণের জন্য কি এরূপ ব্যবস্থা করা হয় নি? অভিজ্ঞ কোন ডাক্তার তাঁর শরীরে কি অস্ত্রোপচার করে নি? গ্যাসীয় বস্তুর মাঝে টিকে থাকার মত ঔষধ কি তাঁকে দেওয়া হয় নি? হযরতের জীবনচরিত যাঁরা জানেন তাঁরা একবাক্যে বলবেন যেসব ব্যবস্থা নভোচারীদের জন্য বিংশ শতাব্দীতে করা হয়েছিল তাহার চাইতে অনেক উন্নততর ব্যবস্থা, সুনিপুণ ও শক্তিশালী ডাক্তার দ্বারা হযরতের জন্য করা হয়েছিল। হযরতের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা সবারই মনে থাকার কথা। তাঁকে সর্ব কাজে উপযোগী ও সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরূপে প্রকাশ করতেই আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় ডাক্তার জিবরাইল হযরতের বক্ষ অপরেশন করেছিলেন এবং তাঁর জড়ধর্মী স্বভাব দূরীভূত করে শক্তিশালী আলোর স্বভাবে রূপান্তরিত করেন। কোরআন এর সাক্ষী। সেখানে বলা হয়েছে–

"আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচন করি নাই? আমি তোমা হইতে তোমার সেই ভার অপসারণ করিয়াছি যাহা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করিতেছিল।"[১]

হযরত নিজেও একথা স্বীকার করেছেন এই বলে ঃ- "আল্লাহতায়ালা আমার অন্তরে তাঁহার অনুগ্রহের জ্যোতি নিক্ষেপ করিলেন। আমি স্বীয় অন্তরে উহার অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব অবগত হইলাম।"[২]

এবার দেখি অপারেশরে ধারা কেমন ছিল এবং কি অবস্থায় হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) অপারেশন করে নভোভ্রমণের উপযোগী করা হয়েছিল।

মালিক ইবন সা'সা' আত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী (সাঃ) তাহাদিগকে যে রাত্রিতে তাঁহার মিরাজ হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে বলিলেন,

"আমি হাতিমে শুইয়াছিলাম এবং এমন সময়ে আমার নিকট সহসা এক আগন্তুক আসিল" এবং রাবি বলিলেন আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি–"এবং চিরিল এই পর্যন্ত।"

মালিক বলেন–"কণ্ঠের গর্ত হইতে নাভীর নিচ পর্যন্ত–তারপর বাহির করিল আমার হৃদপিণ্ড, তারপর আনা হইল ঈমান পূর্ণ এক সোনার তশতরি, তারপর ধৌত করা হইল আমার হৃদপিণ্ড এবং পূর্ণ করা হইল উহাকে [ঈমান ও জ্ঞান দিয়] অতঃপর রাখা হইল উহাকে যথাস্থানে।"[৩]

দুর্বল হৃদপিণ্ড নিয়ে আমাদের নভোভ্রমণ সম্ভব নয়। কেননা বায়ুমণ্ডলের যে চাপে ও পরিবেশে আমাদের হৃদপিণ্ড কাজ করে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে তা করতে পারে না। এজন্যই নভোচারীদের হৃদপিণ্ডকে সবল ও হাল্‌কা করার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। হযরতের (দঃ) হৃদপিণ্ডকে তাই পূর্ণ করা হয় এমনি এক শক্তি দ্বারা যা পার্থিব জগতে মেলে না। আর এ শক্তিবলেই হযরত (দঃ) শুধু প্রথম আকাশেই নয়, সপ্তাকাশের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন।

আকাশ ভ্রমণের যে কাহিনী হযরতের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই তা তাঁর বাণী উদ্ধৃত করেই প্রমাণ করব। এর পূর্বে অন্যান্য জটিল প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করি নভোভ্রমণের বাস্তব সম্ভাবনার বিষয়গুলো একবার দেখে নিই।

টীকা ঃ ১ –কোরান, সূরা এনশেরাহ। আয়াত-১ ও ২।

টীকা ঃ ২ –মিশকাত, সংগৃহীত কোরআনের তর্জমা, মুহাম্মদ আলী হাসান। পৃষ্ঠা ১৯২০। ৩০ পারা।

টীকা ঃ ৩-বুখারী–পূর্বে বর্ণিত। ৩৬৩।

www.pathagar.com

হযরত কিসের সাহায্যে নভোভ্রমণ করেছিলেন?

জটিল প্রশ্নের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন সবার মনে দোলা দেয়। তাহলো এই যে হযরত কিসের সাহায্যে নভোভ্রমণ করেছিলেন? সে যুগের কোন বৈজ্ঞানিক কোন 'রকেট' সৃষ্টি করেন নি যার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৬ হাজার মাইল থেকে ৩২ হাজার মাইল ছিল।

হযরত মানুষের সৃষ্ট কোন রকেট বা 'Space ship' নিয়ে আকাশ ভ্রমণ করেন নি, করেছিলেন জিবরাইল কর্তৃক আনীত আল্লাহ প্রদত্ত 'বোরাক' এ, যার গতিবেগ রকেটের গতিবেগের মত ছিল না। ছিল সেকেন্ডে কোটি কোটি মাইল। হযরতের বাণী তা প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ-

"আমার নিকট আনা হইল খচ্চরের চেয়ে নিচু ও গর্দভের চেয়ে উঁচু একটি শ্বেতবর্ণের পশু। রাবি বলেন—**উহা বোরাক—যাহা প্রতি পদক্ষেপে চলে যতদূর তাঁহার চক্ষু যায়।** তারপর আমাকে চড়ান হইল উহার উপরে। অতঃপর জিবরাইল আমাকে লইয়া গেলেন নিকটতম আসমানে।"[১]

উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে বেশ একটা তথ্য আমরা পেলাম। নভোভ্রমণের জন্য হযরতকে কোন রকেট বা 'Space ship' বছরের পর বছর সাধনা করে তৈরি করতে হয় নি। এ 'Space ship' তাঁর জন্য পূর্ব থেকেই তৈরি ছিল। চন্দ্র অভিযানে Apolo-16 যেমন বিকল হয়ে পড়েছিল, অরিয়ন এর এলুমিনিয়াম আস্তরগুলি যেমন খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল ও নভোচারীদের জীবনের উপর মহাবিপদ এসেছিল তেমন ঘটনা বোরাকের ক্ষেত্রে ঘটে নি। তেমন মহাবিপদও নভোভ্রমণে হযরতের জীবনের উপর আসে নি। সামান্য ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল অতিক্রম করতে যে কষ্ট আমাদের স্বীকার করতে হয়, যে উদ্বেগ, অস্বস্তি ও ভীতির মাঝে সময় গুণতে হয়, তদ্রূপ ঝুঁকি হযরতকে নিতে হয় নি। কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে, আকাশের বিভিন্ন স্তর ভেদ করে সপ্তাকাশের কঠিন দ্বার উন্মোচন করে হযরত আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে সিদরাতুল মুনতাহায় উপনীত হন। ক্লান্তি জড়তা, অস্থিরতা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

উপরে বর্ণিত রসুলের বাণী হতে আমরা আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব খুঁজে পেলাম যা অতীতে কোনদিন চিন্তা করি নি। সেটা হলো Space Ship বা বোরাক এর গতিবেগ। কি গতিবেগে 'বোরাক' মহাকাশ ভেদ করেছিল আমরা বিজ্ঞানীরা তা Calculate করতে পারি নি। কেননা হযরতের মহাকাশ ভ্রমণই ছিল আমাদের জ্ঞানে অবাস্তব। কোটি কোটি মাইল বেগবিশিষ্ট কোন বোরাক বা Space ship তৈরি হতে পারে না, এটাই ছিল আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। এ ধারণাও মুছে দিলেন হযরত। আমাদের মত মূঢ় বৈজ্ঞানিকদের চোখ খুলে দিতেই বোরাকের গতিবেগ দেখিয়ে দিয়ে বললেন,

"উহা বোরাক– তাহা প্রতি পদক্ষেপে চলে যতদূর তাঁহার চক্ষু যায়" (সহীহ বুখারী)

যে সমস্যা নিয়ে এতদিন ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, যে সমস্যা জটিল হতে জটিলতর রূপ ধারণ করেছিল, যে সমস্যা মাথায় ঢুকে প্রায় নাস্তিক করে দিয়েছিল সে সমস্যার কি সুন্দর

টীকা ঃ ১ –বুখারী–পূর্বে বর্ণিত। পৃষ্ঠা ৩৬৪।

www.pathagar.com

সমাধান আমরা পেলাম। হযরতের বাণী কোনদিন রিসার্চ করি নি, কোনদিন বিশ্লেষণ করে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ করি নি; এজন্যই আমরা ছিলাম পিছনের সারিতে কে নিকৃষ্ট মূঢ় জাতিরূপে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ **'আল কোরআন্'** যাদের হাতে, মহাবৈজ্ঞানিক হযরত যাদের পথের দিশারী তাদের আবার বিজ্ঞানের পথে সমস্যা কোথায়? সব সমস্যার সমাধান করে দিতেই হয়েছিল তাঁর জন্ম। চলুন, আমরা তাঁর বাণী গভীরভাবে চিন্তা করি এবং এর সমাধান খুঁজে বের করি।

যে বাহনে চড়ে হযরত (দঃ) আকাশ ভ্রমণ করেছিলেন তাকে 'বোরাক' বলা হয়। 'বোরাক' অর্থ বিদ্যুৎ। আরবীর 'বারকুন' শব্দ হতেই এ 'বোরাক' নামকরণ করা হয়েছে। এ বাহনটি লোহা, তামা, সীসা, দস্তা বা অন্য কোন পৃথিবীজাত ধাতুযোগে সৃষ্ট নয়। অদ্ভুত জ্যোতিসম্পন্ন ছিল এ বাহনটি। এটা আমাদের কল্পনাপ্রসূত কোন কথা নয়। যে বৈজ্ঞানিকের জীবন নিয়ে আলোচন করছি তাঁর উক্তিতেই এটা মেলে। বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। মিশকাত শরীফে বলা হয়েছে–

"হযরত (দঃ) কাবা গৃহের চত্বরে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে–মুহাম্মদ! মুহাম্মদের (দঃ) ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন ফেরেশতা জিবরাইল শিয়রে দণ্ডায়মান; অদূরে **"বোরাক" নামক একটি অদ্ভুত জ্যোতির্ময় বাহন অপেক্ষা করিতেছে, ডানাবিশিষ্ট অশ্বের মত তার রূপ, ক্ষিপ্র তার গতিবেগ।"**[১]

সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে–

আনাস (রাঃ) যে রাত্রে কাবার মসজিদ হইতে নবী (সঃ) এর মিরাজ হয় তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, নবী (সঃ) এর নিকট অহি আসিবার পূর্বে তিন ব্যক্তি আসিল; তখন তিনি পবিত্র মসজিদে ঘুমাইয়া ছিলেন। তাহাদের প্রথম জন বলিল, ইহাদের মধ্যে কে তিনি? দ্বিতীয়জন বলিল–'উহাদের মধ্যে মধ্যবর্তী জন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জন'। এবং শেষ জন বলিল, উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনকে লও।' এই কথাই হইল। ইহার পর তিনি আর তাহাদের দেখিলেন না, যতক্ষণ না তাহারা অপর এক রাত্রিতে আসিল, এমন আস্থায় নবী (সঃ) এর অন্তর দেখিল। নবী (সঃ) এর চক্ষু নিদ্রা যাইত কিন্তু তাঁহার অন্তর নিদ্রা যাইত না। এই রূপই হয় নবীদের। তাঁহাদের চক্ষু নিদ্রা যায় কিন্তু অন্তর নিদ্রা যায় না। তারপর জিবরাইল তাঁহার ভার লইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া আসমানে উঠিলেন।"[২]

বোরাকের গতিবেগ নিয়ে আবার আলোচনা করছি। হযরতের (দঃ) বাণী হতে আমরা দেখতে পাই যে বোরাকের গতিবেগ ছিল প্রতি পদক্ষেপে চক্ষু যতটুকু যায় অর্থাৎ দৃষ্টি যতটুকু চলে। (পূর্বে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে)। আকাশের দিকে তাকালে কোটি কোটি তারকা আমাদের চোখে পড়ে। কোন্ তারকা কত দূরে অবস্থিত তার হিসাব দেওয়া কঠিন। আমরা সাধারণতঃ যে সব তারকার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত তাদের মধ্যে–

(১) ধ্রুব– উত্তর আকাশে পৃথিবী হতে ৪৭ আলোক বর্ষ দূরে

টীকা ঃ ১ –মিশকাত, সংগৃহীত বিশ্বনবী-গোলাম মোস্তাফা।

টীকা ঃ ২ –সহীহ বুখারী–তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। কুরাইশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ২৯। ৩২১। পৃষ্ঠা ২৯১,২৯২।

www.pathagar.com

(২) ডেনিব–৭০° উত্তর অক্ষরেখা হতে ৪৬৫ আলোক বর্ষ দূরে

(৩) রিগেল–১০° দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে ৫৪৫ আলোক বর্ষ দূরে

(৪) বিটেল জিয়াস–১০° উত্তর হতে ৩০০ আলোক বর্ষ দূরে

(৫) আচার নার–৭০° দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে ৭০ আলোক বর্ষ দূরে।

(৬) কেনোপাস ———————— " " ৬৫০ " " "

যারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না তাদের হয়ত আলোকবর্ষের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তাই আলোক বর্ষের ধারণা করে নিয়ে চলুন, আমরা বোরাকের গতিবেগ বের করি।

প্রতি সেকেন্ডে আলোকের গতিবেগ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

১ মিনিটে ১,৮৬,০০০ × ৬০ মাইল

১ ঘণ্টায় ১,৮৬,০০০ × ৬০× ৬০ মাইল

২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ ১ দিনে ১,৮৬০০০ × ৬০ ×৬০ × ২৪ মাইল।

৩৬৫ দিনে বা এক বছরে ১,৮৬০০০ × ৬০ × ৬০ ×২৪ ×৩৬৫ মাইল = এক আলোক বর্ষ।

ধ্রুব নক্ষত্র যা আমরা সব সময় দেখে থাকি এবং যার উপর নির্ভর করে দিক নির্ণয় করি–নিকটতম এই নক্ষত্রকেই যদি আপাততঃ ধরে নিই এবং বোরাকের গতিবেগ যদি প্রতি সেকেন্ডে এক পা হয় তা'হলে এর গতিবেগ দাঁড়ায়–১,৮৬০০০ × ৬০× ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ × ৪৭ মাইল।

আকাশে মিটিমিটি করে যে সব তারকা জ্বলছে সেগুলোও আমাদের চোখে পড়ে।

এগুলোকে ধরে নিয়ে হিসাব করলে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে যায় বোরাকের গতিবেগ দেখে। এ অসাধারণ গতিবেগ নিয়েই বোরাক চলেছিল মহাকাশে হযরতকে (দঃ) নিয়ে।

সময়ের প্রশ্ন

তৃতীয় আর একটি প্রশ্ন আসে সেটা হলো সময়। সময়কে বোঝাবার মত পরিপক্ক জ্ঞান আমাদের নেই। কেননা একই পৃথিবীর বক্ষে যেখানে সময়ের এত গরমিল সেখানে পার্থিব জগতের সময় নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোন সার্থকতা আছে? এর সমাধান কি কেউ দিতে পারবে? আমাদের যখন দিন আমেরিকায় তখন রাত। এ কথা হয়ত বোঝা যেত না যদি বেতার আবিষ্কার না হতো। আমেরিকার কোন ভদ্রলোক টেলিফোনে যখন বলে সকাল ১০টা তখন বাংলাদেশ বা ভারতের একজন তার সঙ্গে সেই সময় টেলিফোনে কথা বলতে এটা স্বীকার করবে না যে সকাল দশটা। এরা বলবে রাত ১০টা। জাপানে যখন বেলা দুপুর আরবে তখন ভোর ৬টা বা ৭টা কোন দেশের সময়ের সঙ্গেই কোন দেশের সময়ের মিল নেই। ভারত ও বাংলাদেশ পাশাপাশি। অথচ এদের মধ্যেই আধ ঘণ্টা হতে ১ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান। কে সত্য কে মিথ্যা এ কথা বলার উপায় নেই। বলতে হয় সবই মিথ্যা, সবই সত্য। শিশুর যেমন সময়ের জ্ঞান নেই বৃদ্ধেরও তেমনি সময়ের জ্ঞান নেই। অচেতন ব্যক্তি সময়ের হিসাব রাখে না। পাগলও সময়ের হিসাব জানে না। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী বিজ্ঞানী ও মনীষীদের মধ্যেও সময়ের বিরাট তারতম্য। কার হিসাবকে ঠিক বলবেন? কার হিসাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন?

www.pathagar.com

একটি ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুধু একটি লাইট জ্বালিয়ে যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তবে ঘুম থেকে উঠে কোন পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী বা অংকশাস্ত্রের কোন ব্যুৎপত্তিশীল ব্যক্তিও বলতে পারবে না কত ঘণ্টা সে ঘুমিয়েছিল। সূর্য আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থিত একথাও বলতে পারবে না। অনুরূপ ভাবে শুধু অন্ধকার ঘরে যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তবে দু-চার দিন ঘুমানোর পর ঘুম থেকে উঠে বলতে পারবে না কতদিন বা কত ঘণ্টা সে ঘুমিয়েছিল।

একটা শিশুর মনে সময় বড় দীর্ঘ কিন্তু কর্মব্যস্ত যুবক বা বৃদ্ধের কাছে তা অতি খাট। আমাদের এক ঘণ্টা সময়কে যত দীর্ঘ মনে করি মহাকালের সঙ্গে তুলনা করে এক একটি শতাব্দীকেও তার চাইতে ছোট বলে মনে করি। গত চল্লিশ বছরের সময় যে জীবনের উপর কত দাগ কেটে গেছে তার মূল্য বর্তমানে এক সেকেন্ডও নয়।

উত্তর গোলার্ধে বা দক্ষিণ গোলার্ধে যেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত সেখানকার একদিন বা এক রাত আমাদের একদিন বা এক রাতের সমান নয়। বুধ গ্রহের সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে ৮৮ দিন সময় লাগে। আবার পৃথিবীর ঘুরে আসতে ৩৬৫ দিন সময় লাগে (বিজ্ঞানীদের মতে)। তাহলে দেখা যায় যে বুধের ৮৮ দিন সমান পৃথিবীর ৩৬৫ দিন। অর্থাৎ বুধের এক দিন সমান পৃথিবীর ৩৬৫ ÷ ৮৮ = ৪$^{১৩}/_{৮৮}$ দিন। দু'টি গ্রহের মধ্যে সময়ের কেমন ব্যবধান। এরূপ বিশ্বের প্রতিটি স্থানের সময় প্রতিটি স্থানের সঙ্গে মিল নেই।

যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা এ সময়ের উপর অনেক চিন্তা করেছেন এবং অনেক তত্ত্ব দিয়েছেন। এ নিয়ে আর আলোচনা করে পাঠকবৃন্দকে বিরক্ত করতে চাই না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন সময় সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের দিয়েছেন সেটাই আমার কাছে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন;

"There is no standard time. All time is local".

আমরা সূর্যকে Reference করে সময়ের মাপকাঠি তৈরি করি। সূর্য ওঠা থেকে ডোবা পর্যন্ত সময়কে একদিন বলি। যেখানে সূর্য মোটেই উদিত হয় না সেখানে কিভাবে সময় নির্ধারণ করা যাবে এ তত্ত্ব আমি জানি না।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিবীর প্রথম আকাশেই মাত্র বিরাজমান। পরবর্তী আকাশ সমূহে আছে কি না এ খবর কেউ দিতে পারে না। আমার মতে প্রথম আকাশ ছাড়া অন্য কোন আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নেই। কেননা কোরআনে বলা হয়েছে,

"ইন্না যাইয়ান্না সামওয়াদ্দুনিয়া বেজিনাতে নেল কাওয়াকেব"[১]

অর্থাৎ–নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর আকাশকেই নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।

"ওয়া লাকাদ যাইয়ান্না সামাওয়াদ্দুনিয়া বে মাছাবিহা।"

অর্থাৎ–"এবং নিশ্চয়ই আমি এই পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।"[১]

আকাশের সাতটি স্তর বিদ্যমান। একথা বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস না করলেও জ্ঞানী ও ধর্মবিদ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস না করে পারে না। কেননা বাইবেল, কোরআন প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে এর উল্লেখ আছে। কোরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি।

টীকা ঃ ১ –কোরআন, সূরা সাফফাত। আয়াত–৬

১ –কোরআন, সূরা মূলক। সূরা ৫ এর অংশ

www.pathagar.com

"ওয়া বানায়না ফাওকাকুম সাবআন সেদাদা।"[২]

অর্থাৎ–"আমি তোমাদের মাথার উপর সুদৃঢ় সপ্তআকাশ নির্মাণ করিয়াছি।"

আল্লাজি খালাকা সাব্আ সামাওয়াতিন তিবাকান।"[৩]

অর্থাৎ–"যিনি স্তরে স্তরে সপ্তআকাশ নির্মাণ করিয়াছেন।"

কোরআন থেকে দেখা যায় যে আমাদের মাথার উপর যে আকাশ বিদ্যমান কেবল সেই আকাশের কোলেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র বিরাজমান। অন্য আকাশে যদি থাকত তবে শুধু পথিবীর আকাশকে ইঙ্গিত করা হতো না। যেখানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নেই সেখানে সময়ের প্রশ্ন অবান্তর। সেই অপার্থিব জগতে সময় বলে কিছু নেই। তাই সময়ের প্রশ্ন তুলে রসুলুল্লাহর (দঃ) মিরাজকে উড়িয়ে দেবার মত দুঃসাহস কেউ অর্জন করবেন না। যদি করতে চান তবে কোরআনের নিম্নোক্ত, প্রশ্নের সমাধান করুন।

"অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে কোন জনপথ অতিক্রম করিয়াছিল এবং যাহা উহার ছাদসমূহের উপর নিপতিত ছিল–সে বলিয়াছিল ইহা মৃত্যুর পর আল্লাহ কিরূপে ইহাকে সঞ্জীবিত করিবেন? অনন্তর আল্লাহ তাকে শত বৎসরের জন্য মৃত্যুদান করিলেন; তৎপর তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। তিনি বলিলেন এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছ? সে বলিল একদিন অথবা একদিনেরও কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি বলিলেন বরং তুমি শতবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছ। অতএব তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর–উহা বিকৃত হয় নাই এবং তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং এই হেতু যে আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করিব। এবং অস্থিপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য কর–কিরূপে আমি উহাকে সংযুক্ত করি। তৎপর উহা মাংসাবৃত করি। অনন্তর যখন উহা তহার জন্য প্রকাশিত হইল তখন সে বলিল–আমি অবগত হইয়াছি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।'[৪]

উপরে উদ্ধৃত কোরআনের বাণীর পিছনে যে ঘটনা আছে তা আমি পুনর্জীবন পরিচ্ছেদে বিজ্ঞান না কোরআন পুস্তকে ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে তাই অতি সংক্ষেপে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করছি।

নেবুকড্নসর বা বখ্তনসর ইহুদীদের হত্যা করে জেরুজালেম শহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। একদা হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ)। ঐ জনহীন শ্মশান নগরীটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন এং বলে উঠেন, "হে আল্লাহ্! তুমি এই ধ্বংসস্তূপ সমাচ্ছন্ন শ্মশান বিজন ভূমিকে পুনরায় কিরূপে সঞ্জীবিত করে জনবহুল নগরীতে পরিণত করবে।" একথা বলে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) একটা বৃক্ষের নিচে গর্দভটিকে বেঁধে তাঁর খাদ্য ও পানীয়গুলোকে ঐ বৃক্ষের শাখায় ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে অত্যাচারী নেবুকড্নসরের মৃত্যু হলে সত্তর হাজার ইহুদী যারা বন্দী ছিল তারা মুক্তি পায় এবং জেরুজালেম শহরে ফিরে আসে। পনর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তারা জেরুজালেম পুননির্মাণ করতে সমর্থ হয়। ইহুদী জাতির পতন ও জেরুজালেমকে ধ্বংস হবার পরে একশ বছরের মধ্যে বৃক্ষবহুল বন, তরুলতা ও সুরম্য প্রাসাদে জেরুজালেম

---

২ –কোরআন সূরা নবা। আয়াত ১২ এর শেষ অংশ

৩ –কোরআন সূরা মূলক। নবা। আয়াত ৩ এর শেষ অংশ

৪ টীকা ঃ ১ –কোরআন, সূরা বাকারাহ। আয়াত ২৫৯।

www.pathagar.com

পূর্বের ন্যায় হাসতে থাকে। একশ' বছর অতিবাহিত হবার পর ইয়ারমিয়া (আঃ) পুনর্জীবন লাভ করেন ও জেরুজালেম শহর দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন পূর্বাহ্ন ছিল। আর পুনর্জীবিত হবার পর দেখতে পান যে তখন অপরাহ্ন। অথচ এর মাঝে একশ' বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি তখনও অটুট ছিল। আল্লাহ্ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কতদিন ঘুমিয়েছিলে'? তিনি উত্তর দেন, 'একদিন অথবা এক দিনের কিয়দংশ। খাদ্য ও পানীয় সবই ঠিক আছে, অথচ এর মধ্যে একশ' বছর পার হয়ে গেছে, একথা শুনে তাঁর মনে কিছুটা সন্দেহ জাগলে দেখতে পান যে গর্দভটির হাড়-মাংসের কোন চিহ্ন নেই। এর পর আল্লাহ্ গর্দভটিকেও পুনর্জীবন দান করলে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) বলেন,

"আমি অবগত হইয়াছি যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।"

এরূপ আর একটা ঘটনার উল্লেখ করে সময় সম্বন্ধে আমাদের যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে তা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছি।

"এবং তাহারা তাহাদের গুহায় তিন শত নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। তুমি বল–তাহারা কিরূপে অবস্থান করিয়াছিল তাহা আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন।" (সূরা কাহ্ফ। আয়াত–২৫-২৬)

পর্বতগুহায় ৩০৯ বছর কারা অবস্থান করেছিল, কেন করেছিল–কিভাবে তাদের জীবন রক্ষা পেয়েছিল, ইত্যাদি প্রশ্নগুলো প্রথমে জেনে নিয়ে সময় সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

কোরআন সূরা কাহফে বলা হয়েছে, "আম্ হাসিবতা আন্না আসহাবাল কাহ্ফে ওয়া রাকিম।"

অর্থাৎ "তবেকি তুমি গুহাবাসিগণ ও খোদিত লিপিকে আমার নিদর্শনাবলী হইতে বিস্ময়কর বলিয়া ধারণা কর?"

আসহাবুল কাহ্ফ অর্থ গুহাবাসী এবং রাকিম অর্থ খোদিত প্রস্তরফলক বা স্মৃতিলিপি।

কথিত আছে সম্রাট দাকিয়ানুস যখন দেশের সমস্ত মানুষকে প্রতিমাপুঞ্জের দিকে উৎসাহিত করেন তখন দেশের কয়েকজন ধর্মপ্রাণ যুবক এর ঘোর বিরোধিতা করে। সম্রাট দাকিয়ানুস তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের জন্য তাদের প্রাণনাশের আদেশ দেন। ফলে যুবকগণ এক পর্বতগুহায় আশ্রয় নেয়। সম্রাট এ সংবাদ পেয়ে উক্ত পর্বতগুহার পাশে এসে যখন দেখতে পান যে এর অভ্যন্তরভাগে ভীষণ অন্ধকার তখন গুহাটা পাথর দিয়ে চাপা দেবার আদেশ দেন এবং এক স্মৃতিফলক নির্মাণ করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় ঐ যুবকগণ তিনশ' নয় বছর নিদ্রিত অবস্থায় কাটায়। এরপর তাঁর ইচ্ছাতেই জাগ্রত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে।

"এবং এইরূপ আমি তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়াছিলাম যেন তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে; তাহাদের মধ্যস্থ জনৈক বক্তা বলিয়াছিল, কতক্ষণ অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা একদিন অথবা দিবসের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা যে কতক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলে তাহা তোমাদের প্রতিপালকই পরিজ্ঞাত আছেন। অনন্তর তোমাদের একজন তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রা সহ নগরে প্রবেশ কর, তৎপর সে যেন উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখিয়া পরে তাহা হইতে তোমাদের নিকট উপজীবিকা লইয়া আসে এবং সে যেন নম্রভাবে চলে ও তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও জ্ঞাপন না করে।" (সূরা কাহফ। আয়াত–৯৯)

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত বাণী হতে দেখা যায় যে তিনশ নয় বছর যাবৎ যুবকগণ নিদ্রিত অবস্থায় গুহার অভ্যন্তরে কাটিয়েছিল অথচ তারা বুঝতে পারে নি যে এত সুদীর্ঘ সময় কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। দাড়ি, গোঁফ, চুল ও হাতের নখ দেখে তাদের ভ্রম হচ্ছিল যে একদিন বা একদিনের কিছু অংশ তারা গুহাতে কাটায় নি। যুবকদের মধ্যে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছিল। একদলের মতে তারা পুরো একদিন নিদ্রিত অবস্থায় কাটিয়েছে। এ দ্বন্দ্বের অবসান করতে তারা একজনকে একটি রৌপ্যমুদ্রা সহ বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পাঠালো। সে বাজারে ঢুকে বিরাট এক পরিবর্তন দেখতে পেল। লোকজনের স্বভাব, আচার-আচরণ, নগরের দৃশ্য, গাছপালা, ইমারত সবই যেন তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হলো। মনে হলো সবই যেন নতুন, কেবল সেই শুধু পুরাতন। তার চেহারা, চালচলন প্রভৃতির সঙ্গেও কারো কোন সামঞ্জস্য নেই। নগরের লোকজনও তাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করতে লাগল। লোকটি জিনিসপত্র ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করে রৌপ্যমুদ্রাটি দোকানদারকে দিলে সবাই বুঝতে পারল যে সে মুদ্রাটি তিনশ বছর আগের, কেননা এতে সম্রাট দাকিয়ানুসের ছবি ছিল। এই সময়ের মধ্যে অনেক সম্রাট রাজত্ব করেছেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তদানীন্তন সম্রাট এ ঘটনা শ্রবণে লোকটিকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান এবং বিস্তারিত জেনে নিজেই তার সঙ্গী হয়ে গুহার নিকটবর্তী হন। অনেকের মতে সম্রাট গুহাবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অনেকে আবার বলে থাকেন যে সম্রাট ভীষণ অন্ধকারের দরুন এ গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি এবং তাদের সঙ্গে দেখাও হয় নি।

এরূপ আশ্চর্যজনক ঘটনা যে ঘটেছিল এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁর মহাবাণী কোরআনে।

এবারে আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের ঘটনা প্রবাহের মাঝেই এর সত্যতা প্রমাণ করতে চাই।

যদি কেউ অচেতন হয়ে এক মাস সময় কাটায়, তারপর তার চেতনা ফিরে আসে তবে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে কি সঠিক উত্তর দিতে পারবে? আমরা টাইফয়েড বা অনুরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত রুগীর ২১ দিন, ৪১ দিন পরও জ্ঞান ফিরতে দেখেছি। জ্ঞান ফিরে আসলে তাদের জিজ্ঞাসা করে উত্তর পাওয়া যায় নি যে কতদিন তারা এ অবস্থায় ছিল।

পার্থিব জগতের সময় নির্ধারণে যেখানে আমরা অপারগ সেখানে অপার্থিব জগতের সময় সম্বন্ধে আমাদের কতটুকু জ্ঞান ও ধারণা থাকিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ চাঁদে অভিযান করে এর সত্যতা আরও নিগূঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে। চাঁদে যখন বেলা দুপুর, পৃথিবীর সময় তখন হয় রাত্রি দুপুর। পৃথিবীর ব্যবহৃত ঘড়ি চাঁদে না নিয়ে শুধু সূর্যের অবস্থান যদি পৃথিবীতে বেতার সংকেতে জানিয়ে দেওয়া যায় তবেই চাঁদ ও পৃথিবীর সময়ের পার্থক্য ধরা পড়বে। এইভাবে বিশ্বের প্রতিটি স্থানে সময় দেখা যাবে পৃথিবীর সময়ের সঙ্গে মিল নেই। অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে সময়ের বিরাট গরমিল।

এবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি ও প্রমাণ করি যে পার্থিব এবং অপার্থিব স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কিরূপ। বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলেছেন,

"Let us suppose that a hollow projectile holding a man such as Jules Verne and Wells used on their voyages to the moon,

www.pathagar.com

should be sent off into space with a velocity one twenty thousandth less than light. If at the end of a year the projectile should be caught like a comet by the gravitation of some star and be swung and sent back to earth, the moon on steping out of his shell, would be two years older but he would find the world two hundred years older."

(Essay Lesson in Einstine by Edwin E. Slosson.)

অর্থাৎ "মনে করুন একটা ফাঁপা চোঙের ভিতরে একটি মানুষ পুরিয়া আলোকের বিশ সহস্রাংশের একভাগ কম গতিতে ঊর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইল। এক বৎসর চলিবার পর চোঙটি যদি কোন তারকার আকর্ষণে পড়ে এবং ধুমকেতুর মত সে যদি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়া পুনরায় সেই চোঙটিকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেয়, তবে লোকটি চোঙটি হইতে নামিয়া দেখিতে পাইবে তাহার বয়স মাত্র দুই বৎসর বাড়িয়াছে কিন্তু ইত্যবসরে পৃথিবীর দুইশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।"

জাগতিক ও মহাজাগতিক সময়ের মাধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার নির্ভুল হিসাব পেশ করার মত শক্তি যদিও কোন মানুষের নেই তবুও বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মতানুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে–

মহাজাগতিক ২ বছর = পৃথিবরি ২০০ বছর

অর্থাৎ মহাজাগতিক ১ বছর = পৃথিবীর ১০০ বছর।

এটা শুধু একটা নক্ষত্র ও পৃথিবীর সময়ের ব্যবধান। স্বর্গীয় সময়ের সঙ্গে কি ব্যবধান হবে তা আমরা হিসাব করে বের করতে অক্ষম। এবারে চলুন, কোরআনের সাহায্য নিই। সেখানে বলা হয়েছে–

"এবং নিশ্চয় তোমার **প্রতিপালকের** নিকট একটি দিবস তোমাদের গণনা অনুযায়ী সহস্র বৎসরের সমতুল্য।"[১] অর্থাৎ–

স্বর্গীয় ১ দিন= পৃথিবীর ১০০০ বছর

স্বর্গীয় ৩৬৫ দিন = পৃথিবীর ১০০০ × ৩৬৫ বছর

অর্থাৎ – স্বর্গীয় ১ বছর = পৃথিবীর ৩,৬৫০০০ বছর।

এর উপর নির্ভর করে আমরা আর একটি জটিল সমস্যারও সমাধান করতে পারি। সেটা হলো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময়। আল্লাহ বলেছেন ঃ-

"এবং নিশ্চয় আমি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়সমূহ ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই।"[২]

পার্থিব সময়ের হিসাব অনুযায়ী তা হলে দেখা যায় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে মোট সময় লেগেছিল –৬ × ১০০০ বছর = ৬০০০ বছর (যেহেতু ১ দিন- ১০০০ বছর)

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন মহাজাগতিক ও স্বর্গীয় সময়ের আর একটি ধারণা দিয়েছেন। তা নিম্নরূপ–

"সেই অপার্থিব জগতে সময় বহে না–মহাকর্ষ নিচের দিকে টানিয়া নামায় না। পদার্থ

টীকা ঃ ১ –কোরআন, সূরা হজ্ব। আয়াত–৪৭

২ –কোরআন, সূরা কাফ। আয়াত– ৩৮

www.pathagar.com

বলিয়া সেখানে কিছু নাই, আলোক সেখানে অচল। পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নতুন গণিত আমাদের স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই লইয়া যাইতেছে।"[১]

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন যে জগতের ইঙ্গিত দিয়েছেন সে জগৎ আমাদের জগৎ নয়। আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে যে জগৎ বিদ্যমান, সেই জগতের ধারনা তিনি দিচ্ছেন। সেই অপার্থিব জগতে সময় বলে কিছু নেই। এ কথা অসত্য বলে কেউ উড়িয়ে দিতে পারবে না। সম্পূর্ণই বিজ্ঞান ও ধর্মসম্মত। এই অপার্থিব জগতের যে ধারণা আমরা কোরআন ও রসুলের বাণী হতে পাই তাতে দেখা যায় যে সে জগৎ চিরস্থায়ী–বাস্তব ও অক্ষয়। যে জগতের ধ্বংস নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই তার সময়ের সীমা থাকার কথা নয়। তাই জ্ঞানী মনীষী আইনস্টাইনের কথা ধর্মের দিক থেকে সত্য।

আলোক সেখানে অচল– এ কথাটা কি উদ্দেশ্যে ও কি ধারণার উপর বলেছেন এটা আমরা বুঝতে অক্ষম। আলোক অচল এর অর্থে হয়ত তিনি বুঝেছেন যে, সেখানে আলোকের প্রভা নেই বা আলোকের কোন উৎসও নেই। তাঁর এ মতের সঙ্গে আমার কিছুটা মতপার্থক্য আছে।

আলোর উৎস নেই বা প্রভা নেই সেটা আমিও বলব সত্য, কেননা পুর্বে প্রমাণ করেছি যে পৃথিবীর প্রথম আকাশ ভিন্ন অন্য কোন আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র নেই। এগুলো না থাকার অর্থই আলোকের কোন উৎস নেই। কিন্তু আমার মতে আলোকের প্রভা আছে এবং সে প্রভা অত্যন্ত বেশি। সে জগৎ আলোকেরই জগৎ। আলো ভিন্ন আর কোন পদার্থ নেই। সে আলোকের উৎস চন্দ্র-সূর্য নয়–আল্লাহ স্বয়ং। কোরআন এ কথাই বলে।

"আল্লাহ্ নূরচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদ" (সূরা নূর)।

অর্থা– 'আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি।'

হযরতের বাণী হতে আমরা জানতে পারি যে জিবরাইল (আঃ) তাঁকে নিয়ে আকাশের শেষ সীমা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছান। এ পর্যন্তই বোরাক ব্যবহৃত হয়েছিল। এরপর সবুজ গালিচায় চড়ে হযরত একাই আলোর রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে আলোক ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোরআনও সে কথারই সাক্ষ্য দেয়।

'নূরুন আলা নূরুন'–অর্থাৎ আলোর উপরে আলো। (সূরা নূর)।

এ আলোকের মাঝে থেকে তিনি বিভ্রান্ত বা অতিক্রান্ত হন নি–এ তত্ত্ব কোরআন ও হাদিস থেকে জানা যায়।

এবারে আমরা রসুলুল্লার মিরাজের ঘটনা হতে দেখব যে সত্যই তিনি আকাশ ভ্রমণ করেছিলেন কি না। সেখানে কি দেখেছিলেন? কি পেয়েছিলেন এবং আমাদের জন্যই বা কি এনেছিলেন?

'বোরাক' নিয়ে আলোচনায় সময় একটা হাদিসে হযরতের প্রথম আকাশ বর্ণনার কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সেখানে হযরত আদমের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এবং পরবর্তী অংশটুকু নিম্নরূপ।

'তারপর জিবরাইল আমাকে লইয়া উঠিলেন দ্বিতীয় আসমানে এবং খুলিতে বলিলেন দরজা। প্রশ্ন হইল কে? তিনি বলিলেন জিবরাইল। প্রশ্ন হইল তোমার সাথে ইনি কে? তিনি

---

১ —Essay Lesson of Einstine.

www.pathagar.com

বলিলেন, মুহাম্মদ (দঃ)। আবার প্রশ্ন হইল 'ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কি তাঁহাকে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বলা হইল শুভাগমণ হউক তাঁহার। মঙ্গলময় তাঁহার আগমন। তারপর দরজা খোলা হইল। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম, দেখি ইয়াহিয়া ও ঈসা দুই বোনের বংশধর। জিব্রাইল বলিলেন, এই ইয়াহিয়া ও ঈসা (আঃ)–সালাম করুন ইহাদের। আমি সালাম করিলাম। তাঁহারা জবাব দিয়া বলিলেন, শুভাগমন হউক পুণ্যবান ভ্রাতা ও পুণ্যবান নবীর। তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে লইয়া উঠিলেন তৃতীয় আসমানে এবং খুলিতে বলিলেন দরজা। প্রশ্ন হইল–কে? তিনি বলিলেন, 'জিব্রাইল'। প্রশ্ন হইল—তোমার সাথে ইনি কে? তিনি বলিলেন 'মুহাম্মদ' (দঃ)। পুনরায় প্রশ্ন হইল—ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কি তাঁহাকে? তেনি বললেন, 'হ্যাঁ। বলা হইল, শুভাগমন হউক তাঁহার। মঙ্গলময় তাঁহার আগমন। তারপর খোলা হইল দরজা। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম দেখি কি ইউসুফ (আঃ)। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, ইনি ইউসুফ (আঃ), সালাম করুন ইহাকে। আমি সালাম করিলাম তাঁহাকে। তিনি জবাব দিয়া বলিলেন, শুভাগমন হউক পুণ্যবান ভ্রাতা ও পুণ্যবান নবীর। তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে লইয়া উঠিলেন চতুর্থ আসমানে এবং খুলিতে বলিলেন দরজা। প্রশ্ন হইল 'কে'? তিনি বলিলেন, 'জিব্রাইল'। প্রশ্ন হইল, তোমার সাথে ইনি কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (দঃ)। প্রশ্ন হইল, ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কি তাঁহাকে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বলা হইল, শুভাগমন হউক তাঁহার। মঙ্গলময় তাঁহার আগমন। তারপর খোলা ইহল দরজা। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম দেখি ইদ্রিস (আঃ)। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, ইনি ইদ্রিস (আঃ), সলাম করুন ইহাকে। আমি সালাম করিলাম তাঁহাকে। তিনি জবাব দিয়া বলিলেন, শুভাগমন হউক পুণ্যবান ভ্রতা ও পুণ্যবান নবীর। তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে লইয়া উঠিল পঞ্চম আসমানে এবং খুলিতে বলিলেন, দরজা। প্রশ্ন হইল, কে? তিনি বলিলেন, জিব্রাইল (আঃ)। প্রশ্ন হইল, তোমার সাথে ইনি কে? তিনি বলিলেন, 'মুহাম্মদ' (দঃ)। পুনরায় প্রশ্ন হইল, ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কি তাঁহাকে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বলা হইল, শুভাগমন হউক তাঁহার। মঙ্গলময় তাঁহার আগমন। তারপর খোলা হইল দরজা। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম, দেখি কি হারুন (আঃ)। জিব্রাইল বলিলেন, ইনি হারুন (আঃ), সালাম করুন হইাকে। আমি সালাম করিলাম তাঁহাকে। তিনি জবাব দিয়া বলিলেন, শুভাগমন হউক পুণ্যবান ভ্রাতা ও পুণ্যবান নবীর। তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে লইয়া উঠিলেন, ষষ্ঠ আসমানে এবং খুলিতে বলিলেন দরজা। প্রশ্ন হইল, কে? তিনি বলিলেন, জিব্রাইল (আঃ)। প্রশ্ন হইল, তোমার সাথে ইনি কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (দঃ)। পুনরায় প্রশ্ন হইল, ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কি তাঁহাকে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বলা হইল, শুভাগামন হউক তাঁহার। মঙ্গলময় তাঁহার আগমন। তারপর খোলা হইল দরজা। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম দেখি কি মুসা (আঃ)। জিব্রাইল বলিলেন, ইনি মুসা (আঃ)–সালাম করুন ইহাকে। আমি সালাম করিলাম তাঁহাকে। তিনি জবাব দিয়া বলিলেন, শুভাগমন হউক পুণ্যবান ভ্রাতা ও পুণ্যবান নবীর। যখন আমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিলাম তিনি কাঁদিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কেন কাঁদিতেছেন আপনি? তিনি বলিলেন, আমার পর প্রেরিত হইয়াছেন এক যুবক, যাহার উম্মত অধিক সংখ্যায় বেহেশতে প্রবেশ করিবে আমার উম্মতের চেয়ে। তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে লইয়া চড়িলেন সপ্তম আসমানে এবং খুলিতে বলিলেন, দরজা। প্রশ্ন হইল, কে? তিনি বলিলেন, জিব্রাইল

www.pathagar.com

(আঃ)। প্রশ্ন হইল তোমার সঙ্গে ইনি কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (দঃ)। পুনরায় প্রশ্ন হইল, ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কি তাঁহাকে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বলা হইল, শুভাগমন হউক তাহার, মঙ্গলময় তাঁহার আগমন। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম, দেখি ইব্রাহিম (আঃ)। জিব্রাইল বলিলেন, **ইনি আপনার পিতা ইব্রাহিম (আঃ)**, সালাম করুন ইহাকে। আমি সালাম করিলাম তাঁহাকে। তিনি জবাব দিয়া বলিলেন–শুভাগমন হউক পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীর। তারপর আমাকে তোলা হইল প্রান্তস্থিত **কুলবৃক্ষের** নিকটে, দেখি কি উহার ফল হিজরের মটকার মত এবং পাতা হাতীর কানের মত। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, এইটি প্রান্তস্থিত কুলবৃক্ষ। হঠাৎ দেখি কি চারটি নদী, দুইটি গুপ্ত ও দুইটি প্রকাশ্য। আমি বলিলাম, এ দুইট কি জিব্রাইল (আঃ)? তিনি বলিলেন, গুপ্ত দুইট বেহেশতের নদী ও প্রকাশ্য দুইটি নীল ও ফোরাত নদী। তারপর আমাকে দেখান হইল বায়তুল মামুর। উহাতে প্রত্যহ প্রবেশ করে ৭০ হাজার ফেরেশতা। অতঃপর আমার জন্য আনা হইল একপাত্র মদ, একপাত্র দুধ ও একপাত্র মধু। আমি দুধ লইলাম, তিনি বলিলেন, উহা **প্রকৃতি**, যাহার **উপরে আপনি ও আপনার উম্মত অবস্থিত**।

তারপর আমার উপর ফরজ করা হইল পঞ্চাশ বার নামাজ প্রতিদিন।[১]

রসুলুল্লার বাণী হ'তে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। যারা সপ্তাকাশের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পান না, শূন্য মহাশূন্য বলে উড়িয়ে দেন, 'ব্যোম' বলে আকাশকে আখ্যায়িত করেন, তারা দেখে নিন সপ্তাকাশ আছে কি না। শূন্যের উপর কুলবৃক্ষ, বায়তুল মামুর, নদ-নদী প্রভৃতি যা হযরত দেখেছেন এবং যার বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলো থাকা সম্ভব কি না।

প্রথম আকাশের দরজা খুলে হযরত দেখা পেলেন আদি পুরুষ **হযরত আদম** এর (আঃ)। দ্বিতীয় আসমানের দরজা খুলে সাক্ষাৎ করলেন **হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে**। তৃতীয় আসমানে **হযরত ইউসুফের (আঃ) সঙ্গে**, চতুর্থ আসমানে **হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর সঙ্গে**। পঞ্চম আসমানে **হযরত হারুন (আঃ) সঙ্গে**। ষষ্ঠ আসমানে **হযরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে** এবং **সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সঙ্গে**। আসমানের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করার অর্থও এ নয় যে আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই।

অনেকেই বলে থাকেন হযরতের নভোভ্রমণ বা মিরাজ স্বপ্নযোগে অথবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সম্পন্ন হয়েছিল। এরূপ ধারণা শুধু অবাস্তবই নয় অর্থহীন। বিশ্বাসের অভাব হেতু এরূপ ধারণার মাঝে মিরাজকে সীমাবদ্ধ রেখে হযরতের জীবনের এমন অলৌকিক ঘটনা তথা বৈজ্ঞানিক অভিযানকে বানচাল করে দিতে চান। আমেরিকার নভোচারিগণ চাঁদে ভ্রমণ করে চাঁদের নুড়ী পাথর ও ধুলিকণা প্রমাণের জন্য পৃথিবীতে বহন করে এনেও একদল অবিশ্বাসীর কাছে আজও মিথ্যাবাদী হয়েই কলঙ্ক বহন করেছেন। যদি আর কোন নভোচারী চাঁদে অভিযান না করেন এবং রকেট তৈরির পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীতে মানুষ গড়ার পরিকল্পনায় হাত দেন, তবে দু-এক হাজার বছরের পর মানুষ চাঁদের এ অভিযানকে আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতই মনে করবে। ইতিহাসকে অবিশ্বাস করবে ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে নিছক কল্পনা ভাববে।

টীকা ঃ ১ –সহীহ বুখারী, তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। মিরাজ পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ২/৪০৮।

www.pathagar.com

চাঁদ হতে ধুলিকণা ও পাথর নিয়ে এসে যেমন নভোচারীরা প্রমাণ করলেন যে তাঁরা চাঁদে অভিযান করেছেন, তেমনি বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে জগৎ ও মহাজগতের অদৃশ্য তত্ত্ব সমূহ পেশ ক'রে প্রমাণ করলেন যে বৈজ্ঞানিকের উপর তিনি মহাবৈজ্ঞানিক; জ্ঞানীরউপরে মহাজ্ঞানী, পণ্ডিতের শীর্ষে তিনি মহাপণ্ডিত। অন্যান্য নবী পযগম্বরগণ হযরতের মত বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজে আবির্ভূত হন নি। এ বৈজ্ঞানিক Theory ও Practice একই সাথে করে পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে যেমন দরকার Theory, তেমনি দরকার Practice। সপ্তাকাশ ভ্রমণের ভাগ্য যদি তাঁর না হতো, আল্লাহর সঙ্গে যদি তাঁর প্রত্যক্ষভাবে কথোপকথন না হতো, বেহেশত, দোজখ, আরশ কুরশী, বায়তুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহা যদি স্বচক্ষে তিনি না দেখতেন তবে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মাত না; পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলেও নিজে দাবী করতে পারতেন না। বায়তুল মামুরে পয়গম্বরদের মাঝে ইমামতি করে যিনি নমাজ আদায় করলেন, রাফরাফ-এর সাহায্যে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করে যিনি মহালোকের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন, তিনি কি আমাদের মত বৈজ্ঞানিক? এ বৈজ্ঞানিকের তুলনা চলে না, এ নভোচারীর অভিযানের ধারা কেউ জানে না।

মিরাজের ঘটনা স্বপ্নযোগে নয়, কল্পনাযোগে নয়, আধ্যাত্মিক যোগেও নয়, খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই হয়েছিল হযরতের জীবনে। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী সমূহ এ কথার প্রমাণ দেয়–(১) ইবনে আব্বাছ (রাঃ) খোদাতায়ালার এই বাণীর–

'আমি তোমাকে যে দৃশ্য দেখাইয়াছি তাহা শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য–ব্যাখ্যায় বলেন, **উহা ছিল চাক্ষুষ দৃশ্য যাহা রসুলুল্লাকে (দঃ) দেখান হয়েছিল** যে রাত্রিতে তাঁহাকে বায়তুল মোকাদ্দেস পর্যন্ত ভ্রমণ করান হয়। এবং তিনি আরও বলেন–ঐ অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা কোরআনে আছে–'উহা জাক্কুম তরু'।[১]

(২) ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে অন্যত্র বর্ণিত আছে–

"নবী (সাঃ) বলিয়াছেন, যে রাত্রিতে ভ্রমণ করান হয় আমাকে (মিরাজ), আমি মূসা (আঃ) কে দেখিলাম গম-এর রং–বক্রকেশ মানুষরূপে যেন শনূয়ার লোক, আর ঈসা (আঃ) কে দেখিলাম মধ্যম আকৃতি, সাদা ও লালের মধ্যবর্তী রং এর সরলকেশ মানুষ রূপে এবং দেখিলাম দোজখের দারোগা মালিককে এবং দজ্জালকে। খোদা আমাকে যে সব নিদর্শন দেখাইলেন তাহার মধ্যে–অতএব তুমি সন্দেহে থাকিও না দজ্জালের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে।"[২]

(৩) যে রাত্রে কাবার মসজিদ হতে রসুলুল্লাহ মিরাজ হয় তার বর্ণনা প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, ঐ রাত্রে তিন ব্যক্তি মসজিদে এসেছিলেন। হযরত তখন ঘুমিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ দিয়ে বলেছেন, "জিব্রাইল তার ভার নিলেন এবং তাঁকে নিয়ে আসমানে উঠলেন।"[৩]

মিরাজের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে আমরা অদৃশ্য বিষয়ের অনেক তত্ত্ব জানতে পারি। স্বপ্ন দেখে এমন সব জটিল তত্ত্ব কেউ দিতে পারে না। যে জিব্রাইল হযরতকে সঙ্গে নিয়ে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত পৌঁছে দেন সে জিব্রাইল (আঃ) এর স্বরূপও কিছু জানা যায় হযরতের বাণী থেকে। তিনি বলেন যে, **তিনি জিব্রাইলকে (আঃ) দেখেছিলেন। তাঁর ছিল ছয়শত পাখা।**[৪]

টীকা ঃ ১ –সহীহ বুখারী, মিরাজ পরিচ্ছেদ। তর্জমা–আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৩৭৪। হাঃ নং ৩/৪১০
'রাফ রাফ'– অর্থ সবুজ গালিচা। সংগৃহীত বুখারী, সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৮৬।

২ –সহীহ বুখারী। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত, সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ২৩/১৯৪ পৃষ্ঠা ১৮৭-৮৮।

৩ –সহীহ বুখারী, তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১৯/১৯০ পৃঃ ১৮৬।

৪ –ঐ ২৯/৩২১ .. ২৯২।

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও এটা সত্য বলেই বিশ্বাসীদের ধারণা করে নিতে হবে। কেননা যে জিব্রাইলকে আকাশে বাতাসের মাঝে সর্বত্র চলতে হয়, চোখের পলকে কোটি কোটি মাইল ভ্রমণ করতে হয়, তার গতি কি মন্থর হলে চলে?

আলোর গতির চেয়েও শক্তিশালী গতি ছিল তাঁর দেহের। বোরাকের গতি, হযরতের গতি ও জিব্রাইলের গতির মধ্যে ছিল পূর্ণ সামঞ্জস্য। তাই হযরত আকাশ ভ্রমণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বোরাক তাঁকে নিয়ে চলতে পেরেছিল আর জিব্রাইল (আঃ) বোরাককে আয়ত্তে রেখে হযরতকে সঙ্গী করে আকাশের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। যদি কারো সাথে কারো কোন মিল না থাক্‌ত তবে এতবড় অভিযান মোটেই সম্ভব হ'তো না।

জিব্রাইল (আঃ) এর সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত বাণীটি অন্যতম ঃ-

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'যে বলে যে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভুকে দেখিয়াছিলেন–সে বেশি বলে;[২] বরং তিনি দেখিয়াছিলেন জিব্রাইলকে (আঃ) তাঁহার আপন আকৃতি ও রূপে আসমানের কিনার জুড়িয়া।'[৩]

'আসমানের কিনার জুড়ে' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোন মানুষ, জীবজন্তু বা বৃক্ষলতার রূপে হলে তা একটা সীমার মধ্যেই ব্যপ্ত বুঝাতো। কিন্তু আসমানের কিনার জুড়ে অর্থ ব্যাপক জায়গা জুড়ে। অসামান্য জায়গা জুড়ে যার পরিব্যাপ্তি তার রূপ যে আলোর রূপেই ছিল এতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। এখান থেকে আরও একটি ধাঁধাঁরও অবসান হচ্ছে।

কোরআনে আমরা দেখেছি যে ফেরেশতাদের নূর[৪] হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা বাকারাহ)। এই নূর বা আলোই ছিল জিব্রাইল দেহের উপাদান, তাই তাঁর আসন আসমানের প্রান্ত জুড়ে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। রসুলুল্লার (দঃ) এ দৃষ্টি তা'হলে ছিল বাস্তব। এতে কোন সন্দেহ নেই।

মিরাজ যে প্রত্যক্ষভাবেই হয়েছিল তার আরও কয়েকটি প্রমাণ হযরত (দঃ) দিয়েছেন তাঁর বাণীতে, যা নিম্নরূপ।

(৪) নবী (সঃ) বলেছেন ঃ-

"আমি উঁকি মারিয়াছিলাম বেহেশতে, দেখিলাম উহার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র লোক এবং উঁকি মারিয়াছিলাম দোজখে, দেখিলাম উহার অধিকাংশ অধিবাসী স্ত্রীলোক।"[১]

(৫) হযরত (দঃ) বলেছেনঃ-

"আমি (মিরাজে) ঈসা, মূসা ও ইব্রাহিম (আঃ)কে দেখিয়াছি। ঈসা (আঃ) গৌরবর্ণ, বক্রবেশ ও প্রশস্তবক্ষ ঃ আর মূসা (আঃ)–গোধূম বর্ণ, স্থূলকায় ও সরলকেশ যেন যও গোত্রীয়।"[২]

আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগে মিরাজ সম্পন্ন হ'লে রসুল (সঃ) এর বাণী ভিন্নতর হতো। এমন সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ণনা দিতেন না 'আমি উঁকি মারিয়াছিলাম-

---

টীকা ঃ ২–এটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিজের মত। অধিকাংশ আলেমদের মতে হযরত (দঃ) আল্লাহকে দেখেছিলেন।

৩ –সহীহ বুখারী–তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ।

৪ –সহীহ বুখারী–তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। ১ম খণ্ড-পৃষ্ঠা ১৮৯।

১ –সহীহ বুখারী তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৪৫।

টীকা ঃ ২–সহীহ বুখারী তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ, ২৪৫।

www.pathagar.com

দেখিলাম। কেননা স্বপ্নযোগে যা দেখতেন তার যে বিশ্লেষণ দিতেন তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গোপন করেন নি বা নিজের গৌরব ও বাহাদুরী দেখাতে স্বপ্নের কথা এড়িয়ে যান নি। স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক যোগে সম্পন্ন হয়েছে বলে হযরত (দঃ) এর জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে কার্পণ্য করেন তারা দেখুন হযরত (দঃ) এর স্বপ্নে দৃষ্ট বাণীর বর্ণনা কেমন।

আবু হুরাইরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–'আমরা নবী (সঃ) এর নিকট ছিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন, "একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখি কি আমি বেহেশতে আছি–আর একটি স্ত্রীলোক এক প্রাসাদের এক কোণে ওজু করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই প্রাসাদটি কাহার? লোকেরা বলিল, "ওমর ইবনে খাত্তাবের।" আমি তাহার ঈর্ষার খেয়াল করিয়া পিছনে ফিরিয়া আসিলাম। ইহা শুনিয়া ওমর কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, আপনার প্রতি ঈর্ষা হে রসুলুল্লাহ।"[৩]

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নভোমণ্ডলের শেষ স্তর পর্যন্ত ভ্রমণ করে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন ইতিপূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই তা করতে পারেন নি। সপ্তাকাশ ভ্রমণতো দূরের কথা, প্রথম আকাশের বিভিন্ন স্তরে যে সব গ্রহ-ক্ষত্র বিরাজমান তাদের সন্ধান দিতেই ব্যর্থ হয়েছেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) আকাশ ভ্রমণ করেছেন–বায়ুকে কন্ট্রোল করেছেন, জীবজন্তুর ভাষা আয়ত্ত করেছেন সত্যকথা, কিন্তু প্রথম আকাশের স্তর ভেদ করে অন্য আকাশের স্তরে পৌছাতে পারেন নি–বা সৌর-জগতের উপরও কোন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি। 'সিদরাতুল মুনতাহা' ও 'বায়তুল মামুর' পর্যন্ত ভ্রমণ করে অজ্ঞাত বিশ্বের কোন পরিচয়ও দিতে পারেন নি। বাবেল অধিপতি পরাক্রমশীল সম্রাট নমরূদ খৃঃ পূঃ ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে আল্লাহর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে শকুনের সাহায্যে নভোমণ্ডল ভ্রমণ করেছিলেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের স্তর শেষ করে হাল্কা গ্যাসীয় স্তরে বা উল্কামণ্ডলীতে গিয়েছিলেন বলেও কোন প্রমাণ মেলে না। প্রথম আকাশের বিভিন্ন স্তরের একটা স্তর অতিক্রম করার প্রমাণ যেখানে মেলে না, তাঁর নিজস্ব উক্তির মাধ্যমেও যার কোন তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায় না, তাকে আকাশ বিজ্ঞানী বলাও চলে না।

বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৯৫৮ সনে রাশিয়ার নভোচরী ইউরী গ্যাগারিন 'ভোস্তকে' আরোহণ করে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন এবং ৯৭ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এক ইতিহাস রচনা করেন। এরপর ১৯৬৯ সনের ২০শে জুন 'এপেলো–১১' এর সাহায্যে আমেরিকার তিনজন নভোচারী আর্মষ্ট্রং, এডউইন অলড্রিন মাইকেল কলিন্স আকাশের অসংখ্য স্তরের মাত্র একটি স্তরের উপগ্রহ চাঁদে অভিযান করে সারা বিশ্বে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। কৃতিত্বের দিক দিয়ে যদিও আমাদের চোখে তাঁরা অনেক মহান তবুও আকাশ অভিযানে আমাদের বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার তুলনায় পূর্বোক্ত ও পরবর্তী নভোচারীদের কৃতিত্ব কিছুই নয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর এ আকাশ বিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যুগ যুগের এক অমর বৈজ্ঞানিক।

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ চাঁদে অভিযান করেছেন, কিন্তু চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। এ অমর বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) চাঁদকে তাঁর তর্জনীর ঈশারায় দ্বিখন্ডিত করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। এটা আজগুবি কোন কথা নয়, মুখরোচক গল্পও নয়। কোরআন ও হাদিস এর সাক্ষ্য দেয়।

---

৩ –ঐ বুখারী তর্জমা। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৯০।

www.pathagar.com

"এক্ তারাবাতে বাইয়াতো ওয়ান শাক্কালকামার।"[১]

অর্থাৎ, "সেই সময় সন্নিকটবর্তী হইতেছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।"

হযরত (দঃ) এর মক্কা অবস্থান কালে, অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা বলেছিল, "তুমি যদি আল্লাহর পয়গম্বর হও তবে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রমাণ কর।" পূর্বের পয়গম্বরগণ অবশ্য এরূপ অলৌকিক শক্তি হাতে নিয়ে এসেছিলেন। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি যা নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্পে রূপান্তরিত হতো—ঈসা (আঃ) এর মৃত ব্যক্তিকে জীবন দানের ক্ষমতা—হযরত সোলায়মান (আঃ) এর বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি ইত্যাদি। অবিশ্বাসীদের এরূপ প্রশ্নে হযরত (দঃ) প্রথমে একটু হতভম্ব হন। এরপর আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তাঁকে এ অসাধারণ শক্তি দান করে তাঁর প্রিয় রসুলের সম্মান ও ক্ষমতার নিদর্শন দেখান।

হযরত (দঃ) তর্জনী দিয়ে আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর এক অংশ আবুকবিস পর্বতে এবং অন্য অংশ নিকটবর্তী এক পাহাড়ে পতিত হয়। বিশ্বস্ত আরববাসী যারা এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন। নিম্নে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

আবদুল্লা—বিন—মসউদ বলেছেন ঃ- রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর সময় চাঁদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক'।[১]

আমার রচিত 'জগৎগুরু মুহাম্মদ' (দঃ)–পুস্তকে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বেদ-পুরাণ একটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করেছি (৮১ পৃষ্ঠাহতে ১০৬ পৃষ্ঠা)। সেখানে মহর্ষি ব্যাস রচিত ভবিষ্য পুরাণ [প্রতিসর্গ পর্ব ৩ ঃ ৩ এবং ৩ ঃ ৫-২৭] এর কয়েকটি মূল্যবান পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছি। জ্ঞানী-গুণী, ঋষি-মহর্ষি ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিরা যারা আমার এ বইখানি পড়েছেন তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি এ পরিচ্ছেদটি পাঠ করে। এখান থেকে ১০১ পৃষ্ঠার মাত্র ৪টি পংক্তি পাঠকবৃন্দের নিকট উপস্থিত করছি। দেখুন কি ভক্তি, শ্রদ্ধা হৃদয়ে পুরে, প্রাচীন ভারতের এক সুপ্রসিদ্ধ রাজা ভোজরাজ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর চন্দ্র-দ্বি-খণ্ডিত করার ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী বের হয়ে আসে এই ভাষায় ঃ-

"ভোজরাজ' উবাচ নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নির্বাসনে।
ত্রিপুর সুরনাশায় বহু মায়া প্রবর্ত্তিনে ॥ ৭ ॥
ম্লেচ্ছ গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদান্দরূপিণে।
তাং মাং হিং বিষ্করং বিদ্ধি শরনার্থমূপাগত" ॥ ৮ ॥

অর্থ ঃ-

"ভোজরাজ কহিলেন–হে মরুস্থল বাসী গিরিজানাথ। তোমায় নমস্কার করি। তুমি পাপিষ্ট শয়তানকে নাশ করিবার বহু উপায় জান। ম্লেচ্ছ বিরোধী হইতে তুমি বিমুক্ত। স্তুতি পাঠক কহিলেন (ভোজরাজ)–হে মানবশ্রেষ্ঠ মহাপ্রভু! আমি তোমার দাস। তোমার চরণতলে আমাকে স্থান দাও।"

জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের ১০৭-১০৯ পৃষ্ঠা টীকা -৫ এ ভোজরাজ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বর্ণনা দিয়েছি। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য সেখান থেকে কিছুটা তুলে ধরছি।

যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলায় ভোজপুর নামে একটি স্থান আছে। সেখানে মাঠের মধ্যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। প্রস্তর ফলকে জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতদের বহু মূল্যবান মন্ত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোজরাজ সেখানকার রাজা ছিলেন। রাজপ্রাসাদ এবং

টীকা ঃ ১ –সহীহ বুখারী (তজরীদ)–তর্জমা পূর্বে বর্ণিত, দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা–৩০৯।

www.pathagar.com

রাজধানীও ছিল ঐখানে। এই রাজা ছিলেন পুণ্যবান ও আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। পরদিন সকালে তিনি জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতদের ডেকে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন এবং গুপ্তভেদ বর্ণনা করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেন। পণ্ডিতগণ গণনা করে একমত হয়ে বলেনঃ-

"আমাদের গণনা অনুসারে আমরা বুঝতে পারছি যে আরবদেশে এক মহাঅবতারের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সব ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে এবং এই ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিনত হবে। তিনিই চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করেছেন।

এতদ শ্রবণে ভোজরাজ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আরব দেশে প্রেরণ করেন। ঐ সময় ভারত ও আরব দেশের মধ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চল্‌ত। ঐতিহাসিকগণ এ প্রমাণ দিয়েছেন। দূতগণ দেশে ফিরে ভোজরাজকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা ও হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রচারিত ধর্ম সম্মন্ধে বিস্তারিত জানালে ভোজরাজ এবং ঐ দূতগণ এক সঙ্গে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে প্রজাগণ এবং তাঁর বংশধর বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে উপদ্রব করতে থাকলে তিনি গুজরাটের 'ধারওয়ার'–নামক স্থানে গমন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। তার মুসলিম নাম ছিল 'শেখ আবদুল্লাহ্'। গোরক্ষপুর নিবাসী মৌলানা সোবহানুল্লাহ্ সাহেবের পাঠাগারে এ ভোজরাজার ইতিহাস আজও রয়েছে।

আর্যধর্মের পণ্ডিত ও সাহিত্যিক 'লালা হংসরাজ' ভারতে ইসলাম ধর্মের বিস্তারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভোজরাজের এ তত্ত্ব উদ্ধার করেছেন। এক প্রাচীন মন্দির হ'তে সংস্কৃত ভাষায় রাজা কর্তৃক লিখিত একটি ইতিহাস তাঁর হস্তগত হয়। কেন রাজা মুসলীম হলেন স্পষ্টভাবে তা লেখা রয়েছে। রাজা লিখেছেন ঃ-আমি একদা রাত্রিকালে আকাশে চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখলাম এবং এদর্শনে নিতান্ত ভীত হলাম। আমি জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতদের এর গুঢ়তত্ত্ব নিরুপন করতে আহ্বান করলাম তাঁরা তদুত্তরে বললেন,

"আরবদেশে এক মহাপুরুষ দৈবশক্তিবলে চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত ক'রে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ করেছেন। তাঁর দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তারা এই দাবি উত্থাপন করেছে যে যদি তিনি চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করতে পারেন, তবে তারা তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করবে। সেজন্য তিনি এ কাজ করেছেন। তার প্রচারিত ধর্ম ইহলোক ও পরলোকে মুক্তির আশ্বাস দান করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করে।"

ভোজরাজা একাধারে ছিলেন প্রতাপশালী রাজা, আর অন্যদিকে ছিলেন মহাবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, ধর্মপরায়ণ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান সম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি যার প্রভাবে ৭ জন দূতসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হন। আজও এ মহান ব্যক্তির উদ্ধৃতি হিন্দু সমাজ দিয়ে থাকে এই ভাবে ঃ-

"কাঁহা রাজাভোজ আর কাঁহা গঙ্গারাম তেলী।"

গুজরাটে এই ভোজরাজের সমাধি আজও বিদ্যমান রয়েছে। চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হবার ঘটনা ভোজরাজকে যেমন স্তম্ভিত করেছিল চোদ্দশ বছর পরে আবার তেমনি অবাক করে দিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নভোচারী নীল আর্মষ্ট্রংকে। চন্দ্রে অভিযান করে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন চন্দ্রের দ্বি-খণ্ডিত হবার চিহ্ন। তাই আগ্রহান্বিত হয়ে চন্দ্র হতে এনেছিলেন যোগ সূত্রের ঐ সব পাথর ও অন্যান্য উপাদান। এগুলো পরীক্ষা করে যান বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করলেন–"চোদ্দশ বছর পূর্বে–এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তখন চিৎকার দিয়ে নীল আর্মষ্ট্রং তৌহিদবাণী মুখে এনে মুসলমান হলেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মিল–আল্লাহর নবী সত্য। কোরআন সত্য। ইসলাম ধর্মও সত্য। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদের বাণীও সত্য।"

www.pathagar.com

সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ

শুধু চাঁদের উপরই নয়, সূর্যের উপরও ছিল হযরতের দখল। সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সূর্যের গতিধারাকে স্তব্ধ করার কৌশল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই–একথা সবাই জানে এবং বিশ্বাস করবে। কোন বৈজ্ঞানিকেরও আজ পর্যন্ত এরূপ খেয়াল হয় নি এবং হবে বলেও মনে হয় না যে সূর্যের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করা যায়। নমরূদ নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেছিলেন, আল্লাহকে মারতেও আকাশে উঠেছিলেন কিন্তু এমন দুর্বুদ্ধি হয় নি যে আল্লাহর সূর্যকে আকাশ পথে বাধা দিয়ে সবার কাছে প্রমাণ করবেন যে তিনি আল্লাহ, তাঁর নির্দেশেই সূর্য স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক নবী হযরত (দঃ) তা করেছিলেন। একথা হয়তো অনেকে জানেন। যারা জানেন না তাঁরা শুনুন ঘটনাটা কি। কেন হযরত সূর্যকে আদেশ করেছিলেন স্থির থাকতে।

একদিন হযরত আলী (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন বেলা প্রায় ডুবু ডুবু। অথচ তাঁর আসরের নামাজ পড়া হয় নি। এ নামাজ সাধারণতঃ বৈকাল চারটা হতে সূর্য লাল হবার পূর্ব পর্যন্ত পড়া চলে। হযরত আলী তখন নামাজ পড়া হচ্ছে না দেখে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং রসুলুল্লাহ্‌কে (দঃ) তাঁর এ অভিপ্রায় জানান। হযরত তাঁকে নির্দেশ দিলেন নামাজ পড়তে এবং সূর্যকে নির্দেশ দিলেন স্থির হ'য়ে থাকতে। হযরত আলী নামাজ শেষ ক'রে দেখতে পেলেন সূর্য যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। ঘটনা যারা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁরা হযরতের এ অলৌকিক ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েন।

এমন অলৌকিক শক্তি পয়গম্বরদের দেওয়া হয়–যুগে যুগে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। হযরত সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন শুনে যাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না তারা দেখুন পূর্বে এরূপ ঘটনা ঘটেছে কি না।

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "কোন এক নবী জেহাদ করিতে চাহিলেন, বলিলেন, আমার সঙ্গে যাইবে না এমন কেহ যে বিবাহ করিয়াছেন কোন নারীকে এবং সহবাস করিতে চায় তাহার সহিত কিন্তু এখনও সহবাস করে নাই অথবা যে নির্মাণ করিয়াছে ঘর কিন্তু ছাদ পাটে নাই উহার, অথবা যে কিনিয়াছে ছাগল, ভেড়া বা উট এবং প্রতীক্ষা করিতেছে উহাদের প্রসব। তারপর তিনি জেহাদ করিলেন এবং এক গ্রামের নিকট পৌঁছিলেন। আসরের নামাজ বা উহার কাছাকাছি সময়ে এবং সূর্যকে বলিলেন, তুমি খোদার হুকুমের অধীন এবং আমিও ।' হে খোদা! তুমি আটক রাখ তাহাকে আমাদের উপর; তখন আটক রাখা হইল তাহাকে–এবং খোদা জয় দিলেন তাহার হস্তে।"[১]

হযরত এ ঘটনার উল্লেখ করে দেখিয়ে দিলেন যে এমন অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁরও আছে যা তিনি প্রত্যক্ষভাবে হযরত আলীকে দেখালেন। শুধু তাই নয়, একথাও প্রমাণ করলেন যে বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর আছে অগাধ অধিকার।

প্রতিটি সৃষ্ট জীবের সঙ্গেই যেন তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের স্বরূপ, সৃষ্টি রহস্য, অবস্থান, ক্রিয়াকলাপ এগুলো যেন নিখুঁতভাবে তিনি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি আমাদের দিয়েছেন অজস্র থিওরী যা বৈজ্ঞানিকরা যুগে যুগে বিশ্লেষণ করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

টীকা ঃ ১ –সহীহ বুখারী (তজরীদ) তর্জমা পূর্বে বর্ণিত, হাঃ নং ১২১ / ১৫০ দ্বিতীয় খণ্ড।

www.pathagar.com

বাইবেল-তৌরাত
যিহোশূয়ের পুস্তক-পরিচ্ছেদ
১০/১২-১৪

"যেদিন সদাপ্রভু ইস্রাইল সন্তানগণের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে সমর্পণ করেন, সেইদিন যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন আর তিনি ইস্রাইলের সাক্ষাতে কহিলেন ঃ-

সূর্য তুমি স্থগিত হও গিবিয়নে
আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে।

তখন সূর্য স্থগিত হইল ও চন্দ্র স্থির থাকিল যাবৎ সেই জাতি শত্রুদিগের প্রতিশোধ না লইল। এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লিখিত নাই? আর আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল অস্তগমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস ত্বরা করিল না। তাহার পূর্বে কি পরে সদাপ্রভু যে মনুষ্যের রবে এইরূপ কর্ণপাত করিলেন, এমন আর কোনদিন হয় নাই; কেননা **সদাপ্রভু ইস্রাইলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন।"**

বাইবেলের পবিত্র বাণী হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বের একজন নবী কে চন্দ্র-সূর্যের গতি, স্তব্ধ করার ক্ষমতা আল্লাহ নিজেই দিয়েছিলেন। একথা ইহুদী ও খ্রীষ্টান ভাইদের বিশ্বাস করতেই হবে যাদের সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস রয়েছে। কেননা এ বাণী মানুষের নয়। তাদের নবীর উপরই অর্পিত হয়েছিল। যদি তাই হয় তবে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)–যিনি নবীকূল শিরোমনী তাঁর পক্ষে চন্দ্র-সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করা কি অসম্ভব? বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের দ্বি-খণ্ডিত হবার ঘটনাকে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বলে চোদ্দশ বছর পর স্বীকার করতে পারেন তবে একই আকাশে অবস্থিত ভ্রমণশীল সূর্যের গতিকে কেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) স্থির করে রাখতে পারবেন না?

সৃষ্ট জীবের জোড়া

সমাজ বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর একটা বাণী ধরে আলোচনা করেছি বাণীটি ছিল নিম্নরূপ–"আল্লাহ্ প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের সঙ্গে উহার বিজেতাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাহার দয়াকে সৃজন করেছেন তার ক্রোধকে পরাজিত করতে।"[১]

প্রতিটি সৃষ্ট জীবেরই যে জোড়া আছে এ কথা হয়ত কেউ বিশ্বাস করত না যদি John Dulton, Avogardro, Faraday প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থকে ভেঙ্গে তার শেষ সীমায় না পৌঁছতেন। পদার্থের শেষাংশকে Electron ও Proton বলা হয়। Electron-Negative আর Proton-Positive। অর্থাৎ পদার্থের এই সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম অংশের একটা স্ত্রী জাতীয়, অপরটা পুরুষ জাতীয়। এদের সংমিশ্রনেই হয় নতুন সৃষ্টি। ইলেকট্রন প্রোটনের দিকে ধাবিত হয়। প্রোটনও ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে। নারী পুরুষের মধ্যে যেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান, তাদের মিলনে যেমন নব সৃষ্টি লাভ করে, তেমনি এ ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝেও রয়েছে এক বিস্ময়কর আকর্ষণ ও অদ্ভুত মিলন থিওরী। এ থিওরীকে অবলম্বন ক'রে প্রতিটা পদার্থ একে অপরকে আকড়িয়ে আছে ও শৃঙ্খলিত নিয়মে তাদের কর্তব্য পালন করছে।

টীকা ঃ ১ –সগীর, সংগৃহীত, হাদিসের আলো, তর্জমা আজাহার উদ্দীন এম. এ. দয়া পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ৪৫৫।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পদার্থ বিজ্ঞানী হ'য়ে জন্ম নিয়েছিলেন কি না জানি না, পদার্থের রূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন কি না জানি না বা ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষা কার্য চালিয়েছিলেন কি না জানি না–তবে প্রতিটি পদার্থের স্বরূপ, গুণাগুণ, কার্যকারিতা ও জন্মদানের প্রক্রিয়া যে জানতেন একথা পুরানো যুগের পুরানো জ্ঞানীরা অবিশ্বাস করলেও অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য। কেননা তাঁরা যে কথা পরীক্ষাগারের পরীক্ষা থেকে বলেছেন তার চাইতেও অনেক মূল্যবান কথা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর মহাজ্ঞানের উৎস থেকে বলে দিয়েছেন। নিগূঢ় তত্ত্বমূলক এসব বাণী যা হযরত দিয়েছেন তা যে সত্য কোরআন তার প্রমাণ দেয়। সেখানে বলা হয়েছে–"এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা অনুধাবন কর।"[২]

"তিনিই পবিত্রতম যিনি ভূমি হইতে উদ্গত প্রতিটি জিনিসে যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবন হইতে ও তাহারা যাহা জানে না–তাহা হইতেও।"[৩]

"এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৪]

আমাদের ধারণা ছিল শুধু মানুষ ও জীব-জন্তুর জোড়া আছে। ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞনিক স্যার জগদীশচন্দ্র বোস প্রমাণ করে দেখালেন যে তরুলতা ও খনিজ পদার্থেরও প্রাণ আছে এবং এদেরও জোড়া আছে। একই গাছে স্ত্রী জাতীয় ও পুরুষ জাতীয় ফুল ফোটে। আবার পুরুষ জাতীয় গাছ ভিন্ন এবং স্ত্রী জাতীয় গাছ ভিন্ন–এরূপও দেখা যায়। পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ জড় পদার্থের মধ্যে জোড়া বের করলেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর থিওরী বিজ্ঞানীদের থিওরীর অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর থিওরী বিশ্বের প্রতিটি পদার্থকেই কেন্দ্র করেছে। জানা অজানা কত সৃষ্টি যে এ বিশ্বে বর্তমান তার হিসাব আমরা জানি না। যেগুলো জানি, যেসব সৃষ্ট জীব নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করে থাকি, তাদের কথাই শুধু বলতে পারি যে এদের জোড়া আছে। কিন্তু মহাসাগরের অভ্যন্তরে, মহাশূন্যের উদ্যানে, ভূতলের বিছানায় কত অগণিত জীবই যে বিচরণ করছে তার হিসাব কে রাখে? অথচ হযরত মুহাম্মদ (দঃ)– বিশ্বের এ মহাবৈজ্ঞানিক, তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতিটি বস্তুর হিসাব নিখুঁতভাবে রেখেছেন।

কোরআনের উপরে উদ্ধৃত বাণী হতে দেখা যাচ্ছে যে আকাশ বা ভুমণ্ডলের অভ্যন্তরে এমন কোন সৃষ্টি নেই যার জোড়া নেই। 'যেন তোমরা অনুধাবন কর'–এ বাণীটি বিজ্ঞানীদের জন্য উপহার স্বরূপ। প্রতিটি বস্তুকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু দু'একটি বস্তুর উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি যাদের জোড়া আছে–একথা শুনলে সবারই হাসি পাবে ও চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

পানি আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এর মূল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। হাইড্রোজেন নেগেটিভ্ আর অক্সিজেন পজিটিভ্। এ দু'টি উপাদান মিলিত হয়েই পানির সৃষ্টি করে। এ উপাদান দু'টির মধ্যে আর্কষণ বিদ্যমান।

এ পানি বাষ্পের আকারে শূন্যমার্গে চলে যায়। অথচ সেখানে গিয়েও এরা বিলীন হয় না বা শক্তিহীন হয় না। সেখানে গিয়ে এক নতুন খেলা দেখায়। এক নতুন জড় বস্তুর সৃষ্টি করে–মেঘ। এই মেঘের কিছুটা Positively কিছুটা Negatively charged হয়। মনে হয় 'বরকনে' নতুন রূপে সাজ্ছে আর একে অপরকে পাবার জন্যে উদগ্রীব হ'য়ে আছে। এর মাঝে ঠিক নারী-পুরুষের মত প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণের ফলে যে

টীকা ঃ ২–কোরান, সূরা জারিয়াত, আয়াত–৪৯

৩ –ঐ ইয়াসিন " –৩৬

৪ – ঐ জোখরোফ " –১২

www.pathagar.com

প্রচণ্ড সংঘাত হয় তার ফলেই হয় বিদ্যুতের সৃষ্টি। অদ্ভুত এ থিওরী, অদ্ভুত এ বৈজ্ঞানিক সূত্র। এ সূত্রকে বিশ্লেষণ করতে কোরআন কি সুন্দরভাবেই না আমাদের দেখিয়েছে। সেখানে জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলা হয়েছে।

"আকাশ হইতে বারি বর্ষণের ন্যায়–যাহাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ আছে।"[১]

"আল্লাহ্ যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন। তৎপর মেঘমালা সমুত্থিত করেন। তৎপর আমি উহাকে মৃত প্রদেশে পরিচালিত করি; অনন্তর আমি উহা দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করি। এই রূপেই পুনরুদ্ভব হইয়া থাকে।"[২]

একটি ব্যাটারীর দু'টি প্লেট থাকে। একটি তামা, অপরটি দস্তা (Copper and Zinc)। ব্যাটারীর মধ্যে Dilute sulphuric acid দিয়ে Electric current pass করলে ব্যাটারীটি charged হয়। এই chraged অবস্থায় দু'টি প্লেটের বহির্ভাগ অন্য কোন তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করলেই বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে থাকে। Negative এবং Positive Plate দু'টি সংযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় এতে sparking হতে থাকে। বিদ্যুৎ সৃষ্টি এর কারণ। এ বিদ্যুৎ বহির্ভাগে Zinc plate হতে Copper এর দিকে প্রবাহিত হয়। আর ব্যাটারীর অভ্যন্তরে Copper হতে Zinc এর দিকে আসে।। ইলেকট্রনের এ প্রবাহকে বিদ্যুৎ বলে।

ঠিক এরূপ পদ্ধতিই যেন সংঘটিত হয় আকাশের মাঝে। Positive ও Negative দু'ভাগ মেঘই যেন এর প্রমাণ। কে বসে বসে এ পদ্ধতি শিক্ষা দেয় এবং বিদ্যুতের খেলা দেখিয়ে আমাদের রহস্য উদ্ঘাটনের পথ নির্দেশ করে তা চিন্তা করলে অবাক লাগে।

আকাশের বিদ্যুৎ স্ফুরণ না হলে কোন বীজ থেকেই অঙ্কুর গজিয়ে উঠত না। কেননা Sparking হবার অর্থ বিপুল পরিমান নাইট্রোজেন নির্গত হওয়া। আর এ নাইট্রোজেন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে ভূমিতে পতিত হয়, ভূমির বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে মিশে তা কার্যকরী সারের সৃষ্টি করে। এ সারই বীজকে সতেজ করে এবং সুপ্ত ও লুপ্ত প্রাণকে সজীব করে।

ধরায় কি শান্ত?

আমি উন্মাদ আমি ভ্রান্ত
আম জানি না ধরায় কি শান্ত।।

আগ্নেয়গিরীর উদ্গীরণ
ভস্ম লাভা করে বরিষণ।
তুষার গলে সূর্যানলে তরুলতা ক্লান্ত।।
জানি না ধরায় কি শান্ত।
অনলশিখা করে ছারখার
ভূমিকম্পে ধরা তোলপাড়।
মানব দানব নাচিয়া তোলে
রাখে নাক জ্যান্ত।।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত।

টীকা ঃ ১ –কোরআন, –সূরা বকর। আয়াত ১৯।

২ –কোরান সূরা ফতের। ৯ আয়াত।

www.pathagar.com

স্নিগ্ধ শশীর টানেতে তাই
জোয়ারভাটা দেখিতে পাই।
সাগর বুক দুলিয়া উঠে
ফুলিয়া হয় বাড়ন্ত।।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত।

প্রেমিক নারীর রোষের ভাষা
চুরমার করে নরের আশা।
জলপ্রপাতের জলস্রোত
হয় না কভু ক্ষান্ত।।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত।

ঘূর্ণীঝড়ের দাপটে তরু
নোয়ায় শির সাগর মরু।
আঁধার রাতে বজ্রপাতে
ভীতির নাই অন্ত।।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত।
বাষ্পাকারে উঠিয়া জল
মেঘের কোলে হয় যে শীতল
ভূমির প্রাণে জোয়ার আনে
লক্ষ জীবের আগন্ত।।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত।

মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ
বিদ্যুত কণা হয় যে ক্ষরণ।
লুপ্ত প্রাণে জীবন দানে
ভ'রে তুলে দিক-দিগন্ত।।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত।

[লেখক]

বজ্রপাত ঃ- বিপরীত ধর্মী দু-টি মেঘের (Positively and Negatively Charged Cloud) সংঘর্ষণেই বজ্রপাতের কারণ। বজ্রপাত যদিও ভীতির সঞ্চার করে তবুও এর গুরুত্ব অপরিসীম। শেষের পংক্তিগুলোতে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিই নি।

কোরআনে সূরা রূমে-বজ্রপাতের সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ-

"এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তিনি তোমাদিগকে ভীতি ও আশ্বাস প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন ও আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; অনন্তর তদ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।"

www.pathagar.com

লুপ্ত প্রাণে কিভাবে বীজকণাতে ও অন্যান্য বস্তুতে জীবন সঞ্চার হয় এ বজ্রপাতের মাধ্যমে তা ব্যক্ত হয়েছে আমার রচিত–'বিজ্ঞান না কুরআন?'–পুস্তকে। আমার কবিতার ছন্দগুলোর সত্যতা বর্তমান বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন এই বলেঃ-

বজ্রপাত সার উৎপাদন করেঃ- এই হেডিং এ দৈনিক আজাদ-২৩শে এপ্রিল ইং ১৯৭৭–লিখেছেন ঃ-

"বিশ্বের যাবতীয় সার কারখানায় যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার উৎপাদন হয় একবার বজ্রপাতে তার চেয়ে ষোল লক্ষগুণ সার বেশি হয়।" আমার 'ঝংকার' কবিতার বইটি পড়ুন। এরূপ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় লিখিত কবিতা সমূহ রয়েছে।

লোহা ও আত্মায় মরিচা ধরে

হযরত বলেছেন, "**লোহা যেমন পানি লাগিলে মরিচা ধরে আত্মাও সেইরূপ মরিচা প্রাপ্ত হয়।**"[১]

উপর্যুক্ত বাণীটি সাধারণ মানুষের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না, কিন্তু জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের কাছে এ বাণীর গুরুত্ব অপরিসীম।

লোহা পানির সংস্পর্শে আসলে কি রূপ ধারণ করে তা আমরা কেমিষ্ট্রিতে দেখেছি। কিছুদিন এটা মাটিতে ফেলে রাখলে তা পানি ও বাতাসের ক্রিয়ায় মরিচাপ্রাপ্ত হয়। এ প্রণালীকে বলা হয় Oxydation i. e. Addition of Oxygen and removal of Hydrogen। বাতাস ও পানির অক্সিজেন লোহার সঙ্গে যোগ হয়ে Iron oxide বা মরিচার সৃষ্টি করে। এ বাণীর অন্তর্নিহিত ভাব আরও জটিল।

লোহাকে কিছুদিন যাবত মাটিতে অকেজোভাবে ফেলে রাখলে যেমন মরিচা ধরে ও নষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ আত্মার বিকাশ সাধন না হলে অর্থাৎ আত্মাকে সঠিকভাবে পরিচালনা না করলে ঠিক লোহার মতই মরিচা প্রাপ্ত হয়ে মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে।

আত্মাবলে যে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আছে এ তত্ত্বও দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। আত্মাকে পদার্থের সঙ্গে তুলনা করে পদার্থের রূপেই রূপায়িত করেছেন। এমন জটিল তত্ত্ব কেউ ইতিপূর্বে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আত্মার অস্তিত্ব যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে পদার্থের মত তার Dimention থাকবারও কথা নয়। তবুও কি এর অস্তিত্ব ও Dimention নেই? হযরত (দঃ) চোদ্দশ বছর পূর্বে এ আত্মার সন্ধান দিয়ে এর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। কোরআনেও আত্মার সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে।[১]

জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যদিও এর অস্তিত্বকে খুঁজে বের করতে পারেন নি, এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তবুও একে অস্বীকার করতে পারেন নি। আত্মা আছে। আত্মা একটা সৃষ্ট বস্তু, এটাকে স্বীকার করতেই হবে। প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে আমার ক্ষুদ্রতম জ্ঞানের পরিসীমায় আমি আত্মাকে পদার্থের রূপেই পেয়েছিলাম। তাই বিজ্ঞান না কোরআন পুস্তকে 'জড়দেহে প্রাণ'–শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলাম,

"আত্মা একটি সৃষ্ট বস্তু প্রাণীর দেহে রয়
তাইতে জড় চেতন হয়ে থাকে বিশ্বময়।"

টীকা ঃ ১ –হাদিস–তিরমিজি ও বয়হাকী (সংগৃহীত হাদিসের আলো, তর্জমা আজহার উদ্দিন এম. এ. এবং কিমিয়ায়ে সা'আদত, তর্জমা নূরুর রহমান)।

১ –কোরআন, সূরা শামছ, সূরা বনি ইসরাইল; প্রভৃতি।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে যদিও কোন রসায়নাগার বা পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষাগার হতে প্রমাণ করতে পারি নি তবু বিশ্লেষণ দিয়ে কিছুটা বুঝাতে চেষ্টা করেছি। দশ বছর পর আমার এ সামান্য চিন্তাধারা বাস্তবে রূপ নিল সুইডিস বৈজ্ঞানিকের এক প্রমাণে। তিনি বলেন, **'আত্মার ওজন একুশ গ্রাম।'**

সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে, 'দৈনিক বাংলা' ঢাকা হতে যা ছিল নিম্নরূপঃ

'ডুসেল ডর্ফ'–১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ সন ইং। এ. এফ. পি.। "মানুষের আত্মার ওজন একুশ গ্রাম। একজন সুইডিস ডাক্তার এ তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন। তাঁর কাছে এটা প্রমাণ করার মত সাক্ষ্য প্রমাণাদি আছে বলেও তিনি দাবী করেছেন। গতকাল এখানে প্রকাশিত একটা বইয়ে সুইডিস ডাক্তার নিল্‌স ওলফে জ্যাকারসন মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–যখন দেহ থেকে প্রাণটা বের হয়ে গেল তখন একটি সূঁচ (স্কেল) একুশ গ্রাম নেমে গেল।"

আত্মা একটি সৃষ্ট পদার্থ। এর অস্তিত্ব আছে। কেননা আত্মাবিহীন দেহ অসার ও অকেজো। জ্ঞান, রুচি, কার্যক্ষমতা, ভালমন্দের বিচার সবই এই আত্মার উপর নির্ভরশীল। ব্যবহারের উপর নির্ভর করে আত্মার স্বচ্ছলতা ও মলিনতা। লোহার সঙ্গে এ আত্মার তুলনা করে একদিকে যেমন আত্মাকে পদার্থের রূপে রূপায়িত করা হয়েছে, অপর দিকে তেমনি লোহার গুণের সঙ্গে তুলনা ক'রে এর গুণাগুণ বুঝান হয়েছে। কাচ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে লোহাকে অত্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ ক'রে আয়নারূপে ব্যবহার করা হতো। ফার্সী ভাষায় এজন্য লোহাকে 'অহিন'–বা আয়না বলা হয়। ব্যবহারের উপর নির্ভর করে লোহাকে যেমন স্বচ্ছ কাচের মত মসৃণ করা যেতে পারে তেমনি ব্যবহারের অভাবেও অযত্নে ফেলে রাখলে মরিচাপ্রাপ্ত হয়ে–এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। আত্মার অবস্থাও ঠিক তাই। আত্মা অযত্নে, অপব্যবহারে ঠিক লোহার মতই মরিচাপ্রাপ্ত হয়। কোরআনও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

"কাল্লা বাল্‌রানা আলা কুলুবিহীম মা কানু ইয়াকছেবুন।"[১]

অর্থাৎ–'কখনও না, বরং তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদের আত্মাসমূহে মরিচা ধরিয়াছে।'

মুসলিম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) আত্মাকে স্বচ্ছ পদার্থ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষের আত্মা স্বচ্ছ আর্শির ন্যায় উজ্জ্বল। আর মন্দ স্বভাব বা পাপকার্যগুলি ধুম্র ও অন্ধকারের ন্যায় মলিন, ইহা ক্রমশঃ আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অতঃপর মানুষের মন্দ স্বভাব ও পাপকার্য স্বচ্ছ আত্মার সম্মুখে একখানি কাল বর্ণের পর্দা ঝুলাইয়া দেয় এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌তালার পরম উন্নত দরবার দর্শন হইতে বঞ্চিত করে। উক্ত পরম উন্নত স্থান তাহার নিকট আচ্ছাদিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে মহৎগুণ ও স্বভাবগুলি উজ্জ্বল আলোকতুল্য। উহা আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক সসস্ত মলিনতা ও পাপ বিদূরিত করিয়া আত্মার সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা বাড়াইয়া দেয়।"[২]

আত্মা একটি পদার্থ। একে এখন কোন লোকই অস্বীকার করতে পারছে না। পদার্থের সংজ্ঞা অনুযায়ী এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ও ওজন থাকা দরকার। বৈজ্ঞানিক প্রমাণে এর ওজনও পাওয়া গেল, তবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজন না থাকলেও একে পদার্থ বলা হয় তেমনি এ আত্মাকেও পদার্থ বলতে হয়। কেননা এ আত্মা আলোক থেকে অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট নূর থেকেই সৃষ্ট।

টীকা ঃ ১ –কোরআন, সূরা তাতফীফ। ৩০ পারা আয়াত–১৪।

টীকা ঃ ২ -কোরআন, সূরা তাতফীফ। ৩০ পারা আয়াত–১৪।

www.pathagar.com

মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনাও আত্মার যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

"সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই সকল জ্ঞানের উৎস। এই জ্ঞান বা আলো হতেই আত্মার সৃষ্টি। আত্মা হতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হতেই সকল বস্তু উদ্ভুত। এক বস্তু হতে যদিও অন্য বস্তুর জন্ম হয় তথাপি আল্লাহই সবকিছুর জন্মদাতা। কারণ তিনই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।"

দার্শনিক ইবনে সিনার মতেও দেখা যায় যে আত্মার সৃষ্টি হয়েছে আলোক থেকে অর্থাৎ নূর থেকে, যার উৎস মহান আল্লাহ্, যিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন।

অন্যান্য মনীষীরাও আত্মার সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়েছেন সেখান থেকেও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে আত্মা একটি সৃষ্ট পদার্থ। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন-

"যেমন আরশিতে ময়লা পড়লে মুখ দেখা যায় না তেমন হৃদয়ে ময়লা পড়লে ঈশ্বরের ছবি পড়ে না। ময়লা মুছে ফেললে যেমন আরশিতে মুখ দেখা যায় তেমনি হৃদয় নির্মল হলে ঈশ্বর প্রকাশ পান।"[১]

মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) সাহেবের মতের সঙ্গে শ্রী শ্রী রামাকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মত যা আত্মা সম্মন্ধে দিয়েছেন তা একইরূপ। সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা যা অর্জন করা যায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার তুলনা আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী লোকদের দ্বারা সম্ভব নয়। জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী, সাধু-সন্ন্যাসী, ওলি গাউস, পীর-পয়গম্বর তাঁরা যে কোন ধর্মেরই হোন না কেন সর্বযুগে সর্বজাতির দ্বারাই সমাদৃত। কি সুন্দর উপমা ও তুলনা দিয়ে দুইটি ধর্মের দুই মহা মনীষী আত্মার রূপ বর্ণনা করেছেন। সব চাইতে আশ্চর্য এইখানেই যে একই আরশিকে উপমা হিসাবে দু-জনই ব্যবহার করেছেন। স্বচ্ছ আয়নার মাধ্যমেই অর্থাৎ পবিত্র আত্মার আলোকেই আল্লাহকে দেখা সম্ভব এ কথাও স্পষ্ট ভাবেই দু-জন বর্ণনা করেছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ছাড়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীও একইরূপ। আত্মা যে একটা সৃষ্ট পদার্থ একথাও ঘোষণা করলেন একটি পদার্থের সঙ্গে তুলনা করে। চলুন, আর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মতামত নিয়ে আমরা আপাততঃ এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

মুসলিম বৈজ্ঞানিক আলকিন্দি বলেছেন,

"পার্থিব আত্মা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও দেহী বিশ্বের মধ্যবর্তী বস্তু। এই পার্থিব আত্মায় স্বর্গমণ্ডল গড়ে উঠেছে। মানবাত্মা উক্ত পার্থিব আত্মা হ'তে নির্গত পদার্থ বিশেষ।"

যদিও আলকিন্দির বর্ণনা হতে আমরা সাধারণ মানুষ এর পরিষ্কার ধারণা পাচ্ছি না তবু বলতে হয় যে আত্মার যে রূপ তিনি দেখতে পেয়েছেন তা সত্য। কেননা আত্মাকে পদার্থের রূপে রূপায়িত করার অর্থই আত্মা একটি সৃষ্ট বস্তু।

ভেবেছিলাম রসুলুল্লাহর (দঃ) যে বাণী একটি উপমা স্বরূপ। কিন্তু বৈজ্ঞানকি চিন্তাধারায় এর বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলাম যে গোটা বিশ্বই এ নিগূঢ় তত্ত্বমূলক মহাবাণীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আক্ড়ে ধ'রে মহাজ্ঞানের অধিকারী হচ্ছে।

লোহার গুনাগুণ ও কার্যকারিতা আমি কিছুই লিখি নি। পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানে লোহার গুরুত্ব যে কত অধিক সে কথা বলাই বাহুল্য। পদার্থ বিজ্ঞানের কৃতিত্ব ও বাহাদুরী শুধু লোহাকে কেন্দ্র করেই। মুক্তা, প্রবাল, হীরা ও সোনা দিয়ে যা সম্ভব নয়–লোহা দিয়ে তা সম্ভব। অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ কাজ হতে আরম্ভ করে বৃহৎ জটিল ও মহামূল্যবান বিষয়গুলোর

টীকা ঃ ১ –শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ–কৃত সুরেশচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা ৭২।

www.pathagar.com

কার্য সাধিত হয় এ লোহা দ্বারাই। তাই হীরা, জহরত ও মণিমুক্তার সঙ্গে আত্মার তুলনা না করে বৈজ্ঞানিক নবী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই এ আত্মাকে লোহার সঙ্গে তুলনা করে তার অপরূপ মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন।

আমাদের কথা রেকর্ড হচ্ছে

হযরত (দঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর অভ্যন্তরে মিষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং চক্ষুতেও সবুজ ও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব নিজের কাজের উপর লক্ষ্য রাখ এবং **পৃথিবী ও রমণীকে ভয় কর,** কারণ বনি ইসরাইলদের মধ্যে প্রথমে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা রমণী ঘটিত।"[১]

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বাণী। এ বাণীর উপর আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার **'বিজ্ঞান না কোরআন'** পুস্তকের বেতার পরিচ্ছেদে। একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তবুও সংক্ষেপে কিছু না বলে পারছি না। কেননা যারা ঐ বইখানি পড়েন নি তাদের অন্ততঃ এতটুকু জানবার আগ্রহ থাকবে, কেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এই পৃথিবী ও রমণীকে ভয় করতে চলেছেন। এর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায়? পদার্থ বিজ্ঞানে এ বাণীর কি প্রয়োজন? পৃথিবীজাত পদার্থের উপরই পদার্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণা। পদার্থকে ভেঙ্গে চুরে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে তাঁরা ইচ্ছামত আমাদের কাজে লাগাচ্ছেন ও আমাদের আনন্দ এবং সুবিধে দান করছেন। গবেষণার শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষাগার আমাদের এই পৃথিবী। এ পৃথিবীজাত সম্পদের মাঝেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত।

বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পৃথিবী ও রমণীকে ভয় করতে বলেছেন। কেননা সর্বপ্রকার অঘটনের মূলেই আছে এ দু'টি এজেন্ট। পৃথিবীকে নির্জীব ও জড় বলেই আমরা জানি। জড় পদার্থের চেতনা নেই, ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই, চলাফেরা করতে অক্ষম, এটাই আমাদের ধারণা। আমি অবশ্য এ ধারণার বশবর্তী নই। এ জন্য আধুনিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সঙ্গে আমার মতের অনেক বিরোধ। আমার মতে জড় বা নির্জীব বলে কোন পদার্থই এ বিশ্বে নেই। যাদের জড় বলি তারা প্রকৃতপক্ষে জড় নয়। আমার মতে **জড় দেহেও প্রাণ আছে।**[১] **তবে কতকগুলো প্রাণ সুপ্ত, কতকগুলো জাগ্রত। যে সব বস্তুর মাঝে জাগ্রত প্রাণ আছে সেগুলোই সজীব আর যেগুলোর প্রাণ সুপ্ত সেগুলোকে নির্জীব বলতে পারি।** এবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর প্রমাণ দিয়ে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর বাণীর বিশ্লেষণ দিচ্ছি।

জড় বলে আখ্যায়িত কতকগুলো পদার্থ, যেমন লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, কোবাল্ট, নিকেল ইত্যাদির সংমিশ্রণে বেতারের আবিষ্কার। এ বেতারের যন্ত্রগুলো মানুষের কথাকে ধরে ফেলতে পারে। কথা একটি অদৃশ্য শক্তি। একে ধরবার কল্পনা বহুদিন থেকে বৈজ্ঞানিকরা ক'রে আসছিলেন কিন্তু পারেন নি। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বৈজ্ঞানিক মার্কনী' বেতার আবিষ্কার করে কথাকে ধরে ফেললেন। এখন আমরা ইচ্ছামত ঘরে বসে পৃথিবীর যে কোন রেডিও স্টেশনের গান শুনতে পাচ্ছি। কথা, বক্তৃতা এমনকি ছায়া ছবি পর্যন্ত রেডিও ও টেলিভিশনে শুনতে পাই এবং দেখতে পাই। যে সব রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে আমরা এ সব অসম্ভবকে সম্ভব করছি তারা তৈরি ঐ সব পৃথিবীজাত

টীকা ঃ ১–হাদিসের মিসকাত (সংগৃহতি হাদিসের আলো–কৃত আজহার উদ্দিন এম.এ. ২য় খণ্ড। হাঃ নং ৭১৮)
'ঝংকার'–পুস্তকে 'জড় দেহে প্রাণ' কবিতা রয়েছে।

www.pathagar.com

খনিজ সম্পদ দিয়েই। এদের বাদ দিয়ে রেডিও বা ট্রান্সমিটার তৈরি করা যায় না। তা'হলে প্রমাণিত হলো যে পৃথিবী রেডিও, টান্সমিটার ও টেলিভিশন প্রভৃতির কাজ করছে অর্থাৎ আমাদের ভাব-ভঙ্গী, কথা-বার্তা, নাচ-গান , এ পৃথিবী তার খনিজ সম্পদের সাহয্যেই সব রেকর্ড করেছে। আর রেকর্ড হলে তা প্রকাশিত হবেই। এতে কোন ভুল কেই। টেপ-রেকর্ড, গ্রামোফোন এ কথার প্রমাণ দেয়।

পৃথিবী ও নারীকে কেন বিশ্বাস করা চলে না, এরা মনের কথা কিভাবে প্রকাশ করে দেয়, তার আলোচনা আমি 'বিজ্ঞান না কোরআন' পুস্তকে বর্ণনা করেছি। তাই এ নিয়ে আর অগ্রসর হচ্ছি না।

বিচারের দিন আমাদের কার্য দেখান হবে

হযরত বলেছেন, "পৃথিবী নশ্বর, সাধু-অসাধু সকলেই উহা হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতেছে। পরলোক সত্য নির্দিষ্ট বস্তু। সেখানে শক্তিশালী প্রভুই একমাত্র বিচারক। জানিও পুণ্যের চতুর্দিকেই বেহেশত এবং পাপের চতুর্দিকেই দোজখ। অতএব সকলেই খোদাকে ভয় করিবে এবং জানিও তোমাদের কার্যাবলী সম্মুখে রাখা হইবে। অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র সৎকার্য করিয়াছে সে তাহা দেখিবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র কুকার্য করিয়াছে সেও তাহা দেখিবে।"[১]

কেমন সুন্দর বেতার থিওরী। এ থিওরীকে কেউ কোনদিন চিন্তা করেনি যে আমাদের কার্যবিধি রেকর্ড হচ্ছে এবং মহাবিচারের দিন তা প্রকাশিত হবে। মহাবিচারক আল্লাহ তার সুক্ষ্মতম দাঁড়িপাল্লায় বিচার করবেন। কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বা মিথ্যা বলে এড়াতে পারবে না। কেননা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই সব কিছু রেকর্ড করা হচ্ছে এবং সময় মত তা সম্মুখে প্রকাশ করা হবে। টেলিভিশনের কোন নায়ক বা গায়ক নাট্যাভিনয় ক'রে বা গান গেয়ে যেমন নিজকে যন্ত্রের মধ্যে ধরা দেয় এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে প্রাকশিত হয়ে পড়ে তেমনি এ পৃথিবীর উপর নাট্যাভিনয় ক'রে জ্যান্ত ছবি ও কথা সহ বিচারক আল্লাহর কাছে ধরা দিতে হবে, এতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা যে সব যন্ত্র দিয়ে আমাদের কথা ও ছবিকে ধরা হয় তা পৃথিবীজাত খনিজ সম্পদ। পৃথিবী তার বক্ষে ধরে রেখেছে অজস্র মূল্যবান ধাতু যার সাহায্য নিয়েই তৈরি আমাদের রেডিও, ট্রান্সমিটার, টেলিভিশন ইত্যাদি। এনিয়ে অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি। এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে আবার কিছু দেখব।

বক্তৃতা মঞ্চে উঠে যদি কোন রাজনীতিবিদ তাঁর বাহাদুরী প্রমাণ করতে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইচ্ছে মত গালাগালি দেয় আর ডি. আই. বি. পুলিশ পাশে থেকে টেপ রেকর্ডার ছেড়ে দেয় তবে কি গালি রেকর্ড হবে না? হাকিমের সম্মুখে যখন বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াবে তখন তার সমর্থক ব্যারিষ্টার তাকে কি গালি দেবার অপরাধ থেকে রক্ষা করতে পারবে? সে নিজেও কি হাকিমকে বুঝাতে পারবে যে সে গালি দেয় নি? আসামী নিজের মুখেই টেপ রেকর্ডে নিজের গালি হাকিমকে শোনাবে। ব্যারিষ্টারের দরকার হবে না, উকিলের দরকার হবে না, কোন মোক্তারের জেরাও সেদিন হাকিম শুনবেন না। হুকুম দিবেন অন্যের ইজ্জত হানির অপরাধে আসামীকে আইনের 'ক' ধারামতে ছয়মাস কারাদণ্ড।

টীকা ঃ ১ –হাদিস মিশকাত (সংগৃহীত হাদিসের আলো) তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। ২য় খণ্ড–পৃষ্ঠা ১২২।

www.pathagar.com

মহাবিচারের দিনকে মানুষ এতদিন কল্পনা বলে উড়িয়ে দিত। কথাকে যন্ত্রের মধ্যে রাখা যায় এ সত্যকে আরব্য উপন্যাসের গল্প বলে মনে করতে। শত শত বছর পরে বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) আমাদের মত বিজ্ঞানীদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দিলেন। আমরা আজ দেরিতে হলেও তাঁর এ বৈজ্ঞানিক সুত্রগুলো প্রমাণ করে বিশ্বকে তাক লাগাতে পারছি।

হযরতের এ বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বিজ্ঞান জগৎ যেমন তার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর মহাগ্রন্থ কোরআনও সে সাক্ষ্যই বহন করে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ- "এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে সৎকার্য পূর্বে প্রেরণ করিয়াছ তাহা আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হইবে। তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহার পরিদর্শক।"[১]

"এই পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে।"[২]

"যেদিন গুপ্ত বিষয় সমূহ প্রকাশিত হইবে। তখন তাহার কোনই শক্তি অথবা সাহায্যকারী থাকিবে না।"[১]

"সেদিন লোকসকল পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যাবর্তন করিবে যেহেতু তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সমূহ প্রদর্শন করা হইবে।"[২]

পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। রসায়ন বিজ্ঞানীরা সারা জীবন গবেষণাগারে কাটিয়েও কথাকে ধরতে পারলেন না। কোন Action অথবা Reaction এর মাধ্যমেও কথার রূপ Test tube এ ধরা পড়ল না। এর উপাদানও খুঁজে বের করতে পারলেন না। অথচ পদার্থ বিজ্ঞানীর Sound এর কেমন গবেষণা করলেন যার ফলে কথার মত অদৃশ্য শক্তিকে তাদের যন্ত্রের মাধ্যমেও আটকিয়ে ফেললেন। আর এমনি ভাবে আটকালেন যে কথার সামান্যতম অংশকেও নিখুঁতভাবে আবার তা মানব সম্মুখে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যবস্থা পদার্থ বিজ্ঞানীরা না করলে নিক্সনের মত বুদ্ধিমান প্রেসিডেন্টকে Watergate কেলেঙ্কারীর জালে ফেলতে পারতেন না। টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন, বেতার, গ্রামোফোন আবিষ্কারের পূর্বে নিক্সনের মত ধুরন্ধর ব্যক্তিরা পার হ'য়ে গেছেন সত্য কথা কিন্তু মহাবিচারের কাঠগড়ায় যখন দাঁড়াবেন তখন কি জবাব তাঁরা পেশ করবেন যখন পৃথিবী স্বয়ং টেপ রেকর্ডার ও টেলিভিশন হ'য়ে তাঁদের কার্যবিধি তুলে ধরবে? কথাটি বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবু বিশ্বাস করতে হয়। কি ক'রে সে কথাই বলছি।

প্রায় প্রতি মাসেই রেডিওতে আমার একটি করে প্রেগাম থাকে। অনেকসময় Directly Speech দিয়ে আসি। অনেক সময় আমার বক্তৃতা টেপ রেকর্ড করা হয়। একদিন কৌতূহল হল আমার বক্তৃতা আমি আজ নিজ কানে শুনব। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের কিছু পূর্বে আমি আমার রেডিওটি খুললাম। আমার বক্তৃতা হবে কথাটি রেডিওতে প্রচার করা হলো। কানখাড়া করে রাখলাম। শুরু হলো আমার বক্তৃতা। কি অদ্ভুত আমার নিজের গলার স্বর, আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না। যা বলেছিলাম নিখুঁতভাবে রেডিও তা বলে যেতে লাগল। দ্বিধা হলো না, সঙ্কোচ হলো না, আমাকে দেখে ভয় করল না। আমার কথার একটি শব্দও বাড়াল না, কমাল না, গোপন করল না। যে ভঙ্গীতে, যে সুরে, যে চিন্তাধারায় আমি কথাগুলো বলেছিলাম তার এতটুকুও ব্যতিক্রম করল না। আমাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত বা সম্মান দেখানোরও কোন প্রয়োজন বোধ করল না। যেখানে থেমেছিলাম,

---

টীকা ঃ ১ ও ২–কোরআন সূরা বকর। আয়াত-১১০ ও সূরা ফতের আয়াত–৫

টীকা ঃ ৩ ও ৪–কোরআন সূরা তারেক, আয়াত-৯ ও ১০ এবং সূরা জেলজাল, আয়াত–৬।

www.pathagar.com

যেখানে সামান্য একটু কাশি দেবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটাও ধরা পড়েছে ঐ রেডিওতে। আমার কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও থেমে গেল। অবাক হয়ে গেলাম। নির্বাক হয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সমগ্র দুনিয়ার চিন্তা যেন এক সঙ্গে আমার মস্তিষ্ক উলট পালট করে দিল। জড় বলে কাদের এতদিন আখ্যায়িত করেছি? নিষ্প্রাণ বলে কাদের এতদিন ঘৃণা করেছি। নির্বাক বলে কাদের উপর এতদিন আঘাত করেছি। এরাইত খাঁটি আল্লাহর প্রেমিক। এরাই প্রকৃত জয়গানকারী। মিথ্যা বলতে এরা জানে না। তোষামোদ করতে শেখে না। অতিরঞ্জনের ধারে কাছে এরা ঘেষে না। নিজ নিজ ধর্ম এরা পরিষ্কার ভাবে পালন করে যাচ্ছে। বাধ্য সৃষ্টি বলে নিজেদেরকে এরা প্রমান করছে। আর আমরা সত্যকে বেমালুম গোপন করছি। মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে বাহবা নিচ্ছি। কর্তব্যকে অবহেলা করে অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করছি। আমরাই নাকি মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব।

এই টেপ-রেকর্ড যতদিন থাকবে ততদিন ঐ একই ভাবে বলবে। কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না। কারো জুলুমের ভয় করবে না। যে বস্তু কোন শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়–যে বস্তু তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ, যে প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে সক্ষম যার ভুল-ত্রুটি নেই, যার কর্তব্য পালনে অবহেলা বা গাফলতি নেই, যারা সৃষ্টিকর্তার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে সর্বদা তৈরি তারা কি নিষ্প্রাণ? না–এরা নিষ্প্রাণ নয়, স্পন্দনহীন নয়। আমরা অজ্ঞ তাই কি এদের চরিত্র ও কার্যবিধি বুঝতে পারি না। দেখুন আল্লাহ স্বয়ং এদের সম্বন্ধে কি বলেন।

জড় দেহে প্রাণ

"আকাশ ও ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর জয়গান করিতেছে।"[১] (৫৭ ঃ ১)

"সপ্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তুই আল্লাহর গুণগান করে। আর এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর গুণগান করে না কিন্তু তোমরা তাদের গুণকীর্তন উপলব্ধি করতে পার না। এবং নিশ্চয় তিনি হলেন ধৈর্যশীল ও করুণাময়।"[২] (১৭ ঃ ৪৪)

"এবং পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে দাউদের আদেশানুগত করিয়াছিলাম যে মহিমা বর্ণনা করে।"[৩] (২১ ঃ ৭৯)

"এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের প্রতিচ্ছায়া ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়া থাকে।"[৪] (১৩ ঃ ১৫)

"তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে এবং সূর্য ও চন্দ্র নক্ষত্ররাজী এবং পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজী ও জীবজন্তু ও মানবমণ্ডলীর অধিকাংশই আল্লাহকে তাঁহারই উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে।"[৫] (২২ ঃ ১৮)

"এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত জীবজন্তু সমূহ এবং ফেরেস্তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে এবং তাঁহারা অহঙ্কার করে না।"[৬]

টীকা ঃ ৪৯ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

টীকা ঃ ১–হতে ৭– কোরআন সূরা হাদিদ, (আঃ)১ সূরা বনি ইসরাইল আঃ ৪৪, সূরা আম্বিয়া–আয়াত ৭৯। সূরা রাদ, আয়াত ১৫, সূরা হজ্জ, আঃ ১৮, সূরা নহল, আয়াত ৪৯ ও ৪৮।

www.pathagar.com

"তবে কি তাঁহারা আল্লাহর সৃষ্ট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না যে উহাদের প্রতিছায়া দক্ষিণ ও বামদিকে পতিত হইয়া বিনীতভাবে আল্লাহকে সেজদা করিতেছে।"[৭] (১৬ ঃ ৪৮ ঃ ৪৯)

এবারে চলুন আমরা জড়বস্তু নিয়ে বিশ্লেষণ করি ও দেখি হযরতের বাণী ও কোরআনের বাণীর গুরুত্ব কেমন।

যে কোন পদার্থ তা পাথর, ধূলি-বালি, লোহা, তামা, সীসা, দস্তা যাই হোক না কেন যখন ঐ পদার্থ ভেঙ্গে শেষ স্তরে পৌঁছায়, সে স্তরকে বলা হয় Atom; অবশ্য এ Atom কেও ভেঙ্গে আবার Electron Proton এ পরিণত করা হয়েছে। পদার্থের এই সর্বশেষ পরিণতি Electron ও Proton নিষ্ক্রীয় নয়। এদের চলার ক্ষমতা আছে, কাজ করার শক্তি আছে, চেতনা শক্তি আছে ও জন্মদানের ক্ষমতাও আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– একটি পাত্রে দস্তা (Zinc) রেখে তার মধ্যে Sulphuric acid মেলালে নতুন এক বস্তুর সৃষ্টি হয়, এ নাম জিঙ্ক সালফেট ($ZnSo_4$) ; Nitric Acid এর সঙ্গে সালফিউরিক এসিড মিশালে জিঙ্ক নাইট্রেট ($ZnSo_4$) তৈরি হয়। Positive ion Negative ion -এর গুণাগুণ মিশে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে যার গুণাগুণ Zinc অথবা Sulphate এর গুণাগুণ হতে পৃথক।

তাহলে দেখা যায় যে জড় পদার্থের অভ্যন্তরে যে Electron ও Proton আছে তাদের sensation আছে। Electron গুলো Proton এর দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে আবার আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান। নতুন বস্তুরও সৃষ্টি করছে। এদের নিয়ম শৃঙ্খলারও কোন ব্যতিক্রম নেই। যে সব বস্তুর প্রাণ আছে তাদের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকতে হয়। যেমন (১) চেতনা শক্তি, (২) চলার ক্ষমতা, (৩) জন্মদানের ক্ষমতা।

জড় বস্তুকে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের চেতনা শক্তি আছে। Electron Proton দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আঘাত করলে এদের নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটায়। কেমিক্যাল Action ও Reaction এ এরা চুপ থাকতে পারে না। চেতনাশক্তির প্রভাবেই যার যতটুকু শক্তি কাজের নেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, Atom -এর নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন সারা বিশ্বকে কেমন তাক লাগিয়ে দিলেন।

চলার ক্ষমতা এদের আছে বলেই Electron Proton এর দিকে দৌড়ায়। এরা দৌড়াদৌড়ি করে সংঘবদ্ধ না হলে Chemimcal Action ও Reaction হতো না। বস্তুকে তখন অকেজো, নিষ্প্রাণ ও জড় আখ্যায়িত করা যেত। চুনের ভিতর পানি দিলে দেখা যায় যে কি অদ্ভুত Reaction চলছে। এদের অণু পরমাণুতে কি দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও ছুটাছুটি হয় যার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি করে ও নতুন বস্তু তৈরি করে। এভাবে প্রতিটি বস্তুকে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের অণু পরমাণু মৃত নয়–জীবন্ত। এজন্যই রেডিও কথা বলে, মাটি জন্মদান করে, বৃক্ষলতা ও তরুরাজী ফলদান করে, পাথর নিহিত শক্তির জন্য অটল থাকে, বায়ু প্রবাহিত হয়, জল বস্তুকে সজীব করে, ধাতব পদার্থ বর্ধিষ্ণু হয়। প্রাণ আছে, তাই এরা কাজ করে। জীবন আছে, তাই চলাফেরা করে। বুঝবার ক্ষমতা আছে তাই সৃষ্টিকর্তাকে সেজদা করে। এদের প্রাণ না থাকলে এ বিশ্ব অচল হয়ে যেত। চাঁদ কিরণ দিত না, সূর্য ঘুরত না, নক্ষত্ররাজী দিক পরিবর্তন করত না, তরুলতা ও বৃক্ষরাজী ফলে-ফুলে সুশোভিত হতো না। আম গাছে আম, জাম গাছে জাম, তেঁতুল গাছে তেঁতুল ধরত না।

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তা যার প্রতি যে আদেশ করেছেন সে আদেশই তারা পালন করে চলছে। কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আবার নতুন আদেশ না পাবে। এদের যদি চেতনা শক্তি না থাকত তা হলে কুল গাছে শশা, বেল গাছে তাল, নারিকেল গাছে সুপারী আর তেঁতুল গাছে মরিচ ফলত। এদের বুঝবার ক্ষমতা আছে, চেতনা আছে, তাই সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হচ্ছে না। তাঁরই আদেশ মেনে চলছে অর্থাৎ কাজ করে ও গুণগান করে ধন্য হচ্ছে। জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কি এর ওপর পড়ছে না? এগুলো দেখে ও বিশ্লেষণ করে আল্লাহর অপরূপ শক্তি মহিমা বিকাশ করতেই কোরআন বলছে–

"তারা কি পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে না? আল্লাহ যে বস্তু পয়দা করেছেন তার উপরও কি তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না?" (সূরা আল্ আরাফ)

সামান্য এক পরমাণু জল নিয়ে যেখানে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়, সে জলের পরমাণুতে জীবন নেই এ কথা বলা কি বোকামী নয়? এটা কি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি? Molecular theory, Atomic theory, Electronic theory কি এই প্রমাণ করে যে পদার্থের Molecule, Atom বা Electronও Proton নির্জীব? বিংশশতাব্দির বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চয়ই না বলবেন। কেননা তারা Electronic movement ছবির মাধ্যমেও দেখাচ্ছেন। Neucleus কে কেন্দ্র করে কি ভাবে Electron গুলো তাদের orbit এর উপর ঘুরছে একথা তারা প্রমাণিত সত্য বলেই মেনে নিচ্ছেন। এজন্যই current এর definition এ বলা হয়ঃ Flow of electrons is called current.

Magnetic theory আলোচনা করলে এ ঘটনা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। চুম্বকের North pole এবং South Pole পাশাপাশি আনলে তারা আকর্ষণ করে, শুধু আকর্ষণই নয়, এমন একটি শক্তির সৃষ্টি হয় যে হাতে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। অবশ্য যদি চুম্বক দুটি বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হয়। এ চুম্বক দিয়ে কি অসাধ্য কাজই না সম্পন্ন হচ্ছে। পৃথিবী তার বিরাট চুম্বক শক্তিবলে সবকিছুকে আটকিয়ে রেখেছে। আর দূরবর্তী বস্তুদের অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, নক্ষত্র, সবাইকে তার পাশে ঘোরাচ্ছে। অনেকেই হয়ত বলবেন যে চৌম্বকত্ব শক্তি বলে নয়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মূলেই যে চুম্বক শক্তি একথা আজ বিজ্ঞানীরা স্বীকার না করলেও দু-দিন পর স্বীকার করবেন। এটা আমি বলে রাখলাম।

অনেকের মনে তবুও কিছুটা খটকা থাকতে পারে যে চৌম্বকত্ব শক্তি বা আকর্ষণী শক্তি সব বস্তুর মাঝে নেই। লোহা, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর মাঝে চুম্বক শক্তি আছে। এদের Positive ও Negative ion গুলো সারিবদ্ধ ভাবে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়, তাই আকর্ষণী শক্তি জন্মে, ফলে একত্রিত হয়। অনান্য বস্তুর মাঝেও কি এ আর্ষণী শক্তি জন্মে? পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকের মাঝেই এ আকর্ষণী ক্ষমতা আছে, আর এ ক্ষমতার অর্থ প্রাণ আছে।

(ক) আবদুল্লাহ-বিন-মসউদ হইতে বর্ণিত আছে, 'তাহাকে বিজ্ঞাসা করা হইল– 'কে খবর দিয়াছে নবীকে (সঃ) জ্বিনদের সম্বন্ধে যে রাত্রি তাহারা কুরআন শুনিয়াছিল? তিনি বলিলেন, একটি গাছ খবর দিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে।"[১]

টীকা ঃ ১ -হাদিস। সহীদ বুখারী [তজরীদ]। তর্জমা-আলহাজ আবদুর রহমান খান। হাঃ নং -৯/৩/৪০২।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত হাদিস হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাছ পালার প্রাণ আছে, কথা বলার ভাষা আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার হতে জান্‌তে পারি তরুলতার প্রাণ আছে। জড় অবস্থায় এদের আমরা দেখতে পেলেও প্রকৃত পক্ষে জড় নয়। প্রাণহীন নয়।

চোদ্দশ বছর পূর্বের রসুলের বাণীতে এ গূঢ় তত্ত্বটি ছিল কিন্তু আমরা চিন্তা করার অবকাশ পাই নি এবং উদ্ঘাটন করে এর মূল্যায়ন করি নি। নিম্নে আর একটি এরূপ বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(খ) রসুলুল্লাহ (দঃ) -বলেছেন,

"তোমরা যুদ্ধ করিবে ইহুদীদের সহিত, আর তাহাদের কেহ লুকাইবে এক পাথরের পিছনে এবং ঐ পাথর বলিবে "হে মুসলিম এই যে এক ইহুদী আমার পিছনে, -মার উহাকে।"[২]

পৃথিবী স্থির

হযরত বলেছেন ঃ "আন্ শাদুকুম বিল্লাহে ল্লাজি বে ইজনিহি তাকুমা সামারো ওয়াল আরদো। হাল তায়ালামুনা জালেকা?"[৩]

অর্থাৎ "আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যার হুকুমে স্থির আছে আকাশ সমূহ ও পৃথিবী। কয়েক শতাব্দীর একটা ভ্রান্ত থিওরীর মাথায় কুঠারাঘাত পড়ল। যারা বলে পৃথিবী স্থির নয় অস্থির তারা দেখুন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কি বলেন। এ মহাবৈজ্ঞানিকের বাণী সমগ্র বিজ্ঞান জগৎকে স্তম্ভিত করেছে কি না, মনীষীদের মস্তিষ্কে আলোড়ন এনেছে কি না, বিজ্ঞান গবেষণার পথ সুগম করেছে কি না–তা দেখাতেই আমি কলম ধরেছি 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ' (দঃ) বইখানি লিখতে। এর পূর্ব পর্যন্ত কি দেখলাম? আধুনিক বিজ্ঞানীরা যা প্রমাণ করেছে–যা আজও প্রমাণ করতে পারে নি, যেসব চিন্তাধারা আজও তাদের মাথায় ঢোকে নি সে সব গুরুত্বপূণ তথ্য হযরত (দঃ) বহু পূর্বেই আমাদের দিয়ে গেছেন। প্রমাণ করে যেটা সত্য বলে দেখেছি সেটাকে বিশ্বাস করছি যেটাকে প্রমাণ করতে পারি নি সেটার প্রতি অনেকেরই বিশ্বাস এখনও আসে নি। আর যেটাকে ভুল প্রমাণ করে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি সেটাকেই সত্য মনে করে আল্লাহর বাণী ও রসুলের বাণীকেও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছি না। আমাদের এই দুর্বলতার জন্যই আমরা নিজেদেরকে চিনি না। প্রমান করতে পারছি না বলেই সেটা সত্য নয় এটা কি কোন যুক্তির কথা? রসুলের (দঃ) বাণী ও কোরআনের প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণ করে যেখানে দেখা যাচ্ছে সত্য, সেখানে পৃথিবী স্থির–একথা অসত্য একথা এক নাস্তিক ও অবিশ্বাসী ছাড়া আর কেউ বলবে না।

এ ছাড়া এমন কতক সত্য বস্তু আছে যার প্রমাণ মেলে না অথবা এদের আমাদের বিশ্বাস করতেই হয়। কোন গবেষণাগারে আত্মা, মন, বিদ্যা বুদ্ধি, প্রেম ভালবাসা পরীক্ষা করা যায় না। অথচ এদের কি অস্তিত্ব নেই? এদের কি ক্রিয়া নেই? বাতাস, উত্তাপ, কারেন্ট,

---

টীকা ঃ ২–এ জিহাদের মাহাত্ম পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ৫৭/৮৬।

৩ –সহীহ বুখারী, তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১১৪ ১ম খণ্ড। জিহাদের মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৪৪।

www.pathagar.com

ভলটেজ, পাওয়ার, বল, শক্তি কোন্‌টি দেখা যায়? ইলেকট্রন, প্রোটন, এটম, মলিকুল, ব্যাকটেরিয়া যাদের নিয়ে বিজ্ঞানজগৎ ব্যস্ত এদের কোন্‌টি পরীক্ষাগার হ'তে প্রমাণ করা যায়? শুধু অনুভূতি ও বিশ্বাসের উপর যেমন এদের আমরা বিশ্বাস করি তেমনি এসব অদৃশ্য শক্তি ও বস্তুদের বিশ্বাস করে এক যুগান্তকারী আলোড়ন আনতে পারি। ইলেকট্রনকে বিশ্বাস করেই ইলেকট্রনিক থিওরী গড়ে উঠেছে। কারেন্ট ভলটেজকে বিশ্বাস করেই আলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবী স্থির না এর ঘূর্ণন আছে একথা বহু শতাব্দী থেকেই চিন্তাশীল মনীষীদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একদল স্থির বলে বিশ্বাস করেছে, একদল পৃথিবীর ঘুর্ণন আছে একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে। সঠিক সিদ্ধান্ত কেউ দিতে পারে নি। কোপারনিকাস, ব্রূণ, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের ধারণা পৃথিবীর দুটো গতি আছে, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। কিন্তু ও ধারনা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) জানতেন যে পরবর্তী যুগে এ নিয়ে বিরাট এক মতভেদের সৃষ্টি হবে, ফলে মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে দূরে থাকবে। তাই তিনি আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্থির আছে। এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শূন্যের মাঝে পৃথিবীর ঝুলে থাকা অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে সবই সহজ, এটা তাঁর শক্তি মহিমারই এক মহানিদর্শন। এমন নিদর্শন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।এমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে একমাত্র সেই মহাশক্তিধর আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহকে বিনা স্তম্ভে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আর পৃথিবীকে শূন্যের মাঝে স্থির করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। এমন অপরূপ কৌশল, এমন অদ্ভুত রহস্য মানুষ জানে না। তারা চিন্তাও করতে পারে না। তাই হযরত **'তাকুমা সামাওয়া ওয়াল আরদা'** বলার পরেই বলেছেন, 'হাল তায়ালামুনা জালেকা?'

অর্থাৎ তোমরা উহা (এমন রহস্য) জান তো?

পৃথিবী ঘুরলে তা স্থির থাকবার কথা কিছুতেই তিনি বলতেন না। হযরতের বাণী যে সত্য তার প্রমাণ দেয় কোরআন। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে–

"ওয়া মেন আইয়া তিহি আন তামুকা সামায়োওয়াল আরদো বে আমরিহি।"[১]

অর্থাৎ ইহাও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী স্থির হইয়া আছে। (৩০ ঃ ২৫)

"এবং তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন যেন তোমাদের সহিত উহা আলোড়িত না নয়।"[২] (১৬ ঃ ২৫)

"তিনি স্তম্ভবিহীন আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তোমরা অবলোকন করিতেছ এবং তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন যেন তোমাদের সহিত উহা আলোড়িত না হয়।"[১] (৩১ ঃ ১০)

কোরআনের এমন সুস্পষ্ট বাণী পাবার পরে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আর হয়ত সন্দেহ

টীকা ঃ ১ –কোরআন, সূরা রুম, ও আয়াত ২৫
২ –ঐ সূরা নহল ঐ–১৫
টীকা ঃ ১ –ঐ সূরা লোকমান ঐ–১০

www.pathagar.com

থাকবে না। যদি কারো তবুও সন্দেহ থাকে তবে আমার ক্ষুদ্রতম চিন্তাধারায় রচিত পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে–বইখানি একবার পড়ুন। এতে বিজ্ঞান, কোরআন, বাইবেল ও ভৌগোলিক প্রমাণে প্রমাণ করেছি যে পৃথিবী স্থির। এর কোন গতি নেই। বইটির বিষয়বস্তু শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর ৭০টা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন মনীষী ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা এর উপর আলোচনাও করেছেন। এমন দিন বেশি দূরে নয় যেদিন হযরতের বাণী ও কোরআনের বাণী বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে বলতে বাধ্য হবেন–'পৃথিবী স্থির'। আল্লাহ সত্য, তাঁর সৃষ্ট বস্তুও সত্য। রসুল সত্য, তাঁর বাণীও সত্য।[৩]

সৃষ্টি তত্ত্ব

বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা কিরূপ ছিল এ নিয়ে যুগে যুগে অনেক গবেষণা চলেছে এবং চলবেও। কারো চিন্তাধারার সঙ্গে কারো মিল নেই। থাকবার কথাও না। কেননা মানবীয় সীমিত চিন্তাধারা অসীমের সন্ধান দেয় কি করে? নিজ ইন্দ্রিয়ের সন্ধান নিতে যেখানে মানুষ ব্যর্থ, নিজ আত্মা, মন ও অন্তরের স্বরূপ নির্ধারণে যেখানে অপারগ সেখানে এ মহাবিশ্বের মহাসৃষ্টির তত্ত্ব তারা কি করে বুঝবে? এ অগণিত সৃষ্টির কি তারা হিসাব দেবে? কেন সৃষ্টি হয়েছে, কি এর উদ্দেশ্য, কোন মহাশক্তি এর পশ্চাতে–এসব তত্ত্ব তুলে ধরে কার সাধ্য। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান বা জীব বিজ্ঞানের লাবরেটরীতে এ সব পরীক্ষা অচল। অবশ্য অচল কথাটা বলা ঠিক হয় না। কেননা বৈজ্ঞানিকরা যুগে যুগেই চেষ্টা করছে অজানাকে জানবার ও অচেনাকে চিনবার, কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণা মিটছে না। কেননা সঠিক সিদ্ধান্ত তারা দিতে পারে না। আজ যেটাকে ঠিক বলে মেনে নেয় দুদিন পরই সেটাকে বেঠিক বলে উড়িয়ে দেয়। এক মিথ্যা আর এক মিথ্যার উপর চেপে বসে। এক কল্পনা আর এক কল্পনার উপর চড়াও হয়। এভাবে সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব, যুগে যুগে চক্রাকারে উলট-পালট খেয়ে আসল সত্য হতে বহু দূ র থাকে। এটা শুধু আমার কথাই নয়। বৈজ্ঞানিকদের ও মতবাদ। একজন বৈজ্ঞানিক এজন্যই বলেছেন।

"We have seen that the new self consciousness of science has resulted in the recognition that its clains were greatly exaggerated,"[১]

অর্থাৎ "বিজ্ঞান এতদিন ধরে যে দাবী করে আসছে তার অধিকাংশই যে অতিরঞ্জিত, বিজ্ঞানে নব জাগ্রত আত্মচেতনা এ সত্য এখন পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে।"

আসল সত্যকে জানতে হলে আসল সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত সন্ধানী বৈজ্ঞানিকই মানতে হয়-যিনি প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে আমাদের মত বৈজ্ঞানিকদের এলোপাথাড়ী চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে কি ছিল, কেমন ছিল, কে এ সৃষ্টিতে হাত দিয়েছিল–এসব তত্ত্ব সেই বৈজ্ঞানিক হযরতই (দঃ) আমাদের দিয়েছেন। দেখুন কেমন সুন্দর তত্ত্ব।

---

৩ –ইতিমধ্যে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস আমেরিকায় বইটি স্থান লাভ করেছে। বিবিসি হতে লেখকের নাম-অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে (যারা পৃথিবী স্থির বলে ঘোষণা দিয়েছেন) প্রচারিত হয়েছে।

টীকা ঃ-১ -Limitations of Science, Page 194.

www.pathagar.com

"আল্লাহ ছিলেন এবং অন্যকিছু ছিল না তিনি ভিন্ন। তাঁহার আরশ ছিল পানির উপরে এবং তিনি লিখিলেন সব জিনিস সুরক্ষিত গ্রন্থে এবং সৃষ্টি করিলেন আসমান ও জমিন।"[২]

এখান থেকে বুঝা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপরে। এ সৃষ্টি অত্যন্ত সুপরিকল্পনার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। যে গ্রন্থে এ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করা হয় তা ছিল পবিত্র কোরআন–যা সংকলিত করা হয় আসমান ও জমিন সৃষ্টির বহু পূর্বে। এ কথারও সাক্ষ্য মেলে হযরতের বাণী হতে। তিনি বলেছেন–

"আসমান ও জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগে আল্লাহ একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি দুইটি আয়াত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহা দ্বারা তিনি সূরা বাকারা শেষ করিয়াছিলেন। যে গৃহে এই দুইটি আয়াত উপর্যুপরি তিন রাত্রি পাঠ করা হয় তথায় শয়তান পৌঁছিতে পারে না।"[১]

আকাশ ও পৃথিবী ছিল মিলিত। এদেরকে দু-ভাগ করেই প্রারম্ভ প্রকল্প শুরু হয়। কোরআন থেকে এ তত্ত্ব জানা যায়। রসায়নবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। তাই এ নিয়ে আর অগ্রসর হচ্ছি না। সৃষ্টির সূচনাতে আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল সেটা দেখে নিয়েই আমরা আপততঃ এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি। আকশের রূপ ও অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা দেখতে পাই কোরআনে। সেখানে বলা হয়েছে–

"তোমরা কি এমন শক্তিশালী আল্লাহকে অবিশ্বাস কর যিনি দুইদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন আর অংশীদার দাবী কর এমন মহান প্রভুর সাথে যিনি চারদিনে পৃথিবীর উপর পর্বতসমূহ স্থাপন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে আশীর্বাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন প্রত্যেক যাচনাকারী প্রার্থনায় অনুপাতে, অতঃপর তিনি আকাশ সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেন। **আর তখন তা ধূম্র সদৃশ্য ছিল।**' (৪১ ঃ ৯-১১) (সূরা হামিম)

ওপরে উদ্ধৃত বাণী হতে বেশ কিছু তথ্য আমরা পেলাম। সৃষ্টির পদ্ধতি, পৃথিবী সৃষ্টির মোট সময়, আকাশের অবস্থা অনেকটা জানলাম।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল এ তথ্য মেলে হযরতের বাণী হতে। তিনি বলেছেন–

"আল্লাহ্ পৃথিবীকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করিলে উহা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। **এরপর আল্লাহ পর্বতকে সৃষ্টি করিয়া শলাকা স্বরূপ উহার উপর স্থাপন করিয়া দিলেন, উহাতে পৃথিবী শান্ত হইয়া স্থির হইয়া গেল।**"[২]

উপরে বর্ণিত বাণী হতে আমরা আর একটি নিশ্চিত সমাধান পেলাম। পৃথিবীর ঘূর্ণন নেই। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে বিভিন্ন গতি নিয়ে ঘুরে না। এটা স্থির–চিরকালের জন্য স্থির। আল্লাহর অন্যরূপ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত তা স্বস্থানেই স্থির থাকবে। পূর্বেও রসুলের এরূপ বাণী আমরা পেয়েছিলাম। পৃথিবী স্থির, পরিচ্ছেদে কিছুটা আলোচনা করেছি। বিস্তৃত আলোচনা আছে আমার **'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে'** পুস্তকে। সেখানে মহাকর্ষণ আইন, চুম্বক থিওরী, উড়োজাহাজ, ধ্রুব নক্ষত্র, বায়ুমণ্ডলীর গতিও বিভিন্ন প্রমাণে প্রমাণ করেছি। এ ছাড়া কোরআন হাদিস, বেদ-বাইবেল, জেন্দাবেস্তা ও ভৌগোলিক প্রমাণেও দেখিয়েছি যে পৃথিবীর গতি নেই।

---

২ –সহীহ বুখারী, তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৭৪। হাঃ নং ২/১৭৩।

১ –তিরমিজি, কোরআনর ফজিলত পরিচ্ছেদ।

টীকা ঃ ২–মিশকাত শরীফ, তর্জমা মওলানা নূর মুহাম্মদ ৪র্থ খণ্ড, দানের মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ২৪২, হাঃ নং ১৮২৮।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও রসুলের (দঃ) ওপর যাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস আছে তারা কিছুতেই গ্যালিলিও এর এ ভ্রমাত্বক থিওরীকে বিশ্বাস করতে পারে না। সৃষ্টি তত্ত্বের ওপর আল্লাহ্ রসুলের বাণীকে বক্তিভরে মানতে বাধ্য। যে মতবাদের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, অসার ও কাল্পনিক যুক্তিতে যে থিওরী প্রতিষ্ঠিত সে থিওরীকে সমর্থন দিতে যারা কোরআন ও রসুলের (দঃ) বাণীকে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল পথে চালিত করেন তারা অন্যায়ের সমর্থক, বিশ্বাসী ও প্রকৃত বিজ্ঞানী নন। প্রকৃত বিশ্বাসী আল্লাহর বাণীর উপর রিসার্চ করে, সত্য বলে প্রমাণ করে আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রে তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। আর হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আসনে বসিয়ে দিয়ে ভক্তি ভরে তাঁর নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করি, কোরআন ও হাদিসকে রিসার্চের বিষয়বস্তুরূপে সম্বল করি।

বায়ু প্রবাহ

যে সমুজ্জ্বল জ্যোতি হাতে নিয়ে হযরত আমাদের মত মূঢ় মানবকে শিক্ষা দান করতে এলেন সেই সমুজ্জ্বল জ্যোতি, কোরআন থেকে দেখি পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য এরূপ মূল্যবান তত্ত্ব আরও মেলে কি না। এখানে অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে কোরআন তো আল্লাহর বাণী, এতো হযরতের (দঃ) বাণী নয়– তাই এবাণীর বিশ্লেষণ ক'রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করলে তার কৃতিত্ব হযরতকে কি ভাবে দেওয়া যায়। তদুত্তরে এ কথা কি বলা চলে না যে এ মহামূল্যবান কোরআন তাঁরই উপর নাজেল হয়েছিল, অন্য কারো উপর নয়। তাঁর মুখ থেকে শিক্ষা দিতে, তাঁর মাধ্যমে জগৎকে উদ্ভাসিত করতে এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বাণী, তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল এ কথা বলেই–

(১) "তিনিই কল্যাণময়–যিনি স্বীয় সেবকের প্রতি ফোরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন–যেন সে বিশ্বজগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হয়।"[১] (২২ ঃ ১)

(২) "এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তিনি তোমাকে তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা।"[২] (৪ ঃ ৪৩)

আল্লাহ্ পাক স্বয়ং যেখানে হযরতকে কৃতিত্ব দিয়েছেন সেখানে আমাদের না দিয়ে কি উপায় আছে? তাঁর মুখের বাণী দিয়েই হোক–আল্লাহ্র বাণী তাঁর মাধ্যমেই হোক, কৃতিত্বের অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞানী যিনি অজানা ও অচেনা বস্তুসমূহের সন্ধান দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। এ ছাড়া এ কথাও বলা চলে যে আমাদের বিজ্ঞানীরা যে সব বস্তু আবিষ্কার ক'রে জগতের কাছে কৃতিত্ব নিচ্ছেন তাঁরাও আল্লাহর সৃষ্ট পদার্থ নিয়েই গবেষণা করেছেন। এ সব বস্তু ছাড়া নতুন কোন বস্তুর মাধ্যমে, যা আল্লাহর সৃষ্ট নয় তার সাহায্যে তাঁদের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তোলার কি কোন পন্থা আছে? আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে যদি মহা বৈজ্ঞানিক উপাধি নেওয়া চলে তবে আল্লাহর চিরন্তন সত্য বাণী প্রাপ্ত হ'য়ে মানব সমাজকে উপহার দিয়ে কেন মহাপণ্ডিত ও মহা বৈজ্ঞানিক উপাধি নেওয়া চলবে না? আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁর সৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই কৃতিত্ব। এখানেই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিমাণ। এখানেই বৈজ্ঞানিক কৌশল। এখানেই বিজ্ঞানীদের সাফল্য। হযরতের (দঃ) কৃতিত্ব আমাদের মত বিজ্ঞানীদের চাইতে অনেক -অনেক বেশি। কেননা

টীকা ঃ ১ -সূরা হজ্ব, ১ম আয়াত।

২ –সূরা নেসা, ৪৩ আয়াত।

www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্বজগতের রূপ কেউ তুলে ধরতে পারেন নি। মহাসাগরের মত অতল ও মহাজ্ঞানের অধিকারী হয়ে কেউ আজ পর্যন্ত এ মহাবিশ্বের দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। এজন্যই তিনি বলেছেন–'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার প্রবেশ দ্বার।'

যে বাণীর উপর বিশ্বাস রেখে তিনি শক্তিশালী হলেন, যে বাণীর গুণে তাঁর হৃদয়ে আলোকিত হলো, যে বাণী তাঁর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করল, যে বাণী পেয়ে জগতের জ্ঞাণী-বিজ্ঞানীরা ধন্য হলেন, চলুন সেই বাণীগুলো দেখি ও বিশ্লেষণ করি।

"আল্লাহ্ যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন। তৎপর মেঘমালা সমুত্থিত করেন। তৎপর আমি উহাকে মৃত প্রদেশে পরিচালিত করি। অনন্তর আমি উহা দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই পুনরুদ্ভব হইয়া থাকে।"[১] (৩৫ ঃ ৯)

প্রখর সূর্যকিরণে নদী-নালা খাল-বিল , সাগর-মহাসাগরের উপরিভাগ হতে জল বাষ্পাকারে মহাশূন্যে চলে যায় এবং সেখানে বায়ুমণ্ডলের স্তরে অবস্থান করে। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই জলীয় বাষ্পকণা ঘণীভূত ও শীতল হয় এবং শিশির, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি ও বরফে রূপান্তরিত হয়। (The condensation of this water vapour gives rise to dew, frost, fog, clouds, rain, snow and hail.)

অত্যধিক তাপের আধিক্য হেতু দিনের বেলায় বাতাসের এই জলীয় বাষ্প অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। জলীয় বাষ্প বায়ুর চেয়ে হালকা তাই উপরের দিকে ধাবিত হয়। রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ ও এর উপরে অবস্থিত তরুলতা ও বৃক্ষরাজি তাপ বিকিরণ করে (Radiate their heat) ফলে শীতল হয় এবং বায়ুমণ্ডলের যে উত্তাপ তার চেয়ে নেমে আসে। বাতাস এদের সংস্পর্শে এসে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় (Becomes saturated)। এই জলীয় বাষ্প আরও ঠাণ্ডা হলে জলকণায় পরিণত হয়। বাতাস এ ভারি জলকণাকে ধরে রাখতে পারে না। তাই শিশির আকারে এখানে সেখানে ঠাণ্ডা বস্তুর দেহে দেখা যায়।

ঠিক এ ভাবেই মেঘের সৃষ্টি হয়। তবে পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটে নয়, বহু ঊর্ধ্বে। এক হাজার হ'তে ২৫ হাজার ফিট ঊর্ধ্বে।

জলীয় বাষ্প ঊর্ধ্ব আকাশে বায়ুর সঙ্গে মিশে উঠা-নামা করে এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্নস্তরে এসে পৌছে। যেহেতু বায়ুমণ্ডলের চাপ সেখানে কম সেহেতু এ জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। যখন উত্তাপ Saturation point-এর নিচে এসে যায় তখন এ জলীয় বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ জলকণায় পরিণত হয় এবং টুকরো টুকরো মেঘের আকারে বাতাসের সঙ্গে ভাসতে থাকে। বাতাসের বেগের সঙ্গে এরা চলতে থাকে অথবা স্থিতিশীল থাকে। কোন কোন সময় উত্তপ্ত বায়ুস্তরে নামলে আবার জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয় এবং ঊর্ধ্ব দিকে চলে যায়। সেখানে গিয়ে আবার পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাসমান মেঘ বিভিন্ন আকার ধারণ করে সম্প্রসারিত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। কোরান বলেছে–

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, যেন উহা মেঘ উত্তোলিত করে; তৎপর তিনি ইচ্ছানুযায়ী উহা আকাশে সম্প্রসারিত করেন এবং উহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেন। তৎপর তোমরা উহার অভ্যন্তর হইতে বারিরাশি নির্গত হইতে দেখ।"[১] (৩০ ঃ ৪৮)

উপরে উদ্ধৃত বাণী হতে দেখা যায় যে শূন্যের মাঝে মেঘ সৃষ্টি হবার পর আবার তা

টীকা ঃ ১ –সূরা ফতের। আয়াত–৯

টীকা ঃ১ –কোরআন–সূরা রুম। আয়াত–৪৮।

www.pathagar.com

ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও দেখা যায় যে এ মেঘ সত্যি বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি নিয়েই শূন্যের মাঝে খেলতে থাকে। যেমন–

(১) Cirus ঃ- এগুলো দেখতে সাদা। সূতাকৃতি অথবা পালক আকৃতিতে ভূমিপৃষ্ঠের ২৫০০০ ফিট উর্ধ্বে ভাসমান থাকে।

(২) Cumulus ঃ- এগুলোর আকৃতি স্তূপীকৃত তুলারাশির ন্যায়। ৫০০০ হতে ১০.০০০ ফিট উর্ধ্বে দেখা দেয়।

(৩) Stratus ঃ- এগুলো ধূসর বর্ণের মেঘ, বায়ুমণ্ডলে ২০০০ ফিট উর্ধ্বে Horizontally ঝুলতে থাকে। এরা সুন্দর আবহাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে।

(৪) Nimbus ঃ- এগুলোই কাল বৃষ্টির মেঘ। ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১০০০ ফিট উর্ধ্বে এদের অবস্থান।

মেঘের বিভিন্ন রূপ আমরা কিছুটা দেখলাম। এবার কোরআনের অনুরূপ আরও একটি বাণী উদ্ধৃত করে আবার কিছু আলোচনা করছি। কোরআন বলে–

"এবং ইহাও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন যে–তিনি সুসংবাদবাহী সমীরণ প্রেরণ করেন এবং যেন তিনি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের কিয়দংশ আস্বাদন করান এবং যেন তাঁহার আদেশে নৌকাসমূহ পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"[১] [৩০ ঃ ৪৬]

বৃষ্টিপাতের পূর্বে সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হয় এটা প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন এবং করবেন। এ বাতাসকে লক্ষ্য করে সবারই এ ধারণা জন্মে যে বৃষ্টিপাত আসন্ন। প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটে। সুশীতল বাতাস বৃষ্টির পূর্বাভাস। আল্লাহর ভাষায় এটাকে সুসংবাদ বলা হচ্ছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য যে সংবাদ আসে সেটা নিঃসন্দেহেই সুসংবাদ। পৃথিবীর বুক যখন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, জীবজন্তু তরুলতা যখন অধীর আগ্রহে আকাশের এ বারিপাতের প্রতি অপেক্ষা করে, চাতক যখন এক ফোটা বৃষ্টির পানির জন্য উন্মাদ হ'য়ে রাতদিন কাঁদে, সুপ্ত লুপ্ত অঙ্কুর বীজ মাথা গুঁজে তোলার জন্য যখন সেই করুণাধারারই কামনা করে, সমুদ্রে শম্বুক সেই এক ফোটা পানি পিয়ে তার গর্ভে মুক্তো তৈরির আশায় দিন গুণতে তাকে তখন সে সুশীতল সমীরণ যা কল্যাণকর বৃষ্টির সংবাদ সবার কানে কানে বইয়ে দেয় তখন সুসংবাদ ছাড়া দুঃসংবাদ তাকে কে বলবে?

কেন এ বাতাস শীতল হয়, কেনই বা মহাশূন্য থেকে সুসংবাদ বয়ে নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আসুন তা একটু আলোচনা করি।

জলীয় কণায় পূর্ণ ঘণীভূত এ মেঘ যখন বায়ুস্তরে ভাসতে থাকে তখন পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ বায়ু জলীয় কণার সংস্পর্শে এসে উত্তাপ হারিয়ে ফেলে, এ সময় বায়ুমণ্ডলের চাপ ও তাপ অত্যন্ত কমে আসে, ফলে শীতল হয়। এই শীতল বায়ু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও উষ্ণ বায়ুমণ্ডলের স্থান দখল করতে প্রবাহিত হয়। তাই আমরা শীতল বায়ু বৃষ্টির পূর্বে অনুভব করি। আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে কোরআন তাই কি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছে ঃ-

"তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে আল্লাহ মেঘমালা পরিচালিত করেন, পরে উহাদিগকে একত্রিত করেন; তৎপর উহাদিগকে স্তূপীকৃত করেন; অতঃপর তুমি অবলোকন করিতেছ যে উহাদের অভ্যন্তর হইতে বৃষ্টি ধারা বহির্গত হইতেছে। এবং তিনিই আকাশ হইতে, পর্বতসমূহ হইতে বৃষ্টিধারা অবতারণ করেন। তন্মধ্যে শিলারাশি রহিয়াছে।"[২]

---

১ –কোরআন –সূরা রুম। আয়াত–৪৬।

টীকা ঃ ২–কোরআন–সূরা নূর। আয়াত ৪৩।

www.pathagar.com

ব্যারোমিটারের সাহায্যে আমরা বায়ুর চাপ বুঝতে পারি। এ বায়ুর চাপ নির্ণয় করেই Weather Forecast করা হয়। ঝড়, বৃষ্টি কোন্ সময় কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে হতে পারে আবহাওয়া অফিস তা কয়েকঘণ্টা পূর্বে জানিয়ে দিয়ে লোকজনকে সতর্ক করে দেয়। আমরা -বিজ্ঞনীরা দেরিতে হলেও কোরআনের অমোঘ বাণী যথার্থ বলে আজ প্রমাণ করছি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুর স্বরূপ ও খেলা কেমন হতে পারে ব্যারোমিটার হতে আমরা তার কিছুটা দেখে নিই।

ব্যারোমিটার যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে যখন বায়ু জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হয় তখন Barometric pressure অনেক নিম্নগামী হয় যা বৃষ্টিপাত আসন্ন বলে ঘোষণা করে।

হঠাৎ করে যদি চাপ কমে যায় অর্থাৎ ব্যারোমিটারের Mercury Column পড়ে যায় তা হলে বুঝতে হবে যে ঐ স্থানে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কমে গেছে। এ চাপের সমতা রক্ষার্থে পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে ঐ শূন্যস্থান দখল করবে এটা নিশ্চিত। তাই প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা বিদ্যমান এটাই বুঝতে হবে।

আর যদি পারদ লেভেল (Mercury column) খুব ধীরে ধীরে নামতে থাকে তাহলে বুঝা যাবে যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্যও অতি ধীরে ধীরে হচ্ছে, এটা অবিরাম খারাপ আবহাওয়ারই সংকেত।

আর যদি ব্যারোমিটারের পারদ লেভেল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তা হলে বুঝা যাবে যে বায়ু হতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অন্তর্হিত হচ্ছে। এ অবস্থা সুন্দর আবহাওয়ারই পূর্বলক্ষণ।

ব্যারোমিটার থেকে তা হলে আমরা দেখলাম বায়ুর মৃদুগতি, প্রবলগতি অবিরাম খারাপ আবহাওয়ার গতি মেঘের সঙ্গেই সম্পর্কশীল। আর বায়ুর এ গতিকেই মৃদু প্রবাহপুঞ্জ ও বণ্টনকারী অর্থাৎ বিভিন্নগতি বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা আপাততঃ এটাই দেখতে পাই। এ ছাড়া আর কি তাৎপর্য আছে তা এখনও বুঝতে পারি নি। তবে পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী যে বায়ুমণ্ডলী বিদ্যমান তাকে বণ্টন করলে কয়েকটি স্তর দেখতে পাই যাদের তাপ ও চাপ সর্বত্র এক নয়– বিভিন্ন। এ বিভিন্ন বায়ুস্তরের যে প্রয়োজন আছে সেটাও অনস্বীকার্য। যে বায়ুস্তরে আমরা আছি সে বায়ুস্তরের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪.৭ পাউন্ড। আমাদের সাধারণ দেহের বাহ্যিক ক্ষেত্রফল (Surface Area) প্রায়–১৬ বর্গ ফুট। তা হলে হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে আমাদের দেহের উপর প্রতিনিয়ত বায়ুর যে চাপ পড়ছে তার প্রায় ৪১৩ মণ (১৪.৭ × ১৬ × ১২ × ১২ = ৩৩,৮৬৮.৪ পাউন্ড = ৪১৩ মণ)

আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ চাপ বাহ্যিক বায়ুচাপের সঙ্গে সমতা বজায় রাখে, তাই আমরা এমন গুরুচাপ বুঝতে পারি না। যতই উপরে যায় ততই এর চাপ কম। তাই দেহ হালকা বলে মনে হয়।

আল্লাহ্ এ বায়ুমণ্ডলীকে কি ভাবে বণ্টন করে রেখেছেন তার কিছুটা ধারণা আমরা বায়ুস্তরে বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠ উপরি কয়েকশত মাইলব্যাপী এ বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান। অবশ্য এর সঠিক পরিমাপ কেউ আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি। তবে ধারণা করা হয় যে দু-শত মাইল পর্যন্ত এ বায়ুমণ্ডল আছে। এ স্তরগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ (১) Troposphere (২) Stratosphere (৩) Oxonsphere (৪) Icnosphere,

বায়ুমণ্ডলের এ বণ্টন পদ্ধতি মানুষের দ্বারা সম্ভব হয় নি। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন, হিলিয়াম কার্বণ-ডাই অক্সাইড যার মিশ্রণে এ বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কত সূক্ষ্মভাবেই না নির্ধারিত হয়েছে। এ বণ্টন আল্লাহ্ পাক নিজ হাতেই করেছেন এবং

www.pathagar.com

তরুলতা, বৃক্ষরাজী ও জীবজন্তুসমূহের বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। নিম্নে উদ্ধৃতি কোরআনের বাণী এর প্রমাণ দিচ্ছেঃ-

"সাক্ষী ঐ বিকিরণকারী বায়ুরাশি; তৎপর ঐ ভারবহনকারীবৃন্দ। তৎপর এ মৃদু প্রবহমান পুঞ্জ। তৎপর ঐ বিষয় বণ্টনকারী সমূহ।"

(সূরা জারিয়াত। ১ হতে ৪ আয়াত)

"এবং আমি পরিপূর্ণকারী বায়ু প্রেরণ করি। তৎপরে আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি। অনন্তর উহা তোমাদিগকে পান করাই এবং তোমরা উহার জন্য সঞ্চয়কারী নও।" (সূরা হেজর-আয়াত-২২)

সূরা জারিয়াতে উল্লিখিত আয়াতসমূহ বায়ুর গতিবেগ, বৃষ্টির পূর্বে এর প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শেষের দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তৎপর ঐ মৃদু প্রবাহপুঞ্জ। তৎপর ঐ বিষয় বণ্টনকারী সমূহ।"....

বায়ুকে বিকিরণকারী বলা হয়েছে। যে পদার্থের তাপ বিকিরণ করার ক্ষমতা আছে তাকেই পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় বিকিরণকারী বলা হয়। উত্তপ্ত পদার্থের উপর দিয়ে যখন প্রবাহিত হয় তখন বায়ু তাপ সঞ্চয় করে। আবার ঠাণ্ডা বস্তুর সংস্পর্শে এসে তাপ বিকিরণ করে এবং ঠাণ্ডা হয়। এর শক্তি প্রবল তাই ভারি বস্তুসমূহ নিয়ে চলার ক্ষমতা আছে। আকাশে যে মেঘের সৃষ্টি হয় যার অভ্যন্তরে কোটি কোটি টন জল সঞ্চিত হয় তা যে কত ভারি, বৃষ্টিপাতের সময় একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। শূন্যের মাঝে যেন মহাসমূদ্রের সৃষ্টি হয় আর সেখান থেকে অবিরাম বর্ষণে স্থলভাগ প্লাবিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বৃধ্যাঙ্গুলী দেখিয়ে এ বায়ু এমন ভারি মেঘসমূহ নিয়ে শূন্যের মাঝে কেমন খেলা খেলে! কার শক্তি মহিমার বিকাশ করে, কার আজ্ঞা পালন করে ধন্য হয় আমরা মূঢ় মানব তা বুঝতে পারি না।

"আল্লাহুল্লাজি খালাকা সারয়া সামাওয়াতেও ওয়া মিনাল আরদ্বে মিছলাহুন্না।"

অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুরূপ পৃথিবীকেও।"

(সুরা তালাক। ২৮ পারা, আয়াত-১২ এর অংশ)

বিজ্ঞান না কোরআন'-পুস্তকে আমি আকাশ সম্বন্ধে সামান্য কিছু ধারনা দিয়েছি। আকাশ তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এ ব্যাপক। এর উপর আলোচনা করা সহজসাধ্য নয়। চোখের সম্মুখে যা কিছু আমরা দেখি তার রহস্য উদ্ঘাটন করতেই যেখানে জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা হিমসিম খেয়ে যান-সেখানে অদৃশ্য এ আকাশ জগতের সন্ধান কে কি দেবে? আর সত্যাসত্যই বা কিরূপে নিরূপণ করবে? তাই যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা যা কিছু বলে যাচ্ছেন সবই যেন ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। চাঁদের সৃষ্টি তত্ত্বই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিছুদিন পূর্বে যে চাঁদকে আমরা পৃথিবীর কন্যা বলে জানতাম, সে চাঁদ বিংশ শতাব্দীর নভোচারীদের হাতে পড়ে কন্যা না হয়ে 'মাতা' হয়ে দাঁড়াল। ডক্টর পলগ্যাষ্ট তাই দুঃখ করে বললেন-**'এ যাবৎ আমরা যা বলেছি সব ভুল।** এখন তা হলে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) বাণীকে সম্বল না করে বিজ্ঞান চর্চা ব্যর্থ।

কোরআন ও হযরতের মিরাজ হতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, **আমাদের মাথার উপর স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ বিদ্যমান। প্রতিটি আকাশের দূরত্বও আবার পাঁচশত বছরের পথ।**

উপরে বর্ণিত কোরআনে বাণী হতেও এ সাতটি আকাশের বর্ণনাই পাচ্ছি। বারবার যখন আল্লাহ এ স্পষ্ট ধারণা আমাদের দিচ্ছেন তখন বিভ্রান্তিমূলক চিন্তায়, আকাশের অস্তিত্ব নেই-সপ্তগ্রহকে আকাশ, শূন্য মহাশূন্য বলবার কোন যুক্তিই নেই। যারা এমন বলে থাকেন তাঁদের চিন্তাই পাল্টে যায় যুগে যুগে। কিন্তু এই আকাশের ন্যায় পৃথিবী কথাটি আমাদের

www.pathagar.com

চিন্তায় একটি বিপ্লব এনে দিল। তবে কি সুদৃঢ় সপ্ত আকাশের ন্যায় সপ্ত পৃথিবী বিদ্যমান? অনেক ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে প্রশ্ন আমিও পেয়েছি। হঠাৎ করে জবাব দিতে পারি নি। চলুন দেখি এ প্রশ্নের কোন সমাধান হয় কি না।

হযরতের মিরাজ পরিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত। প্রথম আকাশ হতে সপ্ত আকাশের মাঝে কোথায় কি ঘটেছে, কে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, কে আশীর্বাদ করেছেন, কে আলিঙ্গন করে ধন্য হয়েছেন সে সবও দেখেছি ও তার বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু পাই নি কোন নতুন পৃথিবীর কথা-কোন অদ্ভুত কিমাকার জীবজন্তুর কথা, কোন বাসস্থান বা তরুলতার নিবিড় অরণ্যের কথা। নভোযানের নভোচারী হয়ে নভমণ্ডলের বিমানে বিতানে বিতানেই তিনি আরোহন করেছেন আর পাড়ি জমিয়েছেন অদৃশ্য লোকের অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যের সুমহান আশায়। যে পৃথিবীকে ছেড়ে একবার শূন্য মার্গে উঠলেন সেরূপ পৃথিবীর নাগাল আর পেলেন না। দেখলেন না তদনুরূপ আর একটি পৃথিবী। আকাশের পর আকাশ পেলেন–পৃথিবীর পর পৃথিবী পেলেন না। অর্থাৎ এ পৃথিবীর দ্বিতীয় নেই, তৃতীয় নেই, চতুর্থ নেই, পঞ্চম, ষষ্ঠ নেই। পৃথিবী একক Single, জীবজন্তুর একমাত্র বাসস্থান। এজন্যই একে **'মহাদান'** বরা হয়েছে।

আকাশের এক বচন আছে সামায়া। বহুবচন আছে (plural number) সামাওয়াতেন। **পৃথিবীর একবচন আছে, বহুবচন নেই**। সমগ্র কোরআন খুঁজে পেলাম না। বৈজ্ঞানিক নবীও বহুবচনের ব্যাখ্যা দিলেন না। তবে কোন্ চিন্তায় পৃথিবীর বহুবচন টেনে 'আরদ্বাওয়াতেন' করি? সংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর বড় গরমিল। তবে কি গঠন নৈপুণ্যে আকাশের মত স্তরে স্তরে এ পৃথিবীকে সাজান হয়েছে? একবার চিন্তা করে আমরা তা দেখছি।

বৈজ্ঞানিকদের মতে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর কয়েকটি স্তর যা বিচ্ছিন্ন নয়, অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, যেমন ঃ- (১) বায়ুমণ্ডলীর স্তর, (২) মৃত্তিকা স্তর, (৩) কর্দম স্তর, (৪) খনিজ স্তর, (৫) বিভিন্ন পদার্থ সংমিশ্রিত স্তর, (৬) ধূম্র স্তর, (৭) বাষ্প স্তর।

৭টি আকাশের ন্যায় ৭টি পৃথিবী নয়। স্তরে স্তরে যেমন সপ্ত আকাশ তেমনি সপ্ত স্তরে গঠিত এ পৃথিবী।

মুসলিম জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন।.এক একটি ভাগকে তাঁরা 'একলিম' বা মহাদেশ নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন (১) এশিয়া, (২) ইউরোপ, (৩) আফ্রিকা, (৪) উত্তর আমেরিকা, (৫) দক্ষিণ আমেরিকা, (৬) অষ্ট্রেলিয়া ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, (৭) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

পৃথিবীর স্তর পরীক্ষা করে ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেছেন যে পৃথিবীর ৭টি স্তর বিদ্যমান। যেমন–(১) বায়ুমণ্ডলীয় স্তর (Air stone) (২) বালুকা স্তর (Sand stone), (৩) চূর্ণ প্রস্তর (Lime stone), (৪) কর্দম প্রস্তর (Clay stone), (৫) শ্লেট-শিলা স্তর (Slate stones), (৬) অভ্রস্তর (Mica stone), (৭) পাথুরিয়া কয়লার স্তর (Coal stone)।

কোরআন বর্ণিন-'স্তরে স্তরে সপ্ত আকশ', 'সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ'– এ সব বাণীসমূহের সঙ্গে ভূ-তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের পৃথিবীর স্তরসমূহের সাদৃশ্য ও সংখ্যার সুন্দর মিল দেখা যায়। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বৈচিত্রের এমন সৌ-সাদৃশ্য অন্যকোন বস্তুর সঙ্গে দেখা যায় না। পৃথিবীর একক সংখ্যার উপরেই এ বিশ্লেষণ অতীব সুন্দর ও বাস্তব।

প্রাচীনকালের বিভিন্ন তফসীরকারকগণ পৃথিবীর এ একক সংখ্যার উপরই আলোচনা করেছেন এবং এ মন্তব্যই করে গেছেন। "তফসীরে খাজেনের" হাশিয়াস্থিত ৪র্থ খণ্ড ২৯৭ পৃষ্ঠার পূর্বে বর্ণিত কোরানে আয়াতের বিশ্লেষণে বর্ণিত হয়েছে–"পৃথিবী একটিই মাত্র, তবে তা সপ্ত ভাগে বিভক্ত।"

www.pathagar.com

'তফসীর তাবরীতে' বিভিন্ন মতের বহু সংখ্যক হাদিসের উল্লেখ আছে। তাবরীর হাশীয়াতে পণ্ডিত প্রবর নিশাপুরী বর্ণনা করেছেন যে সপ্ত আকাশের সহিত যে পৃথিবীর তুলনা করা হয়েছে তার সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বরং সৃষ্টি বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে। ৭টি আকাশের ন্যায় ৭টি পৃথিবী, প্রত্যেক পৃথিবীতে নবী পয়গম্বর ও প্রাণীর অস্থিত্ব বিদ্যমান, এক পৃথিবী হতে আর এক পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচ শত বছরের পথ এরূপ ধারণা সত্যের প্রতিকূল। হযরত ইবনে আব্বাছের একটি হাদিসকে বিকৃত করেই অনেকে এমন ধারণা করে থাকেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল এবং মিথ্যা। বিজ্ঞানের যুগে এখন পৃথিবী সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ হয়েছে। পৃথিবীর চতুর্দিকে রকেট যোগে পরিভ্রমন করা হয়েছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আবিষ্কৃত হয়েছে। এর পরিধি (২৫ হাজার মাইল), ব্যাস (৮হাজার মাইল) নিরূপিত হয়েছে। সাগর, মহাসাগর, দেশ, মহাদেশ ভাগ করা হয়েছে, দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ বের করে ভ্রমণের ও আবহাওয়ার তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এবং উপরিভাগের গ্রহ উপগ্রহেও অভিযান করে প্রাণিজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। একটি মাত্র পৃথিবী জীবজন্তুর একটি মাত্র বাসস্থান –নবী পয়গম্বরদের এ একটি মাত্রই জন্ম ও হেদায়েতের স্থান–এটাই কোরআনের 'আরদা'–একক পৃথিবী।

হযরত ইবনে আব্বাছ বর্ণিত–"পৃথিবী সপ্তভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে প্রাণী আছে"–কথাটিকে বিশুদ্ধ মনে করে নিলেও এর ব্যাখ্যা কদর্য না করে আমরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়ও করতে পারি। যেমন সপ্ত মহাদেশ নিয়েই এ পৃথিবী, প্রতিটি মহাদেশেই জীবজন্তু ও প্রাণী বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর ৭টি স্তর যা এক সময়ে গঠিত হয় নি। লক্ষ লক্ষ বছর পর সপ্তযুগে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমনঃ-

(১) বাষ্পযুগ–যখন পৃথিবী বাষ্পময় ছিল। আর এ বাষ্পসমুদ্রে অজস্র জীবাণু, বীজানু, ও কীটানু ছিল।

(২) এ যুগে ছয় প্রকার প্রস্তর, জীব শ্রেণীর মধ্যে স্পঞ্জ, কোরাল মুক্তা, এক প্রকার উজ্জ্বল বর্ণের মৎস, বৃহদাকার কচ্ছপ, উদ্ভিদের মধ্যে পত্র পুষ্পহীন বৃক্ষরাজী ছিল।

(৩) সরিসৃপ যুগ–এই যুগে তিন প্রকার প্রস্তর স্তর, ভয়াবহ আকারের অজগর সর্প, টিকটিকির আকৃতিবিশিষ্ট বা ডানাবিশিষ্ট জন্তু; এদের দন্ত কুমিরের ন্যায় হতো। উদ্ভিদের মধ্যে বৃহৎ আকারের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল।

(৪) স্তন্যদায়িনী প্রাণী–তিমি মৎস, সর্প, বনমানুষ ও বানর, পত্রপুষ্প শোভিত বৃক্ষ ও কুঞ্জবন।

(৫) হাতীর স্বভাববিশিষ্ট জাবরকারী জন্তু, একপ্রকার হাতী ও পার্বত্য বাঘ।

(৬) অসভ্য মানব যুগ–এরা প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র, পাত্র যন্ত্রাদি ববহার করত, একে প্রস্তরযুগ লা হয়।

এই সপ্তযুগের এক এক স্তরে এক এক প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছিল। এখনও ঐ সব যুগের যে সব কঙ্কাল বা ফসিল মেলে তাহতে পূর্ব যুগের স্তর ও বস্তুসমূহের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরূপ অনেক চিন্তাধারা আছে যা পৃথিবীর সপ্তস্তরের প্রমাণ বহন করে কিন্তু গঠন নৈপুণ্যের দিকে বিচার করলে ভূতাত্ত্বিক মতবাদটি সমর্থনযোগ্য। এটাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ এবং আকাশের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষাকারী বিশ্লেষণ। সপ্ত মহাদেশ এং সপ্তযুগ পৃথিবীর স্তরের প্রমাণ করে না।

www.pathagar.com

রসায়নবিজ্ঞান

"তিনিই তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় সুন্দরতর করিয়াছেন এবং তিনিই মৃত্তিকা হইতে মানব সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপর তিনি অবজ্ঞাত সলিলে সারাংশ হইতে উহার বংশধর করিয়াছেন।" [কোরআন। সূরা সেজদা। আয়াত নং ৭-৮]

রসায়নবিজ্ঞান

এ জটিল বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করা মানুষের সাধ্যে নয়। তবুও এর রহস্য জান্‌তে তাদের মনে স্বভাবতঃই এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কোন্ সূচনা ধরে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, কোন্ মৌলিক পদার্থ এ সৃষ্টি রহস্যের মূলে, কোন্ মহারসায়নবিদ এ সৃষ্টিতে হাত দিয়েছেন তা জানবার কৌতূহল জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের প্রতিনিয়তই হচ্ছে। ধর্মশাস্ত্রবিদদের বাণী নিয়ে হাজার হাজার যুগ কেটে গেছে এ বিশ্বাসেই যে কোনও এক মহাশক্তি আলোককে অন্ধকার হ'তে দূর ক'রে এ সৃষ্টিতে হাত দিয়েছিলেন। আকাশ ও পৃথিবী ছিল মিলিত। সব কিছুই জলের উপর অবস্থিত ছিল। এ সব মূল্যবান তত্ত্ব আমরা আল্লাহর মহাবাণী কোরআন ও বাইবেলে দেখতে পাই। যেমন কোরআন বলেছে ঃ

"অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে আকাশ ও পৃথিবী ছিল মিলিত। আমরা তাদের করেছি বিচ্ছিন্ন। আমরা পানির সাহায্যে সব কিছুকে করেছি জীবন্ত।"[১]

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।"[২]

বাইবেলে বলা হয়েছে, "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপর ছিল। আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক। তাহাতে দীপ্তি হইল।"[৩]

এ সব ধর্মগ্রন্থ হ'তে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এ মহাবিশ্ব এক মহাসমারোহে তার যাত্রা ক'রেছিল শুরু।

বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু এ মতবাদের উপর ঘুরপাক খাচ্ছেন। কেউ বলেন, "কোন এক সময়ে বিশ্বের সমস্ত পদার্থ সমহারে সঙ্কুচিত একটি অবিচ্ছিন্ন তপ্ত গ্যাসপিণ্ড মাত্র ছিল।"[৪]

কোটি কোটি বৎসর পূর্বের এই সঙ্কুচিত গ্যাস পিণ্ডের ক্রমাবর্তনের ফলেই এই বিশ্ব বর্তমানে অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এ মতবাদকে **'আরম্ভ প্রকল্প'** বলা হয়।

আবার অনেক বৈজ্ঞানকরা মনে করেন যে এ বিশ্ব এখন যে অবস্থায় আছে পূর্বেও ঠিক তাই ছিল। ক্রম বিবর্তনের ফলে কোন কিছু এতে ঘটে নি। এ মতবাদকে **'স্থিতাবস্থা'** প্রকল্প বলা হয়।

এ 'আরম্ভ প্রকল্প' ও 'স্থিতাবস্থা' প্রকল্পের উপর বিশেষ আলোচনা করেছেন জর্জ গ্যামো। অবশ্য জর্জ গ্যামো আরম্ভ প্রকল্পেরই অনুসারী। স্থিতাবস্থা প্রকল্পের অনুসারী যারা তাদের মধ্যে রাশিয়ার জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত 'ভরোনৎসফ ভেলিয়ামিনফ'[১] ও বৃটিশ জ্যোতির্বিদ **'ফ্রেড হয়েল'**[৩] এর নাম উল্লেখযোগ্য।

টীকা ঃ ১ –২। কোরআন, সূরা আম্বিয়া ও সূরা নূর। আয়াত ৩০ ও ৪৫।

৩। বাইবেল, প্রথম অধ্যায়। আদি সৃষ্টি রহস্য পরিচ্ছেদ।

টীকা ঃ ৪ জগৎ ও মহাজগৎ – By জর্জ গ্যামো–২য় পৃষ্ঠা।

টীকা ঃ ১–২ Fred Hoyle The Nature of the Universe; Harper and Brothers. New York.

www.pathagar.com

স্থিতাবস্থা প্রকল্পের পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাক্‌লেও এ প্রকল্পকে তারা গ্রহণ করতে রাজি না। কেননা কোন কিছুর সৃষ্টির মূলেই **'আরম্ভ প্রকল্প'** থাকতেই হয়। আরম্ভ ছাড়া সৃষ্টি হয় না। যে সম্প্রসারণ নীতিতে এ বিশ্ব সম্প্রসারিত সে নীতির একজন প্রবক্তা আছে বলেই সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া যে বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্ব সম্প্রসারিত হয়েছে তারও আরম্ভ প্রকল্প ছিল। এর মূল বস্তু কি এবং কোন সময় এর সৃষ্টি হয়েছে এবং কিরূপে হ'য়েছে এ সব জটিল প্রশ্নের কোন সমাধান নেই। তবে মূল বস্তুকে আমরা পানি ধরে নিতে পারি। এই একমাত্র উপাদান পানি যাকে ইচ্ছামত সম্প্রসারণ, সংকোচন, সংযোজন ও বিয়োজন করা চলে। তাই পানিকে নিয়েই এ আরম্ভ প্রকল্প। কোরআন এ কথারই সাক্ষী দেয়।

'এবং আল্লাহ পানিদ্বারা সর্বাধিক জীব জন্তুর সৃষ্টি করেছেন।[৩] (২৪ ঃ ৪৫)

'এবং প্রত্যেক চেতন পদার্থকে সলিল হতে সৃষ্টি করেছি।[৪] (২১ ঃ ৩০)

এবারে দেখি আমাদের কল্পনা প্রসূত চিন্তাধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদের (দঃ) বাস্তব চিন্তাধারার মিল কতটুকু।

'আরম্ভ প্রকল্প' যে বাস্তব হযরতের (দঃ) নিম্নোক্ত বাণী তার প্রমাণ দেয়। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ্ ছিলেন এবং অন্য কিছু ছিল না। তিনি ভিন্ন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি লিখিলেন সব জিনিস সুরক্ষিত গ্রন্থে এবং সৃষ্টি করিলেন আসমান ও জমিন।"[৫]

'সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে সেই আকারে যে আকারে উহা ছিল আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন।"[২]

'স্থিতাবস্থা' প্রকল্পের মাথায় কুঠারাঘাত করেছেন সার্বজনীন বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি সত্যের থিওরী দিলেন, সত্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে অসত্যের বাণী বাহকদের কবর দিলেন। এ বিশ্ব আপনা আপনি হয় নি। আপন ইচ্ছায় চলেছে না। এর প্রকল্প ছিল। এর আরম্ভ ছিল। এর সৃষ্টিকর্তাও ছিল, আছে এবং চিরদিন থাকবে এ ধারণা আমাদের মত বিভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকদের তিনি শিখিয়ে দিলেন।

বিশ্বের সব কিছুই একই অবস্থায় ছিল এবং আছে যারা এরূপ ধারণা আজও পোষণ করেন তারা চন্দ্র-সূর্যের বয়স, নীহারিকা, উল্কার সৃষ্টি পরমাণু, শিলা ও তেজস্ক্রিয় ধাতু সমূহের আদি বর্তমান রূপ বৈশিষ্ট্য হিসাব করলেই বুঝতে পারবেন যে আদিতে এসব বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। পদার্থ সমূহ উত্তপ্ত অবিচ্ছিন্ন গ্যাস পিণ্ড মাত্র ছিল। এরও পূর্বে যা ছিল তা হলো পানি বা জল।

• হযরতের (দঃ) **'আরম্ভ প্রকল্পকে'** যারা মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করছেন তাঁরা দেখুন খামখেয়ালী বশে আমদের মত তিনি একথাগুলো বল্‌ছেন না। সৃষ্টিকর্তার নিকট হতে মহাসূত্র নিয়েই আমাদের এ জ্ঞানদান করেছেন সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

"এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিও তাঁহার নিদর্শনাবলীর অর্ন্তগত। তিন তন্মধ্যে জীবজন্তু সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তিনি যখন ইচ্ছা উহাদিগকে একত্রিত করিতে শক্তিমান।"[১] (৪২ ঃ ২৯)

1951.

৩-৪। কোরআন, সূরা নূর, আয়াত-৪৫ সূরা আম্বিয়া, আয়াত–৩০।

-৫ সহীহ বুখারী–তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। ১ম খণ্ড। পৃষ্ঠা, ১৭৪ ও ৭৬। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ।

১। কোরআন, সূরা শূরা। আয়াত ২৯।

www.pathagar.com

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদউভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা **ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন**। তৎপর আরশোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনই অভিভাবক বা অনুরোধকারী নাই। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না? তিনিই আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল কার্য সুনিয়ন্ত্রিত করেন তৎপর সেইদিন যাহার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুসারে সহস্র বৎসর, উহার সুব্যবস্থা তাহারই দিকে আরোপিত হইবে। তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী পরাক্রান্ত করুণাময়। তিনি তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় সুন্দরতর করিয়াছেন এবং **তিনিই মৃত্তিকা হইতে মানব সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপর তিনি অবজ্ঞাত সলিলের সারাংশ হইতে উহার বংশধর করিয়াছেন**। অনন্তর উহাকে পুর্ণাঙ্গ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণসকল ও চক্ষু সকল ও অন্তরসমূহ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাক।"[২] [৩২ ঃ ৪-৯)

"এবং নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সমূহ নির্মাণ করিয়াছি এবং আমি দর্শনকারীদের জন্য উহা সুশোভিত করিয়াছি।"[৩] [১৫ ঃ ১৬]

"এবং আমি পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং তন্মধ্যে পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং তন্মধ্যে পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয় সম্পূরন করিয়াছি এবং আমি তন্মধ্যে তোমাদের জন্য উপজীবিকা সৃষ্টি করিয়াছি এবং **তাহার জন্যও তুমি যাহার জীবিকাদাতা নহ**। এবং এমন কোন বিষয় নাই যে তাহার নিকট যাহার ভাণ্ডার না আছে এবং আমি নিরূপিত পরিমাণ ব্যতীত উহা অবতারণা করি না। এবং আমি পরিপূর্ণকারী বায়ু প্রেরণ করি। তৎপরে আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি। অনন্তর উহা তোমাদিগকে পান করাই এবং তোমরা উহার জন্য সঞ্চয়কারী নহ। এবং নিশ্চয় আমিই সঞ্জীবিত করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই উত্তরাধিকারী প্রভু। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে পরিজ্ঞাত আছি এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তোমাদিগকে একত্রিত করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি সুবিজ্ঞ মহাবিজ্ঞানী।"[৪]

কোরআনের এরূপ অজস্র বাণী বৈজ্ঞানিকদের হতবাক করে দেয়। চিন্তার উপকরন যোগায়। মতভেদের চরম মীমাংসা এনে দেয়। তবুও খুঁতখুঁতে মন এর বৈজ্ঞানিক সমাধান চায়। চায় অজানাকে জান্‌তে। অচেনাকে চিন্‌তে। মানুষের এ স্বভাব অস্বাভাবিক স্বভাব নয়। ধ্বংসাত্মক ও নয়। এ স্বভাব আছে বলেই আজ তার দূর-দূরান্তের খবর নিতে পারছে কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারছে। জড় পদার্থকে দিয়েও কথা বলাতে সক্ষম হচ্ছে। কোন যাদু-মন্ত্রের উপর নয়। বুদ্ধি, কৌশল ও অসাধারণ চেষ্টাই মানুষকে সফলকাম করেছে সর্বজীবের উপর অধিপত্য বিস্তার করতে। এজন্য কোরআন বলেছে "এবং এতদ্ব্যতীত মানুষের জন্য কিছুই নাই যাহার জন্য সে চেষ্টা করে"[৫] [৫৩ ঃ ৩৯] সৃষ্টি তত্ত্বের উপর আমরা আলোচনা করছিলাম। **'আরম্ভ প্রকল্প'** ও **'স্থিতাবস্থা'** প্রকল্প নিয়ে যে মতভেদ আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) তার চরম মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভ দিনের উল্লেখ ক'রে। এ ছাড়া আল্লাহর বাণী

টীকা ঃ ২-৩। কোরআন, সূরা শূরা। আয়াত ২৯ ওসূয়া সেজদা, আয়াত ৪৯।

৫। কোরআন, সূরা হেজর। আয়াত ১৬ ও ১৮ - ২৫।

www.pathagar.com

কোরআন হাতে নিয়েও এর সর্বশেষ সমাধান দিয়েছেন। কয়দিনে এ বিশ্ব সৃষ্টি হ'য়েছে, কি উপাদানে মানুষ ও জীবজন্তুর সৃষ্টি হ'য়েছে, কোন মূল্যবান উপাদান এ সৃষ্টির মূলে নিহিত, কে এ সৃষ্টির মালিক, কে সম্প্রসারণ ও আদি প্রকল্পের নিয়ন্তা, কোরআন তার বিশেষ বর্ণনা দিয়েছে। এ বর্ণনায় কোন ভুল নেই। কোন অবাঞ্ছিত কথা নেই। আছে বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের মহাসূত্র। এ মহাসূত্র নিয়ে ও বৈজ্ঞানিক নবীর বাণী ধরে চলুন আমরা দেখি এর বৈজ্ঞানিক সমাধান খুঁজে পাই কি-না।

বস্তু মাত্রই সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধীন। সৃষ্টি ভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব অসম্ভব। বিশ্বের যে কোন পদার্থের দিকে তাকালেই তা বুঝা যায়। ক্ষুদ্র একটি ডিম থেকে কিভাবে স্তরে স্তরে পূর্ণ সৃষ্টির রূপ লাভ করে তা দেখতে কারোই বাকি থাকে না। উদ্ভিদের বীজকণা থেকে ভ্রুণের সৃষ্টি 'এরপর পূর্ণ উদ্ভিদ' তার ফলদান ও মৃত্যুর সঠিক বয়স সীমাও নির্ধারণ করে। নারী পুরুষের চরম উত্তেজনার মূহুর্তে যে বীর্যপাত ঘটে তার সমন্বয়েই গঠিত হয় এক কণা রক্ত যার শেষ পরিণতি পূর্ণাঙ্গ এক মানব শিশু। রাসায়নিক বিবর্তনের ও ক্রমবিকাশের এ ধারা কেউ কি অস্বীকার করতে পারে? সৃষ্ট বস্তুর একটি বয়সসীমা আছে। এ সীমা পার হলেই হয় তার ধ্বংস। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অণু, পরমাণু, জীবজন্তু যা নিয়ে এ বিশ্ব গঠিত সে বিশ্ব যে এক শুভক্ষণে সৃষ্টি হয়েছে, এক মহা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর সম্প্রসারণ হয়েছে তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই; বৈজ্ঞানিকদের চোখেও আজ তা ধরা পড়েছে। এ মহাজগতের বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে তাঁদের খুঁজতে হয়েছে মহা জগতের মহাসৃষ্টি। **'আদিম, পরমাণু প্রকল্প'** নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেলজিয়াম বৈজ্ঞানিক জর্জেস ল্যামেটার বলেছেন,

'পরমাণুর জগৎ টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙ্গে পড়লো। প্রত্যেকটি টুকরো আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হলো। সহজে বুঝবার জন্য, আমরা যদি মনে করি যে এ বিভক্তিকরণ সমান সমান খণ্ডে ঘটেছিল, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে পদার্থকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে আমাদের ক্ষুদ্র পরমাণু বেচারা (যাকে আর বিভক্ত করা যায় না) পর্যন্ত পৌঁছিতে দুইশত ষাটবার ক্রমিক বিভক্তিকরণের প্রয়োজন হ'য়েছিল। যে আতসবাজী কেবল মাত্র শেষ হয়ে গেছে তার সঙ্গে পৃথিবীর বিবর্তনের তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু লাল গুচ্ছ, ছাই আর ধোঁয়ায়। ঠাণ্ডা অঙ্গারের উপর দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যসমূহের ধীর ম্লান হ'য়ে যাওয়া দেখি এবং পৃথিবী সমূহে লুপ্ত ঔজ্জ্বল্য স্মরণ করার চেষ্টা করি।'[১]

তাঁর এ মতবাদ হ'তে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এ বিশ্ব-সম্প্রসারণের একটা আরম্ভ প্রকল্প ছিল। তিনি বুঝতে চেয়েছেন যে সম্প্রাসারণ আরম্ভ হবার পূর্বে বিশ্বের সমস্ত পদার্থ তরল আকারে একটি ঘণীভূত কেন্দ্র কণা গঠন করেছিল। এ সময় তাপমাত্রাও তুলনামূলক ভাবে কম ছিল বলে পরমাণুগুলি সংঘবদ্ধ অবস্থায় বিরাজমান ছিল। সম্প্রসারণ আরম্ভ হবার পর আদিম তরল পদার্থ যান্ত্রিকভাবে অস্থায়ী হয়ে পড়ে এবং অসংখ্য টুকরায় বিভক্ত হয়।

টীকা ঃ ১ । জগৎ ও মহাজগৎ-জর্জ গ্যামো। পৃষ্ঠা ৬৩

www.pathagar.com

বিশ্বে পদার্থের শতকরা ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৪৪ ভাগ হিলিয়াম। বাকি একভাগ অন্যান্য ভারি মৌলিক পদার্থ। যেমন পিচব্লেন্ড, ইউরানাইড, মোনাজাইড ইত্যাদি। এইসব হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও মৌলিক পদার্থ সমূহের সমষ্টি নিছক নয়। পূর্ব হতেই এগুলি ছিল। সৃষ্টি ব্যতিরেকেই এগুলির সূচনা হয়েছিল, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যতীতই এ বিশ্ব সম্প্রসারিত হয়েছিল–এ চিন্তাধারাই বরং নিছক। যে সব সৃষ্ট বস্তু আজীবনকাল থেকেই চলে আসছে অর্থাৎ স্থিতাবস্থা প্রকল্পের অধীনে আছে বলে অনেকে অনুমান করেন–তাদের থিওরী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় যখন এদের বয়স নির্ণয় করা হয়। তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থের বয়স হিসাব করে তাঁরা বলেন,

পদার্থ	বয়স
পিচব্লেন্ড	৫৮ হতে ১৩৩.০০ কোটি বৎসর।
ইউরানাইড	১৭৬.০০ হতে ১৯৮.০০ কোটি বৎসর।
মোনাজাইড	২৭১.০০
সূর্য	৫× ·১০৯ বৎসর
চন্দ্র	৩৫ × ১০৯ বৎসর
পৃথিবী	৩৫ × ১০৯ বৎসর
তারা জগৎ	২ ×১০৯ হইতে ৫ × ১০৯ বৎসর
ভূ-ত্বকের বয়স	২৭ × ১০৯ বৎসর
সমুদ্রের বয়স	কয়েকশত কোটি বৎসর।

বৈজ্ঞানিক মোহাম্মদ (দঃ) **'বিশ্ব আরম্ভ প্রকল্পের'** যে সূত্র দিয়েছেন তা আজ প্রমাণিত সত্য বলে বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ছে। পদার্থসমূহের বয়সের হিসাব করে সৃষ্ট বস্তুর আরম্ভকালকে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ধ্বংস প্রকল্প ঃ হযরত (দঃ) তাঁর আরম্ভ প্রকল্প দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। **'ধ্বংস প্রকল্পের'** যে সূত্র তুলে ধরেছেন আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তা হয়ত কল্পনাও করতে পারছেন না। চলুন দেখি মহারাসায়নিক হযরতের (দঃ) ধ্বংস প্রকল্পের রূপ কেমন। তিনি বলেছেন,

"চন্দ্র ও সূর্যকে গুটান হইবে কিয়ামতের দিন।"[১]

"মানুষ দাড়াইবে জগৎ সমূহের প্রভুর সম্মুখে এমন অবস্থায় যে নিজের ঘামে ডুবিয়া যাইবে কান আধাআধি পর্যন্ত।"[২]

'আল্লাহ্ মুঠির ভিতরে রাখিবেন পৃথিবীকে আর ডান হাতে জড়াইবেন আকাশ সমূহকে। তারপর বলিবেন, 'আমি বাদশা। কোথায় গিয়াছে পৃথিবীর বাদ্‌শা সব?"[৩]

"দুই শিঙ্গা ধ্বনির মধ্যে ব্যবধান হইবে চল্লিশ।"[৪]

"কিয়ামতের দিনে লোকদের একত্র করা হইবে গমের রুটির মত এক সাদা সমতল ভূমির উপর।"[৫]

তোমাদের সংগ্রহ করা হইবে নগ্নপদ, নগ্নদেহ ও বে-খাতনা অবস্থায়।"[৬]

টীকা ঃ ১ -২। সহীহ বুখারী–তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৭৮ ও ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৫৬।

৩ -৪। সহীহ বুখারী তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। তজরীদুল বুখারী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩৬।

৫ । ঐ ৪৪৬।

৬ -৭। ঐ ২৪৫।

www.pathagar.com

"কিয়ামত তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং কিয়ামত বড় কঠিন ও তিক্ত।"[৭]

হযরতের (দঃ) ধ্বংস প্রকল্পের সঙ্গে আজ অনেক বৈজ্ঞানিকই একমত হচ্ছেন। এ মহাবিশ্ব যে আজীবনকাল থেকেই চলে আসছে না, এরও যে ধ্বংস আছে; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যারা কোটি কোটি বছর ধরে কিরণ দিয়ে আসছে তারাও যে এক মহাযুগ সন্ধিক্ষণে নিষ্প্রভ হবে এ কথা গোঁড়াবাদীরা অবিশ্বাস করলেও যুক্তিবাদী ও প্রমাণবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে বাধ্য। জর্জ গ্যামো, আইনস্টাইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের ধারণায় তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

গ্যামো বলেছেন,

'যতই সময় অতিবাহিত হবে এবং আমাদের তারা বিশ্বের বয়স যতই বৃদ্ধি পেতে থাক্‌বে ততই কমভর বিশিষ্ট তারা সমূহ ক্রমশঃ তাদের স্বাভাবিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌছবে এবং ৫, ০০০, ০০০, ০০০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরই আমাদের সূর্যের মৃত্যু পরোয়ানা আসবে।"[১]

আইনস্টাইন বলেছেন, 'অনমনীয় এবং অপরিবর্তনীয় ভাবে বিশ্ব এক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"[২]

বৈজ্ঞানিক গ্যামোর ধারণা অনুযায়ী ৫০০ কোটি খ্রীস্টাব্দে এ বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য। এ ধারণাকে আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি না। বিশ্বের ধ্বংস তারিখ বা সনের উল্লেখ করেন নি। বরং হযরতকে (দঃ) কিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে,

"যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী নহে।"[৩]

এ সম্বন্ধে কোরআন বলেছে,

"তাহারা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে? যদ্বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিয়া থাকে? অবশ্য অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।"[৪]

(৭৮ ঃ ১-৪)

ধ্বংসলীলার পূর্বে কিরূপ লক্ষণ ঃ দেখা দেবে শুধু তার কিছু বিবরণ মেলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও যীশুর বাণী হতে। হযরত (দঃ) বলেছেন ঃ

"উহা এই যে ক্রীতদাসী তাহার কর্ত্রীকে জন্মদান করিবে এবং তুমি নগ্নপদ উলঙ্গ, দরিদ্র মেষপালকগণকে (আমির ও বাদশার পরিবর্তে) গর্বভরে প্রাসাদ মধ্যে বসবাস করিতে দেখিবে।"[৫]

১। "গণনা কর ছয়টি জিনিস কিয়ামতের পূর্বে! (১) আমার মৃত্যু, তারপর (২) বায়তুল মোকাদ্দেছ বিজয়, (৩) তারপর উলাউঠা যাহা তোমাদের ধরিবে কুয়াস রোগের মত, (৪) তারপর ধন বৃদ্ধি। এমনকি কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার দেওয়া হইলেও সে অতৃপ্ত তাকিবে। তারপর (৫) এমন গোলযোগ যে আরবে একটি ঘরও বাকি থাকিবে না যাহাতে

১। জগৎ ও মহাজগৎ - জর্জ গ্যামো ১৮।

২। সংগৃহীত-'চল্লিশজন বিজ্ঞানীর মতে আল্লাহ্' পুস্তক।

টীকা ঃ ৩। হাদিসের আলো, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৭।

৪-৫ কোরআন সূরা নবা। ১ হতে ৪ আয়াত। ২। হাদিসের আলো–১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৮। ৩। সহীহ বুখারী। তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। জিহাদের মাহাত্ম পরিচ্ছেদ।

www.pathagar.com

প্রবেশ করিবে না উহা। তারপর (৬) **এক সন্ধি যাহা হইবে তোমাদের ও রোমীওদের মধ্যে**। তাহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আসিবে আর নিশানের নিচে এবং প্রত্যেক নিশানের নিচে থাকিবে বার হাজার লোক।"[১]

২। "কিয়ামত হইবে না যতদিন না হিজাজ হইতে এমন এক অগ্নি বাহির হইবে যাহাতে উজ্জ্বল হইবে বসরার উষ্ট্রদের গ্রীবা।"[২]

৩। "সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। ফোরাত নদী সোনার ধনাগার বাহির করিয়া দিবে কিন্তু যাহারা উপস্থিত থাকিবে সেখানে তাহারা যেন উহা হইতে না লয় কিছু।"[৩]

৪। "কিয়ামত হইবে না যতদিন না দুই বড় দল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিবে এবং ভীষণ যুদ্ধ করিবে এক, ভীষণ যুদ্ধ করিবে-যাহাদের দাবী এক হইবে। যতদিন প্রায় ত্রিশজন **মিথ্যা দাজ্জাল উঠিবে এবং তাহাদের প্রত্যেকে দাবি করিবে যে সে খোদার রসুল**। এবং যেদিন না বিদ্যা তুলিয়া লওয়া হইবে এবং ভূমিকম্প বেশি বেশি হইবে ও সময় পরস্পরের নিকটবর্তী হইবে এবং বিপর্যয় প্রকাশ পাইবে এবং বেশি বেশি যুদ্ধ হইবে এবং যতদিন না তোমাদের মধ্যে ধন বাড়িবে এবং নদীর পানির মত বাহিরে এমনকি ধনী চিন্তিত হইবে কে তাহার 'সাদকা গ্রহণ করিবে এবং যাহার নিকট উহা উপস্থিত করিবে সে বলিবে আমার কোন প্রয়োজন নাই উহাতে। এবং যতদিন না লোক দালান কোঠার গর্ব করিবে এবং কেহ কাহার কবরের কাছে দিয়া যাইবে আর বলিবে হায় আমি যদি হইতাম তাহার স্থানে; এবং যতদিন না সূর্য উদিত হয় তাহার অস্তের স্থান হইতে; এবং যখন সে এইরূপ উদিত হইবে তাহাকে দেখিয়া লোকসব ঈমান আনিবে কিন্তু উহা হইবে এমন সময় যে তখন ঈমান আনা কোন আজে আসিবে না; তাহারা যে ঈমান আনে নাই পূর্বে বা ঈমান থাকিয়া করে নাই কোন সৎকাজ এবং কিয়ামত আসিবে এমন অবস্থায় যে দুই ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য কাপড় ছড়াইয়াছে কিন্তু ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না বা কাপড় গুটাতেও পারিবে না। এবং কিয়ামত আসিবে এমন অবস্থায় যে কেহ নিজের হাউজ মেরামত করিতেছে কিন্তু পশুদের পান করাইতে পারিবে না উহাতে এবং কিয়ামত আসিবে এমন অবস্থায় যে কেহ গ্রাস মুখে তুলিয়াছে কিন্তু খাইতে পারিবে না উহা।"[১]

যীশু বলেছেন ঃ

'আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী লুপ্ত হইবে। কিন্তু আমার বাক্য লুপ্ত হইবে না কখনও। তবে সেইদিন ও সেই মুহূর্তের বিষয় কেহই জানে না। স্বর্গ সুতগড়ও না পুত্রও না। **কেবল আমার পিতাই জানেন**।"[২]

অন্যত্র বলেছেন, "তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের বিজয় জানিতে পারিবে। দেখিও তখন ব্যাকুল হইও না কারণ এই সমস্ত অবশ্য ঘটিবে। কিন্তু তখনও কালের অন্ত নয়। কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য অভূত্থান করিবে আর নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবে। ভূমিকম্পও হইবে। এই সমস্ত কিন্তু যাতনার আরম্ভ মাত্র।"[৩]

যার আরম্ভ আছে তার শেষ আছে। যে প্রকল্প একদিন শুরু হয় তা একদিন শেষ হয়। যে সৃষ্টি একদিন রূপ নিয়েছে সে সৃষ্টি একদিন শেষ হবেই; এর মধ্যে দ্বি-মতের কোন অবকাশ থাক্‌তে পারে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও একথা সত্য। সামান্য পানি থেকে আমাদের

১,২,৩। সহীহ বুখারী, তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। গোলযোগ পরিচ্ছেদ। ২য় খণ্ড ; পৃষ্ঠা ৪৯৬-৪৯৯।

টীকা ঃ ১ । সহহি বুখারী ২য় খণ্ড। তর্জমা, আবদুর রহমান খাঁ। গোলযোগ ২য় অংশ, পৃঃ নং ৪৯৬-৪৯৯।

২ । বাইবেল মথি পরিচ্ছেদ ২৪-৩৫ ও ৩৬।

৩ । বাইবেল মথি পরিচ্ছেদ ২৪-৬ হতে ৮।

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় শুরু। এরপর রক্ত-মাংস-হাড়-মজ্জা প্রভৃতি উপাদানে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করে মায়ের পেট থেকে কচি শিশুর হয় জন্ম। তারপর বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের রূপ নিয়ে অবশেষে মৃত্যু রূপ অর্থাৎ ধ্বংস রূপে পরিণতি লাভ করে। সৃষ্টির পূর্বের যেমন আরম্ভ প্রকল্প নিয়ে মানব সন্তান মায়ের গর্ভে স্থিতিলাভ করে তেমনি ধ্বংস প্রকল্প নিয়ে মাটির গর্ভে শয্যা রচনা করে। এ প্রকল্পের মধ্যে কি ব্যতিক্রম আছে? এর বাস্তবায়নের পথে কি কোন ব্যাঘাত আছে? যদি এ সৃষ্টির আদি ও অন্তে কোন ব্যতিক্রম বা ব্যাঘাত না থাকে তবে বিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেই বা ব্যতিক্রম থাক্‌বে কেন? এ সত্য চির সত্য। এ সূত্র মহাসূত্র। এ বাণী মহাসত্যের বাণী। দেখব আল্লাহ স্বয়ং কি সাক্ষ্য দেন।

"আঘাতকারী, ঐ আঘাতকারী কি? এবং তুমি কি জান যে সে আঘাতকারী পশমের ন্যায় হইবে; অতঃপর যাহার ওজন ভারি হইবে, ফলতঃ সে আনন্দময় জীবনে অবস্থান করিবে। অনন্তর যাহার ওজন লঘু হইবে। ফলতঃ তাহার অবস্থিত 'হাবিয়া'; এবং তুমি কি জান যে হাবিয়া' কি? উহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"[৪] (১০১ ঃ ১-১১)

"এবং তোমার অতিরিক্ত মায়ার ধনসম্পত্তির মায়া করিতেছ। কখনও না-যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ রূপে বিচূর্ণিত করা হইবে।"[১] (৮৯ ঃ ২০-১)

"তোমার নিকট কি সমাচ্ছন্নকারীর সংবাদ আসিয়াছে? সেদিন বহু আনন অবনত হইবে।"[২] (৮৮ ঃ ১ - ২)

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। এবং উহা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি কর্ণপাত করিবে এবং উহা তদুপযোগী হইবে। এবং যখন পৃথিবী আকর্ষিত হইবে। এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহা উৎক্ষেপ করিবে এবং উহা শূন্যগর্ভ হইয়া যাইবে। এবং উহা তদুপযোগী হইবে।"[৩]

(৮৪ ঃ ১-৫)

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত হইবে। এবং যখন সমুদ্র সকল উদ্বেলিত হইবে। এবং যখন সমাধিসমূহ সমুত্থিত করা হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হইবে।"[৪]

(৮২ ঃ ১ - ৫)

"সে জিজ্ঞাসা করে যে উত্থান দিবস কবে হইবে? ফলতঃ যখন দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইবে। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হইবে।"[৫]

"ঐ দিন পৃথিবী ও পর্বতসমূহ প্রকম্পিত হইবে। এবং পর্বতমালা বিক্ষিপ্ত বালুকাস্তূপ হইয়া যাইবে।"[৬]

"সেদিন আকাশ বিগলিত তাম্রের ন্যয় হইবে। এবং পর্বতমালা বিধুনিত পশমের ন্যায় হইয়া যাইবে। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না। তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। সেদিন প্রত্যেক অপরাধী শাস্তির পরিবর্তে স্বীয় সন্তানাদি প্রদান করা

টীকা ঃ ৪। কোরআন, সূরা আলকারিয়া।

১। কোরআন, সূরা ফজর আয়াত ২০ ও ২১।

২। কোরআন, সূরা ফজর গাশিয়া আয়াত ১ ও ২।

৩। কোরআন, সূরা ফজর এনশেকাফ আয়াত ১ হতে ৫।

৪। কোরআন, সূরা এনফেতার। আয়াত ১-৫।

৫। কোরআন সূরা কেয়ামাহ। আয়াত ৬ হতে ৯।

৬। " " মোজাম্মেল " " ১৪।

www.pathagar.com

স্পৃহনীয় মনে করিবে। এবং স্বীয় পত্নীও স্বীয় সহোদরকে। এবং আশ্রয় প্রদানকারী আত্মীয় স্বজনকে। এবং পৃথিবীর অন্তর্গত সমস্ত বিষয়কেই। অতঃপর সে কি পরিত্রাণ পাইবে?"[৭]

"যখন পৃথিবী উহার পূর্ণ কম্পণে প্রকম্পিত হইবে। এবং পৃথিবী স্বীয় ভারসমূহ বহির্গত করিয়া দিবে; এবং মানুষ বলিবে উহার কি হইয়াছে? সেদিন সে স্বীয় সংবাদসমূহ ব্যক্ত করিবে। যেহেতু তোমাদের প্রতিপালক উহার জন্য প্রত্যাদেশ করিবেন। সেদিন লোক সকল পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যাবর্তন করিবে, যেহেতু তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সমূহ প্রদর্শন করা হইবে। অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু পরিমাণ সৎকর্ম করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে। এবং যে পরমাণু পরিমাণ দুষ্কার্য করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে।"[১] (৯৯ ঃ ১ - ৮)

"অনন্তর যখন সেই ধ্বংস ধ্বনি উপস্থিত হইবে সেদিন মানুষ তাহার ভ্রাতা হইতে পলায়ন করিবে, এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা; এবং তাহার সঙ্গিনী ও তাহার সন্তানবর্গ হইতেও। সেদিন তাহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের এরূপ অবস্থা হইবে যে, কেহ কাহারও উপকারে আসিবে না। সেদিন বহু আনন দীপ্তিমান হইবে। হাস্যোজ্জ্বল হর্ষোৎফুল্ল। এবং সেদিন অনেক মুখ ধুলি-ধূসরিত হইবে ঐ কালিমায় সমাচ্ছন্ন। ইহারাই আবিশ্বাসী দুষ্কার্যকারী।"[২] (৫৫ ঃ ২৬ - ২৯)

"ইহার উপরে অবস্থিত সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এবং তোমার প্রতিপালকের সত্বাই অবশিষ্ট থাকিবে যিনি মহত্ব ও গৌরবের অধিপতি।"[৩] (৫৫ ঃ ২৬ - ২৯)

"নিশ্চয় সেই মীমাংসা দিবস নির্ধারিত রহিয়াছে। সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে তৎপর তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে এবং আকাশ উদ্ঘাটিত করা হইবে তৎপর বহু দ্বার হইয়া যাইবে। এবং পর্বতমালা বিচলিত হইবে এবং তৎপর উহা মরু-মরীচিকা হইয়া যাইবে।"[৫] (৭৮ ঃ ১৭ -২০)

"এবং যেহেতু সেই সময় আসিতেছে যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং যেহেতু সমাধিসমূহে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সমুত্থিত করিবেন।"[৬] (২২ ঃ ৭)

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি সংঘটিত হইবে। উহার কোনই নিবারণকারী নাই। যেদিন নভোমণ্ডল বিঘুর্ণনে ঘুর্ণায়মান হইবে। এবং পর্বতমালা বিচলনে বিচলিত হইবে। ফলত সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য পরিতাপ।"[৭] (৫২ ঃ ৭ - ১১)

"যখন সেই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে। তখন উহার সংঘটনে কোনই অসত্যতা থাকিবে না। উহাতে উত্থান -পতন হইবে। যখন পৃথিবী মহাআন্দোলনে আন্দোলিত হইবে এবং পর্বতমালা বিচূর্ণনে বিচূর্ণিত হইবে তখন উহা প্রক্ষিপ্ত ধূলি হইয়া যাইবে।"[৮] (৫৬ ঃ ১ - ৬)

---

৭ । " " মারেজ আয়াত ৮ হতে ১৮।

১। " " জেলজাল আয়াত ১ - ৮।

২ । কোরআন, সূরা , আবাসা, ৩৩ ০ ৪২।

৩। কোরআন সূরা রহমান আয়াত ২৬ ও ২৯।

৫ । " " নবা আয়াত ১৭ হতে ২০।

৬ । " " হজ আয়াত ৭।

৭ । " " তুর আয়াত ৭ হতে ১১।

৮। " " ওয়াকেয়া আয়াত ১ হতে ৬।

www.pathagar.com

"সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, চন্দ্র আলো দিবে না এবং নক্ষত্র আকাশ হইতে পতিত হইবে আর আকাশ মণ্ডলের সমস্ত পরাক্রম আলোড়িত হইবে।"[১]

"আর সেইদিন আলো হইবে না। জ্যোতিগণ সঙ্কুচিত হইবে। সে অদ্বিতীয় দিন হইবে। সদাপ্রভুই তাহার তত্ত্ব জানেন। তাহা দিবসও হইবে না, রাত্রিও হইবে না। কিন্তু সন্ধ্যাকালো দীপ্তি হইবে।"[২]

'আরম্ভ প্রকল্প ও ধ্বংস প্রকল্পের' উপর অমরা আলোচনা করেছি। এবারে হযরতের (দঃ) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ বাণী আরম্ভ ও ধ্বংস প্রকল্পের অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটা ধারণা আমাদের দিচ্ছে। যদিও এ বাণীর বিষয়বস্তু সকলেই জ্ঞাত আছেন তবুও এর উল্লেখ ক'রে রসায়ন বিজ্ঞানীদের জটিল সমস্যা সমাধানের একটা বাস্তব চিন্তাধারা এনে দিচ্ছে। হযরত (দঃ) বলেছেন,

"তোমাদের প্রত্যেকের সত্ত্বা মায়ের পেটে বর্ধিত হয় চল্লিশ দিন তারপর উহা থাকে জমাট রক্তরূপ তদ্দিন (চল্লিশদিন)। তারপর উহা থাকে মাংসপিণ্ড রূপে তদ্দিন (চল্লিশদিন) তারপর আল্লাহ্ এক ফেরেশতা পাঠান এবং তাহাকে আদেশ দেওয়া হয় চার কথায় এবং তাহাকে বলা হয়, 'লিখ তাহার কর্ম, তাহার জীবিকা, তাহার আয়ুষ্কাল এবং সে ভাগ্যহীন কি ভাগ্যবান।' তারপর তাহার মধ্যে ফুকিয়া দেওয়া হয় 'আত্মা' তারপর তোমাদের কেহ করিতে থাকে এমন কর্ম যে তাহার মধ্যে ও বেহেশতের মধ্যে ব্যবধান থাকে এক হাত মাত্র। কিন্তু যখন বলবৎ হয় তাহার উপর খোদার লিপি আর সে করিতে থাকে দোজখীর কর্ম। আবার কেহ করিতে থাকে এমন কর্ম যে তাহার মধ্যে ও দোজখের মধ্যে ব্যবধান থাকে একহাত মাত্র। কিন্তু তখন বলবৎ হয় তাহার উপর লিপি আর সে করিতে থাকে বেহেশতীর কর্ম।"[৩]

রসুলের (দঃ) বাণী হ'তে মানব সৃষ্টির সূচনা, ধারাবাহিক পদ্ধতি রাসায়নিক কৌশল, সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক শক্তি, ফুৎকারে অর্থাৎ আত্মাদানে মানব শিশুর পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিষয়টি যেমন জানা যায় তেমনি কর্ম পদ্ধতি, জীবিকা ও আয়ুষ্কালের বর্ণনা হ'তে জীবনের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ ধ্বংসের রূপও জানা যায়। এ উদাহরণ বিশ্বের সৃষ্টি ধ্বংসের জটিল সমস্যারও সমাধান এনে দেয়।

'আরম্ভ প্রকল্পের' যখন একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা আমরা পেলাম তখন স্থিতাবস্থা প্রকল্প নিয়ে আর আলোচনা করছি না। আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে এ বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল পানি বা জল। এ পানি সৃষ্টি কি ভাবে হ'লো তার কোন সমাধান আমরা খুঁজে পাই না। তবে এ পানিই যে একমাত্র উপাদান যাকে ভিত্তি করে **'আরম্ভ প্রকল্প'** তৈরি হয়েছে ও বিশ্ব সৃষ্টিতে হাত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোন ভুল নেই। রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এটা সত্য। কেননা পানিকে রসায়ন বিজ্ঞানের মা বলা হয়। এছাড়া 'জলই জীবন' একথাও রসায়ন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। জলেই জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। জলের অভাবেই জীবন ধ্বংস হয়। জল দিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। সৃষ্টির আদিতেই ছিল এ জল। এর প্রমাণ দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি বলেছেন,

---

১। বাইলের - মথি-২৪-২৮-২৯।

২। বাইবেল-সখরিয় -১৪, ৬ হইতে ৮

৩। সহীহ বুখারী (তাজরীদ) তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। দ্বিতীয় খণ্ড সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০।

www.pathagar.com

"তোমরা কি দেখ না তিনি বারবার ব্যয় করিতেছেন আসমান ও জমিন সৃষ্টি অবধি এবং উহাতে কিছুমাত্র কমে নাই যাহা আছে তাঁহার হাতে। তাহার আরশ ছিল পানির উপরে, তাঁহার হাতে মানযন্ত্র (যে পাল্লা ইচ্ছা) নিচু করেন ও উঁচু করেন।"[১]

পানিকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে আছে দুভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন। এর ফরমুলা H_2O।

হাইড্রোজেনও অক্সিজেন যার সমন্বয়ে গঠিত পানি তা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এ-তত্ত্বও আমরা জানি না। তবে পদার্থের নিহীত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে আমরা শুধু পৃথক করে আন্‌তে পারি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পাথরের মধ্যে হইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) অথবা সালফিউরিক, এসিড (H_2SO_4) মিশ্রিত করলে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়। সোডিয়াম পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে পানি মিশ্রিত করলে সাধারণ উষ্ণতায়ই হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন করে।

যেমন —

$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$

সোডিয়াম + পানি = সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড + হাইড্রোজেন

অনুরূপভাবে পটাসিয়াম ক্লোরেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট, সালফিউরিক অক্সাইড প্রভৃতিকে উত্তপ্ত করলেও আমরা অক্সিজেন পাই।

$2KC1_3$	$= KC1$	$+3O_2$
পটাসিয়াম	পটাসিয়াম	অক্সিজেন
ক্লোরেট	ক্লোরাইড	

যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে পানি গঠিত হয় সে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে সৃষ্টি করা যায় না। এদের যৌগিক পদার্থ হতে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় মাত্র।

যে পানি দিয়ে আকাশ ভূবন সৃষ্টি, সে পানি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। এর ব্যবহার বিশুদ্ধকরণ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও গুণাগুন জানা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। রসায়নবিদগণ এ জন্যই পানির উপর এত গবেষণা করেছেন ও পানিকে সম্বল করে অর্থাৎ একে মূল উপাদান হিসাবে ধরে নিয়ে কোটি কোটি নূতন পদার্থের রূপ দিচ্ছেন।

পানিকে তাঁরা **'প্রকৃতির বিস্ময়'** বলে বর্ণনা করেছন। ইটালীর বৈজ্ঞানিক ও মহান শিল্পী **'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'** পানির অদ্ভুত গুণাগুণ বা শক্তি দেখে একে **'প্রকৃতির কোচওয়ান'** বলে অভিহিত করেছেন। আকাশ বাতাসে, ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে এ পানিরই খেলা। শিল্পে কারখানায়, জীবদেহে, প্রাণে ও নিষ্প্রাণে ও জলের ক্রিয়াই সাধিত হয়। যেখানে জল নেই সেখানে কাজ নেই, যেখানে কাজ নেই সেখানে রুজী নেই, যেখানে রুজী নেই সেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই।

যুগে যুগেই বিজ্ঞানীরা এ জলের উপর গবেষণা করেছেন। বর্ণহীন, স্বাদহীন এ জলকে পূর্বে অমিশ্র উপাদান বলেই তাঁরা জানতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন জলের মধ্যে অস্বাভাবিক জটিলতা খুঁজে পেলেন তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে ১৯৩৩ সনে **'Hard Water'** বা ভারি জলের অস্তিত্ব তাঁরা দেখলেন। তখন চেতনা হলো জল অমিশ্র উপাদান নয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আইসোটোপ এর সন্ধান হলো। দেখা গেল জলের গঠনে ৪২ প্রকারে

১। সহীহ বুখারী (তাজরীদুল) তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ, কোরআনের ব্যাখা পরিচ্ছেদ। ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৮।

www.pathagar.com

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিন্যাস সম্ভব। এর মধ্যে নয়টি বিন্যাস স্থায়ী যা জলের মধ্যে সব সময়ই বিরাজমান।

'বিজ্ঞান না কোরআন' –পুস্তকে জলের স্বাভাবিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের কিছুটা বর্ণনা দিয়েছি। এখানে উল্লেখযোগ্য আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া কিছুটা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি যা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জানা প্রয়োজন।

যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে জলকণা গঠিত হয় তা সুদৃঢ় পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ। অতি উচ্চ চাপেও জলকণার পরিবর্তন হয় না। যান্ত্রিক চাপ সহ্যকরার শক্তি এ জলের আছে তাপমাত্রা হ্রাস করলে জল সঙ্কুচিত হয়। ৪° সেন্টিগ্রেডে পৌছিলে কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়। উর্ধ্বচাপ জলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই উঁচু পর্বতে অথবা বৃক্ষ চূড়ায়ও জলকণা দেখা যায়। এমন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অন্য কোন তরল পদার্থের মাঝে নেই। জলের মধ্যে এ অপরূপ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ না দিলে পাহাড়ের বুকে তরুলতা জন্মাত না। আকাশে মেঘের সঞ্চার হতো না। ফলে ফুলে প্রানের স্পন্দন ঘট্ত না। জলেই থাকে বল। জলেই থাকে প্রাণের অস্তিত্ব। কোরআন ঠিকই বলেছে,

"এবং আল্লাহ্ সলিল দ্বারা সর্ববিধ জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন।"[১] (২৪ ঃ ৪৫)

সাগর, মহাসাগর, খাল-বিল ও নদী-নালার বুক থেকে প্রতি সেকেন্ডে সূর্য একশত কোটি টন জল বাষ্পে পরিণত করে। প্রতি গ্রাম জলে ৫৩৭ ক্যালরী তাপ নিহিত থাকে। এই তাপ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই জলকণা যে অসাধারণ শক্তি (Energy) সৃষ্টিকরে তা অন্য কোন বস্তু হতেই সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকেদের মতে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চার কোটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দরকার প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে যেখানে ১০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। অন্যান্য তরল পদার্থে (তরল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও প্যারাফিন) যে তাপশক্তি বাষ্পীয় ভবনের জন্য প্রয়োজন তার চেয়ে দশগুন বেশি প্রয়োজন জলে। জলের বাষ্পীয়ভবনের তাপমাত্রা যদি অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় হতো তা হলে পৃথিবীতে জল থাক্ত না। সাগর নদী সব শুকিয়ে যেত। জীবজন্তু ও তরু-লতার দেহ শুষ্ক কাঠের রূপ ধারণ করত। অন্যান্য তরল পদার্থ হতে এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু জলেই দেখা যায়। তাই জল উত্তপ্ত করতে প্রচুর সময় ও Energy -এর দরকার। জলে প্রচুর তাপশক্তি রয়েছে। জল যে তাপ সূর্যকিরণ হতে সংগ্রহ করে তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। এ জন্যই সমুদ্রগর্ভে উষ্ণস্রোত প্রবাহিত হয়। সমুদ্রগর্ভের এই উষ্ণতাই স্থলভাগের আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল কারণ। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এক কিউবিক মিটার জলের তাপ এক ডিগ্রী হ্রাস পেলে অর্থাৎ এক কিউবিক মিটার জলের তাপ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে তা দুহাজার কিউবিক মিটার বায়ুকে উত্তপ্ত করতে সক্ষম।

আকাশে যে বজ্রপাত ঘটে তার মূলেও এ জল। জল বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুতায়িত করে। একটি ইলেকট্রনের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রতম জলকণার Positive Charge দু-হাজার গুণ বেশি। কি অদ্ভুত এর শক্তি! কি অদ্ভুত এর বৈশিষ্ট্য। কি অদ্ভুদ এর ক্রিয়া! সত্যি, জল সৃষ্টির এ মহাবিস্ময়!

যে সব জল আমরা ব্যবহার করি তা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বিশুদ্ধ জল বলে কিছু নেই Distilled Water কে আমরা বিশুদ্ধ মনে ক'রে ঔষধপত্রের জন্য ব্যবহার করি কিন্তু সেটাকেও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলা চলে না। মিশ্র পদার্থ তার মধ্যেও কিছু কিছু থেকে যায়। বৈজ্ঞানিকরা অমিশ্র জলের সন্ধান ক'রে ব্যর্থ হয়েছেন।

১। কোরআন সূরা নূর। আয়াত ৪৫।

www.pathagar.com

নদী, কূপ, ইন্দারা প্রভৃতির জলের তুলনায় সমুদ্রের জলে মিশ্রণের পরিমান অনেক বেশি। এতে আছে ৪৪টি মৌলিক উপাদান। একে তরল ধাতু বললেও অত্যুক্তি হয় না। সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন কোবাল্ট, নিকেল, তামা দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সন্ধানও পাওয়া যায়। দ্রবীভূত অবস্থায় এসব ধাতু সমুদ্রে বিদ্যমান। পৃথিবীর সমগ্র সমুদ্রের জলে নাকি এক হাজার কোটি টন সোনা মিশ্রিত আছে। এটা ভাগ করলে মাথা পিছু প্রায় তিন টনের বেশি একজনের ভাগে পড়ে। আজ সমুদ্রগর্ভে জ্বালানী তৈল, পেট্রোল, গ্যাস প্রভৃতির সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশ সরকার শীঘ্রই সম্পদ আহরণ করবেন। লক্ষ লক্ষ জীবজন্তু ছাড়াও সমুদ্রে কি সম্পদই না লুকায়িত আছে! প্রবাল, মুক্তা, হীরা, জহরত প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুও যে জলের মধ্যে কত আছে তার হিসাব নেই। কোরআন এ সাক্ষ্য বহন করে।[১] (১৬ ঃ ১৪)

সূরা রহমান এ -তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে।[২] আমরা 'বিজ্ঞান না কোরআন' বইয়ের রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। উৎসুক পাঠকবৃন্দকে বইটি পড়তে অনুরোধ করছি।

জলের গুণ বিশ্লেষণ করা কঠিন। দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান এ জল। রোগ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ এ জল। জল বিদ্যুৎ, তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র, মিল ফ্যাক্টরী জল ছাড়া অচল। জলকে তাই Driving Agent বলা হয়। জল প্রাণের সৃষ্টি করে, প্রানকে রক্ষা করে। রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে। পুষ্টিসাধন ও পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করে। শুষ্ক পৃথিবীকে সজীবতা দান করে।[৩]

৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জল বরফে পরিণত হয়। এ বরফ-জলের গুণাগুণ আশ্চর্যজনক। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই বরফ-জল নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বরফ-জল শস্য উৎপাদনের জন্য অনেক বেশি উপকারী।

গমের বীজ তুষার জলে দেড়ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে একটি জমিতে বপন করে দেখতে পেয়েছেন যে অন্যজমি (যেখানে বীজ না ভিজিয়ে বপন করা হয়েছিল) তা অপেক্ষা ফলন দেড়গুণ বেশি হয়েছে। এ ছাড়া গমের বীজও বড় ও উৎকৃষ্ট ধরণের হয়েছে। তাঁরা আরও প্রমাণ করে দেখেছেন যে, তুষার জলে রোগ নিরাময়ের গুণ আছে। হৃদরোগ ও মেটাবলিজম রোগে তুষার জল উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট লোকের পক্ষে বরফ-জল মহাউপকারী। বৃষ্টির সময় অনেক সময় বরফ পড়ে। এ বরফগলা জলে পেটের বিভিন্ন প্রকার রোগের উপশম হতেও দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তুষার আজ গবেষণার বস্তু। তুষার জল কেন রোগ নিরাময়ের শ্রেষ্ঠতম ঔষধ এর পুরোপুরী ধারণা এখন পর্যন্ত তাঁরা

টীকা ঃ-১ । "এবং তিনি সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্বাধীন করিয়াছেন যেন তোমা উহা হইতে টাটকা মাছ ভক্ষণ কর এবং তন্মধ্য হইতে অলঙ্কার সমূহ আহরণ করিয়া তোমরা ইহা পরিধান কর।" সূরা নহল। আয়াত ১৪।

২ । "তিনি সমুদ্রদ্বয়কে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। তদুভয়ের মধ্যে অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পদে অসত্যারোপ করিবে। তদুভয়ের অভ্যন্তর হইতে মুক্তা ও প্রবাল সমূহ বহির্গত করা হয়।" (সূরা রহমান। আয়াত ১৯ হইতে ২২)

৩ । "তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তোমরা উহা ইহতে পান কর এবং উহা হইতেই তরুলতা, যাহাতে তোমরা চারণ কর। তিনি উহা দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য এবং জয়তুন ও খেজুর, আঙ্গুর ও প্রত্যেক ফল হইতে সমুদ্গত করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" (সূরা নহল। আয়াত ১০ ও ১১)।

www.pathagar.com

না পেলেও অনেকেই এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এ তুষার জলের মধ্যে Hard Water বা ভারি জলের স্বল্পতা হেতুই রোগ নিরাময় করে। অনেকে আবার মনে করেন যে এর প্রকৃত রহস্য এই যে এতে রয়েছে 'Icy crystal'।

এতদিন তাঁদের ধারণা ছিল যে জল যখন বরফে রূপান্তরিত হয় তখন জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায়; কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রমাণ ক'রে তাঁরা এখন এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বরফ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ করা দূরে থাক রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত দ্রুততর করে। এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কিছুটা রহস্য ও সমাধান তাঁদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠল।[১]

(১) "তুষার জলের মধ্যে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল কি?

(২) প্রাণের বিকাশের জন্য অতি নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়েছিল কি?

(৩) যে সব স্থানে জলের অস্তিত্ব রয়েছে শুধুমাত্র বরফের আকারে সে সব স্থানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি?

এর সমাধান তাঁরা পেলেন কুমেরু অঞ্চলের প্রাণীদের দেখে। সারা বছর যেখানে বরফ জমে থাকে, সূর্যের আলোক যেখানে পৌঁছে না সেখানে প্রাণের সন্ধান মেলে কি ক'রে? অথচ সব চাইতে বেশি মাছ কুমেরু অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে তুষারাবৃত স্থানের পরিমাণ কম নয়। প্রায় দক্ষিণ আমেরিকার মত বিরাট মহাদেশের সমান। কোন কোন স্থান এত বেশি তুষারাবৃত হয় যে এর উচ্চতা দঁড়ায় দু-হাজার মিটারেরও বেশি। এগুলি যদি এক সঙ্গে গলে জলে পরিণত হতো তার হ'লে সমুদ্র পৃষ্ঠ আরও ৪০-৫০ মিটার উঁচু হতো। কিন্ত তা হয় নি। বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে আল্লাহ্ তাঁ মহান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এসব অসম্ভবকে সম্ভব করে। শত শত মিটার পুরু তুষার পর্বতের নিচেও আবার এ জলেরই সন্ধান পাওয়া যায়–যে জলের আবার উষ্ণতা আছে, প্রবাহ আছ, লবণাক্ততাও আছে। কুমেরু সরোবরে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।[২] সৃষ্টির এ অদ্ভুত লীলা, বিস্ময়কর এ জলের অদ্ভুত ক্রিয়া, রাসায়নিক পরিবর্তনের এমন আশ্চর্য পদ্ধতি দেখলে এ জল সৃষ্টিকারী মহা রসায়নবিদ আল্লাহকে সেজদা দিতে কার না সাধ হয়?

মানুষের সংগ্রাম জলকে নিয়ে। মানুষের কৃতিত্ব এ জলের উপরই। অথচ মানুষ জানে না কিভাবে এ জলকে সৃষ্টি করা যায়। তার দেহে দৈনিক ০৫ মিটার জল তৈরি হচ্ছে। কে অলক্ষ্যে থেকে আমাদের দেহ অভ্যন্তরে এ জল সৃষ্টি করছে, আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করছে? জেব্রার মত জীবের দেহে এত বেশি পরিমাণ জল তৈরি হচ্ছে যে সারা জীবন জলপান না পারেও তার চলছে অথচ আমরা মানুষ, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আমাদের এক মুহূর্ত এ জল ছাড়া চলছে না। দেহে এ জলের অভাব হলেই বার্ধক্য আসে, মৃত্যুর জন্য দিন গুণতে থাকে।

জলই যে জীবন, জলই যে প্রাণ, জলেই যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে-এ কথা আমরা আল্লাহর বাণী ও রসুলের বাণীতে দেখেছি। বিজ্ঞানীরা এ বাণী গভীর ভাবে কোনদিন চিন্তা করেন না। আল্লাহর অস্তিত্বকে করেছে অবিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) নিরক্ষর নবী। অথচ এ নিরক্ষর নবী চোদ্দ শত বছর পূর্বে বলেছেন যে আরোগ্য তিন জিনিসে (১) মধুর সরবত, (২) আগুনের সেক আর (৩) 'জলজ কুসতি'। শরীর বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে

১। ভিরীমিন-প্রকৃতির বিস্ময় জল। সংগৃহীত ১২ নং উদয়ন পত্রিকা।

২। কুমেরুর ওয়ান্দা সরোবর সারাবছর তুষারে ঢাকা তাকে। অথচ এর ৬০ মিটার গভীর লেকের তলদেশে লবণাক্ত জলের এক স্তর আবিষ্কার হয়েছে যার তাপ মাত্রা ২৫ ডিগ্রী।

www.pathagar.com

এ নিয়ে আলোচনা করেছি। জল যে আরোগ্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ এ কথা আজ বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেছেন। দিন দিন তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে এ নবী যা কিছু বলেছেন সবই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে পরিপূর্ণ। সব বাণীর মধ্যেই আছে বৈজ্ঞানিক থিওরী। তাঁর বাণীগুলি বিশ্লেষণ করি ও দেখি কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারি কিনা।

হযরত (দঃ) বলেছেন,

"যে কোন পানীয়ে নেশা হয় উহা হারাম।"[১]

আমরা জল পান করি তৃষ্ণা নিরারণের জন্য, আরাম ও তৃপ্তির জন্য, হজম ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য, শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য এবং শরীরে রক্ত সঞ্চালনের জন্য। এ জল পান করা ক্ষতিকারক নয়। জল সুস্বাদু ও উপকারী, এতে নেশা হবার কথা না। শিরা, উপশিরা উত্তেজিত হবার কথা নয়। বরং শরীরের তাপ শোষণ করে স্নায়ুমণ্ডলীকে শীতল রাখার কথা। যে জল এর বিপরীত ক্রিয়া করে সে জল হযরতের (দঃ) মতে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। আমাদের রসায়নবিদ পণ্ডিতগণও তাঁর এ মতে একমত না হ'য়ে পারবেন না। কেননা নেশাযুক্ত পানীয় এর ব্যতিক্রম। পানির বিশুদ্ধতা ও ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বাণী গুরুত্বপূর্ণ।

"যে পানি তার স্বাভাবিক রং, গন্ধ ও স্বাদ-এ তিনটি গুণই হারিয়েছে সে পানি নিজে ব্যবহার করা বা কাউকে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।"[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ-

"পুকুর, নদী ও স্রোতের পানি স্বাভাবিক রং, গন্ধ ও স্বাদ–এই তিন গুণের কোন একটি নষ্ট হইলেই তা নাপাক (নিষিদ্ধ) হ'য়ে যায়।"[১]

উপরের বাণী দুটি সম্পূর্ণই বিজ্ঞান সম্মত। রসায়নবিদদের মতের সঙ্গে এ বাণীর সম্পূর্ণই মিল আছে। জলের রং তখনই নষ্ট হয় যখন এতে শেওলা, গাছ-গাছড়া বা আবর্জনা জমে পচে যায়। এ ছাড়া দ্রাব্য পদার্থ (Solute Substance) মিশ্রিত হয়। এগুলির মিশ্রণে জলের রং নষ্ট হয় এবং বিস্বাদগ্রস্থ হয়। এক কথায় বলা যায় ঐ জল তার স্বাভাবিক গুণ বা প্রকৃতিগত ধর্ম হারিয়েছে এবং অবিশুদ্ধ হ'য়েছে। এ জল পান করা বা অন্য কাজে ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। কেননা ও অবিশুদ্ধ জল হইতে ডাইরিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়।

জলকে বিশুদ্ধ করার যে সব প্রক্রিয়া রসায়ণ বিজ্ঞানে দেখান হয়েছে ফিলটার ও পাতন প্রক্রিয়া (Filtration and Distillation) তাদের মধ্যে অন্যতম। এতে ভাসমান ও অমিশ্র পদার্থগুলি দূরিভূত হয় এবং জল বিশুদ্ধ হয়। জলকে বিশুদ্ধ করণের এ প্রক্রিয়া হযরত জানতেন। এর সাক্ষ্য মেলে নিম্নের উদ্ধৃতি হ'তে। (জাবের-বিন আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত)

'একদা রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এক আনসারীর নিকট গেলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এক সাহাবী (আবুবকর রাঃ)। হযরত এ আনসারীকে বলিলেন,

'তোমার কাছে মোশকের বাসী পানি আছে কি? যদি থাকে তবে আন; নচেৎ আমরা বহমান পানি চুমক দিয়া পান করিব।' রাবি বলেন, ঐ ব্যক্তি তাহার বাগানে পানি দিতেছিল। সে বলিল, 'হে রসুলুল্লাহ। আমার কাছে রাত্রের বাসী পানি আছে। আপনি ঘরে যাইয়া বসুন। অতঃপর সে তাঁহাদের লইয়া গেল এবং এক পিয়ালা পানি ঢালিল। তারপর উহার উপর

১। সহীহ বুখারী–তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬৫।

২। আলমগীর (সংগৃহীত বেহেশতের কুঞ্জী পৃষ্ঠা ১১১)

১। দোরারোল মোখতার (সংগৃহীত মকছুদুল মোমেনিন by আলহাজ মওলানা গোলাম রহমান, পৃষ্ঠা ১১৫)।

www.pathagar.com

নিজের একটি বকরী দোহন করিল। তখন রসুলুল্লাহ্ (দঃ) উহা হইতে পান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীও পান করিলেন।"[২]

কূপ, ইন্দারা, নদী, পুকুর বা ঝরণার পানিতে দ্রাব্য ও অদ্রাব্য (Soluble and insoluble) পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এ পানি কলসী, কুজো বা মোশকে কয়েক ঘণ্টা রাখলে অদ্রাব্য পদার্থগুলি নিচে জমা হয় অর্থাৎ পানিকে ফিল্টার ও পাতন করে শুদ্ধ করা হয়। এরূপ বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এ তত্ত্বও মেলে নিম্নের উদ্ধৃতি হ'তে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন,

"পান পাত্র সম্পূর্ণ উপুড় করিয়া পান করিও না।"[৩] হযরতের এরূপ মূল্যবান বাণী ধরে আমরা জলের সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়া দেখে নিচ্ছি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) 'পানি পাত্রে নিঃশ্বাসের ফেলতে বা ফুক দিতে নিষেধ করেছেন।[১]

আমাদের নিঃশ্বাস সঙ্গে বা ফুঁকের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গত হয়। এ কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলের সঙ্গে মিশে কার্বনিক -এসিড তৈরি করে। নিম্নে Reaction হ'তে তা বুঝা যায়।

$H_2O + CO_2 = H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড)

জল + কার্বন-ডাই অক্সাইড।

কার্বনিক এসিড অম্লধর্মী (acid)। পাকস্থলীর জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এটা Carbonate ও Bi-carbonate তৈরি করতে পারে।[২]

এছাড়া অন্যান্য পানপাত্রে বিভিন্ন ধরনের দ্রাব্য (Soluble Substance) পদার্থ থাকে। এদের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণে যে সব বস্তুর সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে অনেকগুলি বিষের ক্রিয়াও করা স্বাভাবিক। যেমন যদি কোন পদার্থের সঙ্গে এটা মিশে কার্বন-মনোক্সাইড বা এমুনিয়াম সায়ানাইড সৃষ্টি করে তবে তা পান করার সঙ্গে সঙ্গেই পানকারী মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হযতের (দঃ) এ মহাবাণী অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন রসায়নবিদ পণ্ডিতই এ বাণীর গূঢ়তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারবেন না। 'উম্মি রসুল, অর্থাৎ নিরক্ষর নবী বলে যিনি আখ্যায়িত তিনি কি করে রসায়ন বিজ্ঞানে এমন সুপণ্ডিত হয়েছিলেন আমরা সে তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে ব্যর্থ। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ আমি মনে প্রাণে তাঁর সেই বাণীকেই বিশ্বাস করি।

"আল্লাহ্ আমার অন্তরে তার অনুগ্রহের জ্যোতি নিক্ষেপ করিলেন। আমি স্বীয় অন্তরে এর অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম এবং **নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব অবগত হইলাম।**"[১]

জলের উপর আমরা আলোচনা করছিলাম। এর উপর আরও কিছু আলোচনা দরকার। যে জল আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

---

২ -৩। সহীহ বুখারী তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা ৩৬০ ও ৩৬২ এবং শায়খান (সংগৃহীত হাদিসের আলো, মুহাম্মদ আজাহার উদ্দিন এম. এ. পৃষ্ঠা ১২৩।

১। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা; সংগৃহীত হাদিসের আলো, পৃঃ ১২৩। ২য় মোঃ আজাহার উদ্দিন এম. এ.

২ Inorganic Chemistry = BY LADLI MOHON. "Although Carbonic Acid is unstable, the saltish forms are quite stable. Being a di-basic acid it is capable of forming two series of salts (a) Carbonates, (b) Bi-carbonates.

১। মিশকাত [সংগৃহীত কোরআনের তর্জমা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম ও আলী হাসান। ৩০ পারা। পৃষ্ঠা ১৯২০]।

www.pathagar.com

কতকগুলি পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, কতকগুলি অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বৃষ্টির জল, ঝরণার জল, নদীর জল, সমুদ্রের জল ইত্যাদিতে এসব দ্রবীভূত পদার্থ দেখা যায়। এ জন্যই ব্যবহার করার পূর্বে এর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার। সমুদ্রের জল ছাড়া অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক জল আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি। সমুদ্রের জলে শতকরা ৩.৫ ভাগ ধাতব লবণ থাকে। এর মধ্যে শতকরা ২.৭ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে বলে লবণাক্ত ও বিষাদ হয়। তাই এ জল কাপড় কাঁচা বা পান করার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। প্রাকৃতিক পানির মধ্যে বৃষ্টির পানিই উদ্ভিদ ও তরুলতার প্রাণ। এ পানি না হলে তরুলতার জন্ম হ'তো না। এজন্যই আমাদের বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) একে কল্যাণকর পানি বলে অভিহিত করেছেন। এ তত্ত্ব মেলে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী হতে। তিনি বলেছেন,

"হে আল্লাহ! আমাদের উপর কল্যাণকর পানি বর্ষণ কর।"[২] বৃষ্টির পানি কেন কল্যাণকর, রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা আমরা বিচার করছি।

আকাশের মুক্ত নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এমুনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড প্রভৃতি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে ভূমির উপর পতিত হয়। মাটির উপাদান ও পানির সাথে মিশে নাইট্রেট, সালফেট, ফস্‌ফেট প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান সারের সৃষ্টি করে, যা তরুলতা ও উদ্ভিদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর ও ফলপ্রদ। এ জন্যই আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই যে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যখন বৃষ্টি হয় তখন মাটির অভ্যন্তরে যেসব বীজ কণা লুপ্ত ও সুপ্ত অস্থায় থাকে তা সজীব ও সতেজ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় অথচ পুকুর, নদী, খাল-বিল বা কূপের পানি দিয়ে সে লুপ্ত বীজকণাকে জাগ্রত করা যায় না। বৃষ্টির পানিতে বীজকণা যে খাদ্য প্রাণ পায় এসব পানিতে তা পায় না।

মেঘে মেঘে সংঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ কণার সৃষ্টি হয় তা সংকেত ধ্বনি বা ধ্বংস ধ্বনি নয়। লক্ষ যোজন মাইল ব্যাপী তা প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং আকাশে নাইট্রিক ক্ষরণ করে। ফলে বিচ্ছিন্ন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণা একত্রিত হ'য়ে পানির সৃষ্টি করে। এ পানিই বয়ে নিয়ে আসে জীবজন্তু ও তরুলতার প্রাণ। এ জন্যই আমি **'ধরায় কি শান্ত?'** –কবিতার শেষ দু'টি চরণে লিখেছিলাম,

[ঝংকার–কবিতা পুস্তকে]
বাষ্পাকারে উঠিয়া জল
মেঘের কোলে হয় যে শীতল
ভূমির প্রাণে জোয়ার আনে
লক্ষ জীবের আগন্ত।
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত?
মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ
বিদ্যুত কণা হয় যে ক্ষরণ
লুপ্ত প্রাণে জীবন দানে
ভরে তুলে দিক্-দিগন্ত
আমি জানি না ধরায় কি শান্ত? **[লেখক]**

বৃষ্টির জল যে সত্য সত্যই কল্যাণকর এ বিষয়ে রসায়নবিদদের দ্বিমতের আর কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ্-পাক রসায়নবিদদের জ্ঞানদান করতে সে জন্যই প্রত্যক্ষভাবে বলেছেন,

---

২ বুখারী শরীফ ৭ম খণ্ড–পনি পরিচ্ছদ।

www.pathagar.com

"তোমরা জানিয়া রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছি যেন তোমরা উপলব্ধি কর।"[১]

"তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে আল্লাহ্ আকাশ হইতে সলিল অবতীর্ণ করেন। পরে আমি তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফল উৎপাদন করি।"[২]

"তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। তোমরা উহা হইতে পান কর এবং উহা হইতেই তরুলতা যাহাতে তোমরা পশু চারণ কর। তিনি উহা দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য এবং জয়তুন ও খেজুর ও আঙুর ও প্রত্যেক ফল হইতে সমুদ্গত করেন নিশ্চই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"[৩]

"এবং আমি আকাশ হইতে কল্যাণবর্ধক বারি বর্ষণ করি। তৎপর আমি তদ্বারা উদ্যান ও কর্তনযোগ্য শস্য সমুৎপন্ন করি। এবং সমুচ্চ খর্জুর বৃক্ষ সমূহ যাহার শ্বাস সমূহ স্তরে স্তরে রহিয়াছে দাসগণের উপজীবিকার জন্য। এবং আমি তদ্বারা মৃত প্রায় নগরীকে জীবিত করিয়াছি। এর রূপেই পুনরুত্থান।"[১] (৫০ ঃ ৯ - ১১)

পানিকে কিরূপে বিশুদ্ধ করতে হয়, কোন প্রকার পানির কি গুণাগুণ হযরতের (দঃ) বাণী হ'তে আমরা কিছুটা জ্ঞানলাভ করলাম। এরূপ আরও দু-একটি বাণী ধরে আমরা আলোচনা করছি। তিনি নিষেধ করে বলেছেন, 'মোশক উল্টাতে' এবং বলেছেন,–'কেহ পান করিবে না মোশকেরমুখ হইতে।'

মোশকের উল্টাতে তিনি কেন নিষেধ করছেন এর ব্যাখ্যা পূর্বে দিয়েছি। অদ্রবীভূত পদার্থ যেমন বালি, কাঁকর, কার্বনেট, সালফেট, আয়রন প্রভৃতি নিচে জমা হয়। মোশক, কলসী বা কোন পাত্রে যেখানে পানি সঞ্চিত রাখা হয় তার নিচের দিকে তলানী পড়ে। সে সব তলানীর ময়লা পেটে শুধু হজম ক্রিয়ারই ব্যাঘাত জন্মায় না বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ মোশকের উপরের অংশ হ'তে পান করাও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। এর কারণ দুটি। প্রথমতঃ অদ্রবণীয় ভাসমান পদার্থগুলি উপরে ভেসে থাকে। এছাড় মোশক বা কলসীতে পানি রাখলে কিছু সময় পর দেখা যায় যে এর উপরের দিকে তৈলাক্ত পদার্থ ভেসে আছে। পানির অভ্যন্তরে গ্যাসীয় পদার্থ যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বনিক অ্যাসিড প্রভৃতি উপরের অংশে ভেসে উঠে। এ জন্যই রসায়নবিদগণ পানি (Filtration ও Distillation) এর পর উপর ও নিচের অংশ বাদ দিয়ে মধ্যের অংশটুকু পান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ বিশুদ্ধ পানি পান করারই নির্দেশ। রসুলের (দঃ) বাণীতেও আমরা ঠিক সেই নির্দেশই দেখতে পাই। এ নির্দেশ সম্পূর্ণ বিধিসম্মত ও বিজ্ঞান সম্মত।

চলুন আমরা মহারাসায়নিক হযরতের (দঃ) নির্দেশ ও সাবধান মূলক বাণী সংগ্রহ করি ও পরীক্ষা করে এর সারবত্তা প্রমাণ করি। তিনি বলেছেন, "যখন মাছি পড়ে তেমাদের কাহারো পানীয়ে সে যেন ডুবায় উহাকে। তারপর বাহির করিয়া ফেলে। কেননা উহার এক ডানায় থাকে রোগ অপর ডানায় আরোগ্য।"[২]

এমন রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব শরীর বিজ্ঞানী ও রসায়ন বিজ্ঞানী ভাইয়েরা জান্‌লেও আমরা

---

১ । কোরআন সূরা হদিদ্‌য়াত –১৭ (৫৭ ঃ ১৭)

২ । ঐ " ফাতের " ২৭ এর অংশ (৩৫ ঃ ২৭)

৩ । ঐ " নহল " ১০৩ ১১ (১৬ ঃ ১০ - ১১)

১। কোরআন সূরা ক্বাফ আয়াত ৯ হতে ১১।

২ । সহীহ বুখারী। ২য় খণ্ড, সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২০৫ ও ২য় অংশ (তজরীদুল বুখারী) তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৩৮৫ হাঃ নং ৫০ / ২২১ ও ২২ /৭৯৬।

www.pathagar.com

জানতাম না। এর উপর কোন পরীক্ষা হ'য়েছে বলেও শুনি নি মাছির এক পাখায় বিষ আর অন্য পাখায় আরোগ্যের ঔষধ আছে এ কথা বললে হয়ত কেউ বিশ্বাস করবে না। কেননা সবাই জানে মাছি মল-মূত্রের উপর অথবা যক্ষ্মা, কলেরা, আমাশয়, ডাইরিয়া, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতির উপর বসে দু-পাখা ভর্তি করে রোগ জীবাণু বহন করে আনে আর তা সুন্দরভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয় আমাদেরই খাদ্যবস্তুতে। এজন্য মাছিকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ শত্র বলে থাকি। এই মাছিই যে আবার আরোগ্যের উপাদান বয়ে নিয়ে আসে এবং প্লেগ রুগীর মত সর্বনেশে মড়ার হাত থেকে রক্ষা করে তা চিন্তা করলে অবাক হ'তে হয়। আর মহান সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত লীলা দেখে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে তাঁকে সেজদা দিতে ইচ্ছা হয়।

উৎসুক রসায়নবিদ ভাইয়েরা, ল্যাবরেটরীতে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন– মাছির বাম পাখায় থাকে বিষ আর ডান পাখায় থাকে বিষ নাশক ঔষধ' (নিজস্ব মতবাদ)। বিষের মধ্যে বিষ নাষক ঔষধ পড়লে সে বিষের ক্রিয়া থাকে না। এজন্যই হযরত (দঃ) মাছিকে পানীয় দ্রব্যের উপর পড়লে তা ডুবাতে বলেছেন অন্যথায় সে পানীয় ফেলে দিতে বলেছেন। যে 'Neutralization' পদ্ধতি শিক্ষা করে আমরা রসায়নবিদ হাজার হাজার ঔষধ তৈরি করি ও গর্ব অনুভব করি সে পদ্ধতি হযরত (দঃ) শিখিয়েছেন চোদ্দশ বছর পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে। আৎকে উঠ্‌বার কথা নয়। চম'কে যাবার কথা নয়। ঈর্ষারও কথা নয়। রসায়ন বিজ্ঞান শিখ্‌তে হ'লে আসুন বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদের (দঃ) এরূপ বাণী আরও খুঁজে বের করি ও রসায়ন বিজ্ঞানের মাধ্যমে নূতন রূপে নূতন আবিষ্কার করি।

হযরত (দঃ) বলেছেন, **'সিরকা যেমন মধুর গুণকে নষ্ট করে মানুষের কুস্বভাবও তেমনি পুণ্য রাশিকে সমূলে ধ্বংস করে।"**[১]

'সিরকা মধুর গুণকে নষ্ট করে– কথাটির মধ্যে রসায়নবিদদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার উপকরণ আছে এবং বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু আছে। সিরকা এবং মধু সম্পূর্ণই বিপরীত ধর্মী। সিরকা অম্লধর্মী আর মধু মিষ্টিধর্মী। একটি Acidic অন্যটি Aldehide group এর। অম্ল ও মিষ্টদ্রব্য একত্র করলে অম্লের গুণ অথবা মিষ্টির গুণ কোনটিই থাকে না। নূতন স্বাদ বিশিষ্ট এক বস্তু সৃষ্টি হয় যা অম্ল ও মিষ্টি হতে পৃথক। মধুর সুমিষ্ট স্বাদ ও বহু গুণ যেমন এ নূতন সৃষ্ট বস্তুতে থাকে না তেমনি অম্লের মুখরোচক স্বাদ বা উপকার অপকারের কোন গুণও এতে থাকে না। এবারে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রমাণে দেখি মধু এ সিরকার সংমিশ্রণে কিভাবে তার নিজস্ব গুণ হারিয়ে ফেলে।

সিরকার মধ্যে থাকে	মধুর মধ্যে থাকে
Acetic Acid with 20% water	Glucose + Fructose
Formula-CH_3 COOH	Formula-$C_6H_{12}O_6$
Group-Acid	Group-Aldehide

Chemical Reaction: When Acetic acid is mixed with Honey hydroxil group $(OH)^+$ from honey, which causes sweetness is seperated.

১। সংগৃহীত কিমিয়া য়ে সা'আদত ইমাম গাজ্জালী। ক্রোধ পচ্ছিেদ ৩য় খণ্ড -২২১ পৃষ্ঠা ও সৌভাগ্যের পরশমণি প্রথম খণ্ড-২৪৪ পৃষ্ঠ।

www.pathagar.com

মধু থেকে (OH) $^{+}$ group পৃথক হবার ফলে মধু তার মিষ্টতা হারিয়ে ফেলে।

Acid -এর সঙ্গে Aldehide -এর Reaction ও তার ফলাফল হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কি ক'রে শিখেছেন, কোথায়, কোন ইউনিভারসিটির ল্যাবরেটরীতে তিনি সবার অগোচরে এ তত্ত্বমূলক থিওরী প্রমাণ করেছেন সে খবর আমরা জানি না। তবে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দিনে আজ হযরতের (দঃ) এ থিওরীকে অস্বীকার করতে পারছি না। তাঁর এ মহাবাণী অমর ও অক্ষয় হ'য়ে চিরদিন রসায়নবিদদের নিকট বিশ্লেষণের বাণী হ'য়েই থাকবে। চলুন দেখি এরূপ মূল্যবাণ বাণী আরও পাওয়া যায় কিনা।

হুযাইফা (রাঃ) সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

"নবী (সঃ) আমাদের নিষেধ করিয়াছেন সোনা ও রূপার পাত্রে পান করিতে বা খাইতে এবং রেশম ও গরদ পরিতে বা উহার উপর বসিতে।"[১]

হযরত অন্যত্র বলেছেন,

"যে ব্যক্তি পানি পান করে রূপার পাত্রে সেত ঢালিতেছে পেটে দোজখের আগুন।"[২]

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন ঃ

"নবী (সঃ) নিষেধ করিয়াছেন **মিশ্রিত করিতে পাকা, ডাঁসা খেজুরের পানি বা খেজুর ও মুনাক্কার পানি কিন্তু প্রত্যেকটি ভিজান যাইতে পারে পৃথক ভাবে।"**[৩]

রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করবার মত হযরতের (দঃ) এরূপ অজস্র মূল্যবান বাণী আমরা দেখতে পাই। এসব গুরুত্বপূর্ণ বাণীর বিশ্লেষণ দিতে হ'লে প্রয়োজন অশেষ ধৈর্য, গবেষণাগার, বিশ্বাস ও গভীর জ্ঞান। এসব গুণ আমার নেই। তাই আমি অনুরোধ করছি আমার প্রিয় অধ্যাপক ও বিপ্লবী তরুণ ছাত্র ভাইদের। গবেষণাগারে গিয়ে দেখুন সোনা ও রূপার সঙ্গে সঙ্গে পানীয় দ্রব্যের অথবা অন্যান্য আহার্য বস্তুর Reaction কি? পানি, দুধ, মধু, ফলের রস, সরবত (চিনি, গুড়, মিছরী, লেবুর রস), মদ, সোডার পানি, লেমনেড, তাড়ি ইত্যাদি সোনা বা রূপার সঙ্গে মিশে এদের নিজস্ব গুণ হারায় কিনা। অনুরূপভাবে খেজুর ও মুনাক্কার পানি একত্রিত করলে কি action হয়, Reaction -এ একটি অপরটির গুণ নষ্ট করে কিনা অথবা বিষাক্ত কোন বস্তুতে পরিণত হয় কিনা, দেখে হযরতের (দঃ) এ বাণীগুলির সারবত্ব প্রমাণ করুন।

যে মহাবাণী হাতে নিয়ে হযরত (দঃ) এ বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন, যে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মোচন ক'রে বিশ্ব মণীষীদের চলার পথ সুগম করলেন, যে মহাবিজ্ঞানের সূত্র ধ'রে বিজ্ঞানীদের নব চেতনা দিলেন সেই মহাগ্রন্থ, সেই সমুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা কোরআন থেকে সামান্য কয়েকটি মাত্র বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি। আশা করি রসায়নবিদ ভাইয়েরা বাণীগুলি ভক্তিভরে হাতে নেবেন এবং সেখান থেকে নুতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে কল্যাণের পথে এ মূঢ় মানব সমাজের হাতে তুলে দেবেন।

"এবং সিনাই পাহাড়ের মধ্য হইতে এমন এক বৃক্ষ সৃজন করিয়াছি তাহা হইতে তের উৎপন্ন হয়। এবং ভক্ষনকারীদের জন্য সুস্বাদু তরকারীও প্রস্তুত হয়।"[১]

---

১ -৩। সহীহ বুখারী (তজরীদুল বুখারী)। তর্জমা আব্দুর রহমান খাঁ ২য় খণ্ড।

১ ও ৪। কোরআন সূরা মোমেনূন। আয়াত ২০ ও ১২ হতে ১৪। ২৩ নং সূরা

www.pathagar.com

"আল্লাহই আসমান ও জমিনের আলো (নূর)। তাঁহার জ্যোতির তুলনা এই যে যেমন একটি কাঁচ তাহার মধ্যে একটি বাতি, বাতিটি কাঁচে ঘেরা; এ কাঁচ যে একটি উজ্জ্বল তারকা যাহা উজ্জ্বল করা হইয়াছে **মঙ্গলময় 'যয়তুন' তেল দিয়া তাহা না পূর্বদেশীয় না পশ্চিম দেশীয়**। তাহার তেল এমনি উজ্জ্বল যে আগুণ স্পর্শ করিবার পূর্বেই যেন জ্বলিয়া উঠে। আলোর উপর আলো। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন নিজের জ্যোতির দিকে পথ দেখাইয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা সকল উপস্থিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয় অবগত আছেন।"[২]

"এবং তিনিই বাতাসকে নিজ দয়ায় (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদ বাহক হিসাবে পাঠাইয়াছেন এবং **আমিই আকাশ হইতে পবিত্র পানি বর্ষণ করিতেছি।**"[৩]

"এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে নির্বাচিত মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর আমি তাহাকে এক সুরক্ষিত স্থানে শুক্রবিন্দুরূপে সংস্থাপন করিয়াছি। অনন্তর শুক্রবিন্দুকে আমি ঘনীভূত শোণিত করিয়াছি। তৎপর ঘনীভূত শোণিতকে মাংসপিণ্ড করিয়াছি। তৎপরে মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ করিয়াছি। তৎপর অস্থিপুঞ্জকে মাংসমণ্ডিত করিয়াছি। অবশেষে আমি উহাকে চরম সৃষ্টি পরিণত করিয়া দিয়াছি। অতএব ধন্য সেই আল্লাহ্ যিনি শ্রেষ্টতম সৃষ্টিকর্তা।"[৪]

"এবং আমি আকাশ হ'তে পরিমিত বারি বর্ষণ করি, তৎপর আমি উহাকে ভূতলে স্থির রাখি। এবং আমি উহাকে অপসারিত করিতেও শক্তিমাণ।"[৫] (২৩ ঃ ১৮)

"এবং নিশ্চয় পালিত পশুকুলের মধ্যেও তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আমি তোমাদিগকে উহার উদরে যাহা আছে তা হইতে পান করাই এবং **তোমাদের জন্য উহাতে প্রচুর সুফল রহিয়াছে;** এবং ইহা হইতেই তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।"[১] (২৩ ঃ ২১)

"অতএব তোমরা কি শুক্রবিন্দু সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছ? তবে কি তোমরাই উহা সৃষ্টি করিয়াছ অথবা আমিই সৃজনকারী। আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি এবং আমি উহাতে অসমর্থ নহি যে **আমি তোমাদিগকে তোমাদেরই অনুরূপ পরিবর্তীত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এরূপভাবে গঠন করিব যাহা তোমরা অবগত নহ।**"[২]

(৫৬ ঃ ৫৮ -৬১)

"এবং তিনিই বায়ুরাশিকে স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বে উহার সুসংবাদ স্বরূপ প্রেরণ করেন; এমনকি যখন তাহা সুবৃহৎ মেঘমালা উত্তোলন করে তখন আমি উহাকে মৃত প্রদেশে পরিচালিত করি। পরে উহা হইতে বারিধারা অবতরণ করিয়া থাকি। অনন্তর আমি উহা দ্বারা সর্ব প্রকার ফল উদ্গত করি যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।"[৩] (৭ ঃ ৫৭)

"এবং তোমার প্রতিপালক মধু মক্ষিকাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে পর্বতমালায় ও বৃক্ষসমূহে এবং সমুচ্চ শিখরে মধুচক্র নির্মাণ কর; অতঃপর সর্ববিদ ফল হইতে ভক্ষণ কর এবং তৎপর স্বীয় প্রতিপালকের পথসমূহে পরিভ্রমণ কর; **উহাদের উদর হইতে বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট পানীয় নির্গত হইয়া থাকে**–তন্মধ্যে **মানব মণ্ডলীর জন্য উপশান্তি রহিয়াছে।**"[৪]

(১৬ ঃ ৬৮ - ৬৯)

(আমার 'বিজ্ঞান না কোরআন' পুস্তকে মধুর গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উৎসাহী পাঠকবৃন্দ তা দেখতে পারেন এবং মধুর উপর গবেষণা ক'রে আরও প্রকৃষ্টতম আরোগ্যের পথ নির্দেশ করতে পারেন।)

---

২ । ঐ নূর " ৩৫ রুকু ৫ নং সূরা।

৩ -৪ । ঐ ফোরকান " ৪৮। ২৫ নং সূরা।

৫ । কোরআন সূরা মোমেনুন-আয়তা ১৮ ও ২১।

১ । কোরআন সূরা মোমেনুন–আয়াত ১৮ ও ২১।

২ । ঐ " অওয়াকেয়া আয়াত ৫৮ হইতে ৬১।

৩ । ঐ " আরাফ " ৫৭।

৪ । ঐ " নহল। আয়াত ৬৮, ৬৯।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

"অতঃপর আমি তাহাদের পরে তোমাদিগকে ভূতলে প্রতিনিধি করিয়াছি –কারণ আমি দেখিব যে তোমরা কিরূপে কার্য কর।" (আল্ কোরআন। সূরা ইউনুস।)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দুনিয়ার বুকে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তার তুলনা বিরল। একজন এতিম বালক সারা বিশ্বে এমনিভাবে প্রভূত্ব কায়েম করে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র গঠন করবেন কেউ তা কল্পনাও করতে পারে নি। পশ্চিমের হিস্পানী থেকে পূর্বের হিন্দুকুশ পর্যন্ত এ রাষ্ট্র ছিল বিস্তৃত। আর মাত্র বার বছরের মধ্যেই এতবড় একটি রাষ্ট্রের পত্তন করে এর নিরাপত্তা, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে এক চিরস্থায়ী ইতিহাস রচনা করেন কেউ কি তা ভাবতে পেরেছে? যে শাসন ব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আজ পৃথিবীর সর্বত্রই তা সমাদৃত ও উচ্চ প্রশংসিত হবে সভ্যজাতি মাত্রই আঁকড়িয়ে ধরছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ধরতে বাধ্য হবে। নবী পয়গম্বরগণ সমাজের মাঝে আসেন মানুষকে ধর্মের পথ দেখাতে। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনের কঠিন দায়িত্ব হতে প্রায়ই তাঁদের দূরে থাকতে দেখা গেছে। হযরত আদম (আঃ), হযরত ইয়াহিয়া, হযরত হারুন, হযরত শোয়েব, হযরত জ্যাকোব, হযরত হুদ ও হযরত ঈসা (আঃ), প্রভৃতি নবী কেউ রাজ্যাধিপতি ছিলেন না। যাঁরা রাজত্ব পেয়েছিলেন, যেমন হযরত ইব্রাহিম, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান, হযরত আয়ুব, হযরত মুসা তাঁরাও হযরত মুহাম্মদের (দঃ) মত অমর ও অক্ষয় কীর্তি রেখে আইন প্রণয়ন ও রাজত্ব সগৌরবে টিকিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি আজীবনের জন্য দিতে পারেন নি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তা দিয়েছেন এবং নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করেছেন–

"হে আমার উম্মতগণ! আমি যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না।" (বিদায় হজ্জ)

এ মহাবিজ্ঞানীর রাষ্ট্রসীমা কতটুকু পর্যন্ত বর্ধিত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে কিনা সে ঘোষণাও তিনি করেছেন এই বলে–"অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যগুলি তোমাদের কবলে আসিবে এবং তাহার শাসনকর্তাগণ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকিবে, পরহেজগারী অবলম্বন করিবে এবং আমানত রক্ষা করিবে তাহারা অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে।[১]

রাষ্ট্র ও ধর্ম একসঙ্গে কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। আলেকজাণ্ডার, নেপেলিয়ান, হানিবল, পিটার, আকবর শুধু দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু অসভ্য সমাজকে দীক্ষা দিয়ে ইহ-পরকালের জন্য সুশিক্ষিত করে তুলতে পারেন নি। বিশ্বব্যাপী এমন খ্যাতি অর্জনও তারা করতে সমর্থ হন নি। যে রাজত্ব তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালের মহাচক্রে তা বিলীন হয়ে গেছে এবং যাবে কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (দঃ) রাষ্ট্র ও ধর্ম বিলীন হওয়াত দূরের কথা দিন দিন তা শুধু প্রসার লাভই করছে এবং করবে। আর করবে বলেই এর পরিচালনার দায়িত্ব যুগ-যুগেই ন্যস্ত করা হয়েছে ওলি, গাউস, কুতুব, ফকির, ও জ্ঞানী, গুণী, শাসকদের উপর যারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ আল্লাহর নিকট হতে সনদ পেয়ে আসছেন। মুসলিম খলিফাবৃন্দ হতে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ আজও ইসলামের বিজয় কেতন উড়াচ্ছেন এবং নিজেদের কৃষ্টি সভ্যতা বজায় রাখবার প্রয়াস পাচ্ছেন। যখন বিভিন্ন দেশের শাসকগণ একমনা হয়ে একই নীতি অনুসরণ করে চলবে তখনি হবে বিশ্বের বুকে

টীকা ঃ ১ –হাদিস। সংগৃহীত কিমিয়ায়ে সা-আদত। ব্যবহার খণ্ড। পৃষ্ঠা ২৮৭।

www.pathagar.com

ইসলামর একচ্ছত্র আধিপত্য। আমরা অদূর ভবিষ্যতে এ দিনগুলি অবশ্যই আশা করব এবং হযরতের এ গৌরব মাহাত্ম্যের বাণী ঘরে ঘরে পৌছিয়ে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর সত্যতা প্রমাণ করব।

"ধরাপৃষ্টে কোন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু বাকি থাকিবে না যেখানে আল্লাহ পরাক্রমশালীদের পরাক্রম অথবা দুর্বলদের দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামের বাণী পৌছিবে না।"[১]

ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যে একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন এ উপলব্ধি কেবলমাত্র মহানবীই করেছিলেন। তিনি জানতেন–বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের আচার ব্যবহার কৃষ্টি সভ্যতা ও জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি যেখানে পৃথক সেখানে সুদক্ষশাসক ও ধারাল অস্ত্রের প্রয়োজন। এ জন্যই তিনি সাহাবী, জ্ঞানী, গুণী, যোদ্ধা ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মুসলমানদের নিয়ে এক সুসজ্জিত দল গঠন করেন। আরবের এক নিরীহ অতি ভদ্র, সত্যবাদী বালক অতি শৈশব থেকেই যেন এ কল্পনা করে আসছিলেন যে বর্বর, অশিক্ষিত, অত্যাচারী জালেম সম্প্রদায়কে সীমাবদ্ধ জালে বেষ্টিত করেই শিক্ষা দিতে হবে, মানুষ করতে হবে। প্রয়োজন বোধে এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে শক্তিহীন করতে হবে, সাজা দিতে হবে–কারারুদ্ধ করতে হবে। বনের পাখি 'তোতাকে' খাচায় পুরে যেমন বুলি শেখানো হয় তেমনি অবাধ্য ও হিংসুক সমাজকে রাষ্ট্রীয় বিধানের আওতায় এনে ধর্ম কর্ম ও নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তাই রাষ্ট্র গঠন প্রয়োজন, অতি প্রয়োজন।

তিনশ তের জন বীর মুজাহিদ নিয়ে তাঁর অভিযান হলো শুরু। একাধারে অভিজ্ঞ ও সমর সজ্জায় সুসজ্জিত আরবের খ্যাতনামা বীরদল, অন্যদিকে বালক, বৃদ্ধ এ বিতাড়িত ৩১৩ জন আনসার। সত্যের বীর মুজাহিদ, ধর্মের আলোক প্রাপ্ত বিশ্বনবীর আশীর্বাদপুষ্ট ও ক্ষুদ্রদল মহাশক্তিশালী যোদ্ধাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিশ্বের বুকে অভূতপূর্ব ইতিহাস রচনা করলেন বিশ্বাসী অনুচরদের জন্য যে স্বতন্ত্র একটি আবাস ভূমির ভিত্তি দিয়ে তৌহিদের ঝাণ্ডা উড়ালেন তার নাম হলো 'হেজাজ'–আর এর অধিপতি হলেন রাজার রাজা, মানবকুল শিরোমণি, বিশ্ববিজয়ী বীর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

বদর যুদ্ধ ঐতিহাসিকদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে, আজও দিচ্ছে এবং চিরদিনই দেবে। কেননা এর ঐতিহাসিক পটভূমি যেমন সুন্দর তেমনি চমকপ্রদ। অলক্ষ্যে থেকে কোন্ মহাশক্তি যেন এ দুর্বল দলকে দুর্বার শক্তি জুগিয়ে দিল রণকৌশল শিখিয়ে জোয়ারের পাগলাগতি এদের মনের মাঝে তুলে দিল, আর ঝংকারের সুরে কর্ণকুহরে এ অভয়বাণী শুনিয়ে দিল।

"আল্লাহর আদেশে অনেক সময় ক্ষুদ্রদল বৃহৎদলের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছে।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না হয়ে, বিজয়ী বীর না হয়ে জন্ম নিয়ে শুধু ধর্মপ্রচারক রূপে যদি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাব হতো তবে কি এ বিশাল মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ কায়েম হতো? বিশ্বের বুকে এমন সফলতা আসত? কোরেশ, বেদুইন, পৌত্তলিক, পারসিক মাথা নত করে ইসলাম কবুল করত? আরবের বুক থেকে অনাচার, অবিচার, হিংসা বিদ্বেষের শিকড় উৎপাটিত হতো? কাবার ঘর থেকে কি অশোরা মূর্তি তিরোহিত হয়ে বিশ্ব উপাসনালয় রূপে সম্মানিত হতো? হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) সত্য সনাতম ধর্ম কি পূর্ণরূপ লাভ করত? না কিছুতেই না। **ধর্ম ছাড়া রাজ্য যেমন অচল, রাজ্যছাড়া ধর্মও তেমন পঙ্গু।**

হযরত জীবনে শুধু একটি মাত্র যুদ্ধ করেই রাষ্ট্রস্থাপন করেননি। স্বল্পপরিসর জীবনের মাঝে তাঁকে ৮৩ টি যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং ২৭টি যুদ্ধে তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মাঝেই সুন্দর ও সাবলীল ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতির মর্যদা কি, তাঁর দায়িত্ব কি, প্রজার সঙ্গে সম্পর্ক কি, কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা

---

১ –হাদিস –মিশকাত।

www.pathagar.com

শান্তির পক্ষে অনুকুল তিনি নিজ জীবন দিয়েই তা আমাদের শিখিয়েছেন। একথা কারোই বলবার অবকাশ নেই যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পয়গম্বর ছিলেন তাই রাজ্য ও রাজার তত্ত্ব কি করে জানবেন? রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কোন উচ্চতম ডিগ্রী না নিয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শাসন ব্যবস্থা তিনি কি ভাবে দিতে পারেন? অবাক হবার কথাই বটে। এমন ইতিহাস কোন জ্ঞানী বিজ্ঞানী বা কোন মহাপুরুষই রচনা করতে পারেন নি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে (সমাজবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান) আলোচনা করার পূর্বেও আমাদের ঠিক এমনি একটি ধারণাই হয়েছিল। পরে দেখলাম তিনি যা কিছু দিয়েছেন তার অতি সামান্যটুকু আমরা সংগ্রহ করে হতবাক হয়ে পড়েছি।

পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানি না, তার সঙ্গে কথা বলতে পারি না–রসায়ন বিজ্ঞানী হয়ে ভাঙ্গাগড়া ও সৃষ্টিরহস্যের কোন তত্ত্বই উদ্ঘাটন করতে পারি না–শরীর বিজ্ঞানী হয়ে জন্মমৃত্যু, আত্মা ও মনের সন্ধান নিতে পারি না–সমাজ বিজ্ঞানী হয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে নিয়ে এক সুষম ছায়াতলে আনতে পারি না, অথচ স্কুলে কলেজের কোন বিদ্যা শিক্ষা না করে একজন মানুষ আকাশ পাতালের সন্ধান দিলেন, জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করলেন, সৃষ্টিরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন। করলেন না কি? এমনি কি জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা তাঁর নামে পাগল? এমনি কি ঐতিহাসিকগন লিখতে বাধ্য হয়–

"ইতিহাসের একটি অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে মুহাম্মদ (দঃ) একাধারে তিনটির স্থাপয়িতা–একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।"[১]

"উদ্দেশ্যের মহত্ব, উপায় উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা যদি এই তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয় তা হলে ইতিহাসের অন্য কোন মহামানবকে এনে মুহাম্মদের (দঃ) সাথে তুলনা করবে এমন সাহস কার আছে?"[২]

শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসাবে তাঁর তুলনা নেই। আইনের মাপকাঠিতে তাঁর নিকট সবাই ছিল সমান। তাই হযরত আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ব্যাপারে শ্যালিকা হাসনাকে যেমন ক্ষমা করতে পারেন নি তেমনি আবুজেন্দাল ও ওৎবাকেও হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী ধরে রাখতে পারেন নি। ন্যায় বিচারক বলতে দুনিয়ার বুকে শুধু একটি মানুষের নাম যদি ইতিহাস ধরে রাখতে চায় তবে সে নাম হযরত মুহাম্মদ (দঃ) -এর। তাঁর মহাবাণীও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

"কে ন্যায় বিচার করিবে যদি খোদা ও তাঁহার রসুল না করেন?"[৩]

"মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে নিশ্চয়ই তাহার হাত কাটা যাইবে।"[৪]

শাসক হিসাবে এ ধরার বুকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রাচীন যুগের রাজতন্ত্রের কবর দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের জন্ম দিলেন। রাষ্ট্র পৈত্রিক কোন সম্পত্তি নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে এর ধারক হবারও কোন হেতু নেই। তাই নিজ কন্যা ফাতিমা অথবা জামাতা আলীর হাতেও মৃত্যুর পূর্বে তা তুলে দেন নি বরং উপদেশ দিলেন উৎকৃষ্ট লোকদের নেতা নির্বাচন করতে। শাসক হয়ে তিনি ঐশ্বর্যের স্রোতে ডুবে যান নি। আবার ফকিরের বেশে নিজকে নিমজ্জিত করেন নি। সাধারণ মানুষের মাঝেই অতি সাধারণ ভাবেই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নিজ হাতেই বিচার করতেন। দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য জ্ঞানী গুণীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও তার চোখ এড়ায় নি।

---

১ -Muhommed & Mohammedanism-by Padri Bosworth Smith.

২ – pearls from the Holy prophet. Page No. 110-111 by Alfred de Lamartine.

৩ –সহীহ বুখারী, তর্জমা–আঃ রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ২৫১।

৪ –তিরমিজি

www.pathagar.com

যাকাত প্রথার প্রচলন করে ধনীদের যেমন দানে উদ্বুদ্ধ করলেন তেমনি দরিদ্র জনসাধারণের বাঁচার এক নতুন পথ আবিষ্কার করলেন। এ প্রথা মেনে চললে মুসলমান কোনদিন দরিদ্র থাকত না। সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা মুসলিম তথা সমগ্র জাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। কে তাঁর এ আশীর্বাদ কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে ধন্য হয়! বায়তুল মাল জনসাধারণের সম্পত্তি, রাষ্ট্রে নয়, এমন করুণা ও কঠোর বাণী শুধু তাঁর মুখেই প্রথম জানা গেছে।

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রের লোক বাস করে। নাগরিক হিসাবে সবার অধিকার সমান। ধর্ম কর্মে তারা স্বাধীন। বিচারের কাঠগড়ায় একই তাদের আসন-এ জ্ঞানদান করলেন সর্বযুগের সর্বকালের রাষ্ট্র নেতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। প্রত্যেকের ধন-সম্পদ ও রক্ত প্রত্যেকের নিকট পবিত্র এ ঘোষণা করে তিনি হিংসাবিদ্বেষ ও ভেদাভেদ তুলে দিলেন। সাদাকাল, আরব অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, মর্যাদা শুধু তারই বেশি যে ব্যক্তি অধিক জ্ঞানী, বিশ্বাসী ও পরহেজগার। প্রভু -ভৃত্য, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, নারী-পুরুষ সবাই এ রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টিতে ছিল সমান। দাসত্ব প্রথার বিলোপ, এতিমের প্রতি সহানুভূতি, বয়ঃজ্যেষ্ঠেরে প্রতি সম্মান, জ্ঞানীর পতি শ্রদ্ধা, নারীর মর্যাদা ও হকদারের হক দিয়ে বিশ্বের বুকে তিনি যে রেকর্ড করে গেছেন তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন ন্যায় পরায়ণ, সুশাসক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ধরার বুকে ইতিপূর্বে জনমলাভ করেন নি। তাঁর মহামূল্যবান উপদেশ যা অপার শান্তি ও সুখ আনয়ন করতে পারে তার কিছুটা এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন কি, রাষ্ট্রপতির কর্তব্য কি, জনসাধারণ ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ মহান রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশিত পথ ধরেই চলুন আমরা আলোচনায় অগ্রসর হই।

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়ক

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার বাধ্য হয় সে আল্লাহর বাধ্য হয় এবং যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহরও অবাধ্য হয়। যে ব্যক্তি শাসনকর্তার বাধ্য হয় সে আমার বাধ্য হয় এবং যে তাঁহার বাধ্য হয় সে আমার বাধ্য হয়।"[১]

হযরতের এ গুরুত্বপূর্ণ বাণী হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ, রসুল ও দেশের শাসনকর্তা মানবজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাউকে বাদ দিয়ে বা দূরে রেখে যদি কোন মানুষ বাঁচতে চায় বা প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায় তবে সে অত্যাচারী, নয়তো স্বৈরাচারী অথবা নির্বোধ অবিশ্বাসকারী। মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যুগে যুগে যেমন পয়গম্বরদের পাঠিয়ে থাকেন তেমনি তাঁর বান্দাদের সুখ দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা দিয়ে রাজা-বাদশা বা শাসনকর্তা নির্বাচন করে থাকেন্ এ শাসনকর্তাগণ আল্লাহরই প্রতিনিধি। আল্লাহই তাদের মনোনীত করেন। আল্লাহই আবার তাঁদের পদচ্যুত করেন। মহাসম্মানের অধিকারী করে যেমন তাঁদের সিংহাসন দান করেন তেমনি মহা অসম্মানিত করেও তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করেন। বাদশাকে ফকির ও ফকিরকে বাদশা করে বিরাট একটি রাষ্ট্রের অধিপতি করে দিতে পারেন। এ একক ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বসাম্রাজ্যের মহান অধিপতি আল্লাহ্ যিনি তাঁর মহাবাণীতে এ কথা ঘোষণা করে আমাদের মত মূঢ় মানবকে সচেতন করে দিয়েছেন ঃ-

"তুমি বল–হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ। তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্বদান কর এবং যাহার নিকট

টীকা ঃ ১ –সহীহ বুখারী।

১–কোরআন। সূরা আল এমরান।

www.pathagar.com

হইতে ইচ্ছা রাজত্ব প্রতিগ্রহণ কর এং যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর। তোমারই হস্তে কল্যাণ, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।" [১]

যুগ যুগের জন্য আল্লাহর এ পবিত্র বাণী প্রযোজ্য। ইতিহাস আলোচনা করলে এর প্রমাণ মেলে, আদ-সমুদ, কারুণ, ফেরাউন, সাদ্দাদ, নমরুদ, যারা এক সময় ধন-ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার বাহাদুরীতে নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছিল এবং নিজেরাই সর্বময় হন্তাকর্তা বলে দাবী করেছিল তারাও কালের আবর্তে চরম মার খেয়ে ধুলার সঙ্গে মিশে গেছে। সম্মানের উচ্চতম শিখরে যেমন আরোহণ করেছিল তেমনি নিকৃষ্টতম মর্যাদায় তারা চিহ্নিত হতে বাধ্য হয়েছিল। প্রাচীন রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যগুলির কিভাবে পতন ঘটল এবং তাদের বিপুল ঐশ্বর্য কিভাবে ধুলিস্বাৎ হয়ে গেল তা জানবার হয়ত কারোই বাকি নেই। গৌরবান্বিত ও মহাপ্রতাপশালী ইহুদী নরপতিগণ মুষ্টিমেয় মুসলিমের হাতে কেমন মার খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন, কিভাবেই বা হযরতের খলিফাবৃন্দের হাতে সে সব সাম্রাজ্য হস্তগত হলো এ ইতিহাস দুনিয়ার প্রতিটি জাতিই জানে। অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা যখন সীমা অতিক্রম করে, শাসক যখন দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, শাসিতের করুণ আর্তনাদে যখন আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয় তখন এ মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে তাদের শোচনীয় পতন ঘটে। বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। নাদির, তৈমুর, চেঙ্গিস, হিটলার মুসোলিনী, নেপোলিয়ান, পিটার, আলেকজান্ডার এ সব দিগ্বিজয়ী বীর সেনানীরাও আজ টিকে নেই। ধনবল, জনবল, বাহুবল ও রাজত্ব হারিয়ে কে কোথায় কি অবস্থায় সময় কাটাচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে? এ বিশ্ব সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ। যিনি এ বিশ্বের রক্ষক, মহাশাসক ও নির্বাচক। যখন যাকে ইচ্ছে করেন তখন তাঁকেই নির্বাচন ক'রে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের বা রাষ্ট্রের অধিপতি করেন। আবার যাকে ইচ্ছে করেন পদচ্যুত করে অসম্মানিত করেন সর্বময় ক্ষমতা ও নির্বাচন শুধু তাঁরই হাতে।

এখন আমরা আলোচনা করব রাষ্ট্র বা রাজত্ব কি? এর শাসনকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব কি? তাঁর মর্যাদা কতটুকু?

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, যেখানে জনসমষ্টি স্থায়ীভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে মুক্ত হয়ে একটি সংগঠিত সরকার বা শাসনকর্তার অধীনে নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটল বলেছেন–

(১) "কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য।"

(২) প্রেসিডেন্ট উইলসন এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ-

"কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত একটি জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।"

(৩) অধ্যাপক গার্ণার বলেছেন ঃ-

"রাষ্ট্র এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে–যাহারা বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সংগঠিত সরকার রহিয়াছে এবং যাহার প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে।"

রাষ্ট্র সম্বন্ধে তা হলে আমাদের ধারণা হলো এই ঃ- (১) রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান যার ভৌগোলিক সীমারেখা আছে।

(২) এখানে জনসমষ্টি আছে যারা এই প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী।

(৩) অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য একটি স্বাধীন সরকার আছে।

www.pathagar.com

ভৌগোলিক সীমা ঃ- যে কোন রাষ্ট্রের যে কোন পরিমাণ ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতে পারে। ভৌগোলিক সীমারেখা বা আয়তনের উপর রাষ্টের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে না। বৃটেনের মত ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রের অধীনে কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপমহাদেশই যে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। শোনা গেছে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। বসবাসের জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট ঘর বা বাড়ির প্রয়োজন তেমনি একটি দেশের জন-সাধারণের জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। ভূ-খণ্ড বিহীন জনসাধারণকেই যাযাবর বলে। ইহুদীরা পূর্বে এরূপ ভূ-খণ্ড বিহীন হয়ে বিভিন্ন স্থানে বাস করত। এখন তারা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে এবং ইসরাইল রাষ্ট্র স্থাপন করে তা সম্প্রসারণের মনোবৃত্তি নিয়ে অন্যের অধিকারে হানা দিচ্ছে। ভু-খণ্ড না থাকলে শাসক থাকে না। শাসক না থাকলে শাসন থাকে না। শাসন না থাকলে ধর্ম থাকে না। স্বৈরাচারের লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

জনসমষ্টি ঃ জনসমষ্টি একটি রাষ্ট্রের প্রাণ। যে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশি সে রাষ্ট্রই শক্তিশালী। জনসংখ্যা ছাড়া রাষ্ট্রের কোন মূল্য নেই। যে দেশের জনসংখ্যা কম সে রাষ্ট্র দুর্বল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। জনসংখ্যাকেই এজন্য রাষ্ট্রের মূল চাবিকাঠি বলা হয়। জনশূন্য রাষ্ট্র শূন্য মরুভূমি তুল্য। অনেক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সীমারেখা অত্যন্ত বেশি কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় নিষ্প্রাণ ও অনুন্নত হয়। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি যেমন লিবিয়া, সিরিয়া, নাইজেরিয়া, কুয়েত, আবুধাবী, ইরান এর উদাহরণ। বিদেশ থেকে মানুষ ধার করে দেশের সম্পদ ও ইজ্জত বৃদ্ধি করতে হয়। আবার চীন, ভারত, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যা কোটি কোটি। তাই সবার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কোন্ রাষ্ট্রের কত জনসংখ্যা থাকবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কয়েক লক্ষ লোক নিয়েও একটি রাষ্ট্র হতে পারে।

সরকার ঃ রাষ্ট্রের জন্য ভূ-খণ্ড ও জনসমষ্টি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন একটি সরকার। এ সরকারই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। জনসমষ্টির সুখ, দুঃখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য সরকার যেমন দায়ী তেমনি এর সার্বভৌমত্ব ও ভূ-খণ্ডের নিরাপত্তার জন্যও দায়ী। সরকারের মাধ্যমেই জনসমষ্টির ইচ্ছা ও অনিচ্ছা প্রাকাশিত হয় এবং তাদের জন্য আইন প্রণীত হয়। সরকার একটি রাষ্ট্রের মুখপাত্র। রাষ্ট্রকে দেহ মনে করলে সরকার সারা রাষ্ট্রের পরিচালক। সমস্ত জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় কিন্তু সরকার গঠিত হয় মুষ্টিমেয় লোকদের নিয়ে যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্র স্থায়ী কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল।

সার্বভৌমিকতা (Sovereignty):- একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চরম ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলা হয়। অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান, তা পালন করতে বাধ্যকরার ক্ষমতা, বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার চরম শক্তিই সার্বভৌমিকতা। ভূ-খণ্ড, জনসমষ্টি ও সরকার থাকলেই রাষ্ট্র হয় না। সার্বভৌম ক্ষমতা এর অপরিহার্য অঙ্গ। বৃটিশ শাসিত ভারত একটি ভূ-খণ্ড ছিল। এর জনসমষ্টি ও সরকারও ছিল কিন্তু ছিল না সার্বভৌমত্ব। এ জনই একে রাষ্ট্র বলা হতো না। এটা অন্যশক্তি দ্বারা অর্থাৎ বৃটিশ সরকার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সনের পর ভারত দু'ভাগ হয়ে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র যথা পাকিস্তান ও ভারতে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে একটি রাষ্ট্র ছিল। পৃথক পৃথক ভাবে কোনটিকেই রাষ্ট্র বলা হতো না। কেননা দুটো প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন সরকার, জনসমষ্টি ও ভূ-খণ্ড থাকলেও সামগ্রিকভাবে দুটো প্রদেশ নিয়ন্ত্রিত হতো কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা। ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে, পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

সবার মনেই এ প্রশ্ন জাগে যে রাষ্ট্রের কিভাবে উৎপত্তি হলো। এ প্রশ্নটি বড় জটিল। কোন সময় কিভাবে এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে তা কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সঠিকভাবে বলতে পারেন নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের যে সব মতবাদ আমরা পেয়েছি তা সত্য না হলেও ভুল বলা যায় না। সব মতবাদের আলোচনা এ জন্য তুলে ধরছি।

(১) আল্লাহর সৃষ্টিমূলক মতবাদ (The Theory of Divine Origin) ঃ ধর্মীয় চিন্তাবিদ মাত্রই এ মতবাদে বিশ্বাসী। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ মতবাদ চলে আসছে এবং হয়ত চিরদিনই চলবে। তাঁদের মতে রাষ্ট্র আল্লাহরই সৃষ্টি। আর রাষ্ট্রের কর্ণধার রাজা-বাদশা, প্রেসিডেন্ট আল্লাহরই প্রতিনিধি। তাঁর আদেশ পালন করার অর্থ আল্লাহর আদেশ পালন করা। আর তাঁর অবাধ্য হবার অর্থ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তিরা মহাপাপী। রাজা-বাদশাগণ জনসাধারণের নিকট তাঁদের কার্যের জন্য দায়ী নন। তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী।

প্রাচীন কালে রাজা-বাদশাগণ এ মতবাদে গভীর ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ মাত্রেই এ কথার উল্লেখ আছে যে, সৃষ্টিকর্তা রাজাকে মনোনীত করেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁর অপসারণ হয়। ইহুদীরাও মতবাদ জোরে সোরেই প্রচার করতেন। কেননা 'বাইবেলের' - Old Testament-এ এ ধারণা স্পষ্টতঃই মেলে। সেখানে বলা হয়েছে-"ঈশ্বর রাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। দৈবের ইঙ্গিতে রাজার মৃত্যু হইয়াছে।"

"সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত শাসন করিবেন, তিনি আপন রাজাকে বল দিবেন। আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির শৃঙ্গ উন্নত করিবেন।"[১]

"কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার, আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে।"[২]

ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস (James I) এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই (Louis xiv)-এ মতবাদে পরম বিশ্বাস করে জনগণের উপর চরম কর্তৃত্ব করে গেছেন।

হিন্দু শাস্ত্রেও এ মতবাদের উল্লেখ আছে বলে জানা যায়, তবে গ্রীক ও রোমানগণ এ মতবাদ সমর্থন করেন নি। সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম এ মত সমর্থন করে কিনা তা পরে আলোচনা করব। এর পূর্বে এ মতবাদের উপর কিছুটা সমালোচনা করা যাক।

যেহেতু এ মতবাদে চূড়ান্ত ক্ষমতা একজন মাত্র ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় যিনি জগগণের নিকট তাঁর কাজের হিসাব দিতে নারাজ, সেহেতু এ মতবাদ অনেকের নিকট বিপদজনক বলে আখ্যায়িত। স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাঁরা এ মতবাদ প্রচার করে জনগণের উপর অত্যাচারের বহু নির্মম ইতিহাস রচনা করেছেন। কথিত আছে যে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলতেন-"আমিই রাষ্ট্র'। হিটলার, মুসোলিন, নাদির, তৈমুর, হালকু খাঁ, চেঙ্গিশ খাঁ, বখত নসর, ইয়াজিদ-এরাও ব্যতিক্রম নন। তাই এ মতবাদ অনেকের মতেই অনাচারের সহায়ক।

এ মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী। কেননা গণতন্ত্রে দেশের জনসাধারণই সর্বক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা নির্বাচনের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করতে পারে এবং সরকার গঠন করে দেশ শাসনের ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করতে পারে। সরকারের উত্থান ও পতন সম্পূর্ণই জনগণের উপর নির্ভরশীল। রাজা বিধাতার মনোনীত-এ কথা বর্তমান কালের জনসাধারণ মানতে চায় না।

অনেকের মতে রাষ্ট্র মানুষের তৈরি। এটা বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হয়। তাই বিধাতা এর

টীকা ঃ ১ -পবিত্র বাইবেল- Old Testament শমুয়েল ১০ নং পদ।

২ -এ যাত্রাপুস্তক ১৯/৬।

www.pathagar.com

পরিচালনা নিজ হাতে করেন না। জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে একনিষ্ঠভাবে একটি রাজ্য একমাত্র ব্যক্তি তার জীবনব্যাপী পরিচালনা করবে, আধুনিক জগৎ তা স্বীকার করে না।

বর্তমান বিশ্ব যদিও বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ স্বৈরাচারী নীতির জন্য গ্রহণ করে না তবুও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার পক্ষে এ মতবাদ যথেষ্ট সহায়ক হয়। কেননা কম-বেশি হলেও মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে মনে-প্রানে বিশ্বাস করে সেই সৃষ্টিকর্তার Representative বা মনোনীত ব্যক্তিই শাসক বা রাষ্ট্রপতি এ কথা যখন হৃদয় থেকে কেউ বিশ্বাস করে তখন তাঁর আদেশ ও নির্দেশ পালন না করে পারে না। সামাজিক শৃঙ্খলা, হিংসা, বিদ্বেষ, জুলুম, অত্যাচার তাই মন থেকে তিরোহিত হয় এবং রাজ আদেশের প্রতি বিশ্বাস আসে। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) বল প্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force) ঃ কথায় বলে "জোর যার মুলুক তার"। কথাটি প্রবাদ বলেও যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ধনবল, জনবল, বাহুবল ও বুদ্ধিবল এ চারটিই হলো জোরের উৎস। গরীবের উপর ধনীর প্রাধান্য, অসহায়ের উপর সহায়শীল ব্যক্তির অত্যাচার, আর দুর্বলের উপর সবলের নির্যাতন চিরদিনই আমরা দেখে থাকি। শুধু আজকের সমাজেই নয়–প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে ধনীরা গরীবের ঘরবাড়ি, জমিজমা, আসবাবপত্র একে একে গ্রাস করতে থাকে। বাঙলার জমিদার পরিবার ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যার পরিবারের লোক সংখ্যা বেশি, সে কথায় কথায় অন্যের সঙ্গে, যার প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই–ঝগড়া করে সম্পত্তি দখল করে নেয়। গায়ের জোরে কত দুর্বৃত্তরা যে দুর্বলের সম্পত্তি কেড়ে নেয় তার হিসাব দেওয়া কঠিন।

এই বলপ্রয়োগ মতবাদ থেকেই যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এ কথাও অস্বীকার করবার নয়। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হানিবল, পিটার, তাঁদের অসাধারণ বল ছিল বলেই বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের মধ্যে সবারই যে ধনবল, জনবল ও বাহুবল ছিল তা নয়। বুদ্ধির বলেও অনেকে বল অর্জন করেছে এবং নতুন রাষ্ট্রের পত্তন দিয়েছে। নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনী, আকবর এর দৃষ্টান্ত। বল দিয়ে শুধু যে রাজ্য জয় করা যায় তা নয়। শক্তির মাধ্যমেই রাজ্যকে টিকিয়ে রাখা হয় এবং পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই এ জন্য যুদ্ধ সামগ্রী মজুত রাখে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যোদ্ধা তৈরি করে পদাতিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও আকাশ বাহিনী দ্বারা এ শক্তি সঞ্চিত হয়।

বল প্রয়োগ মতবাদের উপর যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে এবং হবে। এর স্বপক্ষে অনেক চিন্তাশীল লেখক ও দার্শনিক মত প্রকাশ করেছেন। ইটালীর লেখক ম্যাকিয়েভেলী, ইংরেজ দার্শনিক হিউম এবং বর্তমান সময়ের জেরেমী টেলর এ মতেরই সমর্থক। আবার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গ্রীন বলেন– 'Will, not force, is the basis of the state.' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্মতি –বল নয়।"

(৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social contract Theory) ঃ-এতে বলা হয় যে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্রের পত্তন হয়। প্রাচীনকালে যখন লোকসংখ্যা কম ছিল তখন যার যেখানে ইচ্ছে–যেভাবে ইচ্ছে–কাল যাপন করত। সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন আছে বলে তাদের জানাও ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যেই তারা বাস করত। প্রকৃতিই তাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেড়ে চলল। কেউ কারো অধীনে থাকতে রাজি নয়। কারো গণ্ডীতে অন্য কেউ আধিপত্য বিস্তার করবে এটাও হয়ে পড়ল অসহ্য। তাই সমাজে সমাজে চুক্তি বিনিময় হলো। পারস্পরিক গণ্ডিতে কেউ আঘাত হান্‌বে না। কারো শাসনের উপর কেউ ব্যাঘাত ঘটাবে না। এই সামাজিক চুক্তির ফলেই জন্ম নিলো এক একটি রাষ্ট্র। প্রকৃতি রাজ্য হলো খণ্ড খণ্ড।

এ মতবাদের সমর্থন মেলে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ রইস ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের চিন্তাবিদ রুশোর লেখায়। এ মতবাদের উপর পরবর্তী সময়ে ভীষণভাবে সমালোচনা হয়। স্যার হেনরী এ মতবাদকে অসার বলে আখ্যায়িত করেন। গ্রীনের মতে এটা উপন্যাস তুল্য আর বেন্থামের মতে **'প্রমোদ ধ্বনি'**।

www.pathagar.com

ইসলামী মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ব্যবস্থার উপর আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) যে সব মূল্যবান বাণী আমরা দেখতে পাই তা হতে একটা সিদ্ধান্ত করে এর সমাধান করব।

এ বিশ্ব সাম্রাজ্যের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি তাঁর ইচ্ছেতেই আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের জন্য জ্বীন, ইনসান ও ফেরেস্তাদের নিযুক্ত রেখেছেন। প্রত্যেককে এক একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর অধিকারী কার্যভার ও বণ্টন করেছেন। চারজন প্রধান ফেরেস্তাকে যেমন আজরাইল, জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিলকে যথাক্রমে মৃত্যু, সংবাদ বাহক, মেঘ পরিচালক ও ধ্বংসলীলার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তেমনি বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন শাসক বা প্রতিনিধি নিযুক্ত ক'রে একটি সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তিনি কায়েম করেছেন, কোরআন এর সাক্ষ্য বহন করে।

"এবং তাহাদিগকে তাহাদের নবী বলিয়াছিল–নিশ্চয় আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।"[১]

কেউ ইচ্ছে করে এ ভূখণ্ডগুলো যেমন সরিয়ে নিতে পারে না তেমনি নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী আল্লাহর এ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাইরেও রাজত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। চ্যালেঞ্জ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেনঃ-

"হে মানব ও জ্বীন সম্প্রদায়। যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা ঐ আধিপত্য অতিক্রম করিতে পারিবে না।"[২] (৫৫ ঃ ৩৩)

এ আধিপত্য যে শুধু তাঁরই, তিনিই যে একচ্ছত্র মালিক সে কথাও ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণীতে।

'লিল্লাহে মা ফি সামাওয়াতে ওয়াল আরদ।'[৩] (২ ঃ ২৮৪)

অর্থাৎ 'আকাশ ও জমিনের অভ্যন্তরে যা কিছু তার সবই আল্লাহর।'

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ-

"ওয়া লিল্লাহে মিরাছো সামাওয়াতে ওয়াল আরদ।"[৪]

অর্থাৎ "এবং আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী।"

আল্লাহর ইচ্ছেতেই যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও যাকে দ্বারা ইচ্ছে এর শাসনকার্য পরিচালনা করা হয় তার কিছুটা বিবরণ প্রথমেই উদ্ধৃত আল এমরানের কয়েকটি আয়াত থেকে দেখিয়াছি। নিম্নের বাণীটি আরও প্রত্যক্ষ ভাবে এর প্রমাণ দেয়।

"ওয়াল্লাহ ইউতি মূলকাহু মাইয়াশায়ো।"[৫] (২ঃ ২৪৭)

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করেন।'

এছাড়া কোরআনের বহুস্থানে এরূপ বাণী দেখা যায়। যেমনঃ-

"এবং তোমার প্রতিপালক মহা সম্পদশালী করুনাময়–যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদিগকে অপসৃত করিবেন এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের পরে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিবেন–যেরূপ ভাবে তিনি অপর সম্প্রদায়ের বংশধর হইতে তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন।"[৬]

---

১ –কোরআন সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৭।

২ –কোরআন সূরা রহমান, আয়াত-৩৩

৩ –কোরআন সূরা বাকারা। আয়াত -২৮৪।

৪– কোরআন সূরা আল এমরান।

৫ –কোরআন সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৭।

৬ –কোরআন সূরা আনআম, আয়াত,–১৩০

www.pathagar.com

"তুমি কি তাহার প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্রাহিমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়াছিল যেহেতু আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন?"[৭] (২ ঃ ২৫৮)

"এবং এভাবে আমি মিশরে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম।" (১২ ঃ ৫৬)

"এবং সেদিনের কথা স্মরণ কর। নূহের জাতির পরে যখন তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলাম।" (৭ ঃ ৬৮)

উপরে উদ্ধৃত বাণীসমূহ চিন্তা করে আমার 'আল্লাহর সৃষ্টিমূলক' মতবাদকে স্বীকার করতে বাধ্য। তবে কোন অসিলায় বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় তা বিচার করলে বল প্রয়োগ নীতিকে মানতেই হয়। কেননা বল প্রয়োগ ছাড়া কেউ কারো অধিকারকে হরণ করতে পারে না। একজন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার রাজত্ব দখল করতে হলেই বলপ্রয়োগ অপিরহার্য।

অতি স্বাভাবিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে যেমন একটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তেমনি অস্বাভাবিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায়ও এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

সমবৈশিষ্ট্য ও সমউৎপাদনের মাধ্যমে যেমন রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং নতুন বস্তুর সৃষ্টি করে তেমনি একটি স্থানের জনসমষ্টি নৈতিক চরিত্র, মানসিক পরিবেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সমন্বয়ে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলার রাষ্ট্র। এর উদ্দেশ্য হয় মহৎ ও ভিত্তিমূল হয় শক্ত। কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ ও লোভের বশে অন্যের অধিকারে আঘাত দিয়ে বল প্রয়োগের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রের পত্তন হয় তা অনিয়মতান্ত্রিক ও ভঙ্গুর।

ইসলাম অনিমতান্ত্রিক পন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই। কাঁরো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নীতিতে ইসলাম বিশ্বাসী নয়। তবে ধর্মের খাতিরে, নিজেদের মান ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে টিকিয়ে রাখতে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যুদ্ধকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়।

"তোমাদের উপর সংগ্রাম বিধিবদ্ধ হইল এবং **ইহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর**। এবং তোমরা যে বিষয়ে প্রীতিকর মনে কর সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর। এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নহ।" (সূরা বকারাহ, আয়াত ২১৬)

"অনন্তর আল্লাহর ইচ্ছায় তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল এবং দাউদ **'জালুতকে'**[১]

---

৭ –কোরআন সূরা বাকারাহ আয়াত,২৫৮।

টীকা ঃ ১ –তালুত ঃ- তালা হতে নিষ্পন্ন। এর প্রকৃত অর্থ উচ্চ। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁর শারীরিক আকৃতি অনেক দীর্ঘ ছিল বলেই তিনি 'তালুত' উপাধি পেয়েছিলেন। বাইবেলে ইনি 'শোল' নামে পরিচিত। শমুয়েল পরিচ্ছেদে ১-১২ এবং ২১–১৭ লাইনে তার ঘটনার উল্লেখ আছে।

হযরত শমুয়েল 'তালুতকে' ইসরাইলদের অধিপতি মনোনতি করেছিলেন কিন্তু ইসরাইলগণ তাঁকে স্বীকার করে নিতে পারে নি পরে হযরত শমুয়েল ইসরাইলদের হযরত মূসার নিদর্শন সম্বলিত সিন্দুক প্রাপ্তির সুসংবাদ দান করলে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। সূরা বাকারাহ ২৪৮ নং আয়াতে এ সিন্দুকের উল্লেখ আছে।

"এবং তাহাদিগকে তাহাদের নবী বলিয়াছিল, তাহার আধিপত্যের নিদর্শন এই যে তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক উপনীত হইবে, যাহার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে শান্তি এবং অন্যন্যা বিষয় যাহা মুসার সম্প্রদায় ও হারুনের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ফেরেশতাগণ উহা বহন করিয়া আনিবেন। বাইবেলও বলা হয়েছে ঃ- পরে যখন সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হইল তখন সমস্ত ইস্রাইল এমন মহা সিংহনিনাদ করিয়া উঠিল যে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। (১শমুয়েল ৪-১১)। এ সিন্দুক সম্বন্ধে বাইবেল বিস্তারিত আলোচনা আছে।

www.pathagar.com

নিহত করিয়াছিল এবং আল্লাহই তাহাকে রাজত্ব ও জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাহাকে ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। **এবং যদি আল্লাহ একদলকে অপর দলের দ্বারা প্রশমিত না করিতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হইত** কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহকারী।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৫১)

অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বল প্রয়োগ অপরিহার্য। যুদ্ধ যদিও অশান্তি ও জনসাধারণের কষ্ট আনয়ন করে তবুও শান্তি প্রতিষ্ঠাও এর আর একটি উদ্দেশ্য। এর মূলেও নিহিত থাকে কল্যাণ–মহাকল্যাণ। যুদ্ধের মাধ্যমে অশান্তি উৎপাদনকারী ও স্বৈরাচারী শাসকদের খতম করাই আল্লাহর নির্দেশ। হযরত এ নির্দেশ পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজ জীবনে ৮৩ টি যুদ্ধ করেছেন এর মধ্যে ২৭টি যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন। বল প্রয়োগ নীতি বা Theory of force শান্তির খাতিরে ইসলাম সমর্থন করে। যদি বিধর্মী, কাফেরদের সঙ্গে হযরত যুদ্ধ না করতেন–অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরবারী না ধরতেন তা হলে এ দুনিয়া ভণ্ডামীর কারাগার হতো। বেদুইন, পৌত্তলিক, অগ্নিউপাসক ও বর্বর আরবজাতির কি দুর্দশা এতদিন হতো তা স্বয়ং আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তখন কাফেরগণ তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হলো এবং প্রচার করতে শুরু করল যে নবীরা শুধু ধর্ম প্রচার করবে কিন্তু যিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন তিনি আবার কিসের নবী?

হযরত এ কথায় একটু চিন্তিত ও ক্ষুণ্ন হন। তাই পূর্বোক্ত নবীদের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী বর্ণনা করে হযরতকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন।

"এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর ও জান যে নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।"[১]

(২ ঃ ২৪৪)

সামাজিক চুক্তির ফলে কোথাও কোন রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে কিনা এমন ইতিহাস আমার জানা নেই। একে তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম না, তদুপরি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে সামাজিক বিধান নিয়ম কানুন হতে সম্পূর্ণই থাকি দূরে। তাই এর উপর কোন মন্তব্য আমার চলে না।

আধুনিক জগতে মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত তখনও দেখতে পাই বল প্রয়োগ নীতি সামাজিক চুক্তির কোন মূল্য তারা দেয় না। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে U.N.O. যে প্রচেষ্টা নিয়েছে তা কার্যকরী কোথাও হয়েছে কিনা দেখা যায় না। যদি হতো তাহলে ইহুদীদের দ্বারা ফেলিস্তিনীরা চরম মার খেত না। বাঙ্গালী জাতি নির্মম ভাবে পাঞ্জাবীদের হত্যাযজ্ঞে পরিণত

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী তালুত ২ লক্ষ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পলিষ্টিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় মাত্র ছয়শত সৈন্য ছাড়া বাকি সব তালুতের নির্দেশ অমান্য করে পালিয়ে যায়। তবুও তালুত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। **জালুত** ঃ-জালা ধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ যুদ্ধে নিহত। হযরত দাউদ (আঃ) যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন তখনি এই পরাক্রান্ত জালুতকে নিহত করেন। বাইবেলে জালুতের নাম 'গালিয়াক বীর' লিখিত হয়েছে, বাইবেলে এ হত্যা সম্বন্ধে নিম্নভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ-

"পরে দাউদ আপন ঝুলিতে হাত দিয়া একখানা পাথর বাহির করিলেন এবং ফিঙ্গাতে পাক দিয়া এ পলেষ্টিয়ের কপালে আঘাত করিলেন, সেই পাথর খানা তাহার কপালে বসিয়া গেল এবং সে ভূমিতে আধোমুখ হইয়া পড়িল।"

টীকা ঃ ১ – কোরআন, সূরা বাকারাহ। আয়াত ২৪৪।

www.pathagar.com

হতো না। শান্তি প্রতিষ্ঠার সামাজিক চুক্তিতে এ সব বিরোধের মীমাংসা বহুদিন পূর্বেই হয়ে যেত। সামাজিক চুক্তি কথাটা কাগজ কলমে থাকলেও ফলতঃ দৃষ্ট হয় না। অথচ চুক্তির মাধ্যমে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিবাদ বিসম্বাদ সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সর্বপ্রকার জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান হতে পারে। আর এ চুক্তিই মানব জাতির জন্য শান্তিপ্রদ। ধনক্ষয়, জনক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন পড়ে না। এ সম্বন্ধে মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাকেরও নির্দেশ আছে।

"এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে স্বীকার করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে–এবং **নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপোষে পরামর্শ করে** এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।"[২] (৪২ ঃ ৩৮)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন-

'আমি কি তোমাদিগকে নামাজ, রোজা এবং যাকাত অপেক্ষা উত্তম জিনিস সম্বন্ধে বলিব না? **উহা হইতেছে পরস্পরের মধে শান্তি স্থাপন'**। কারণ শত্রুতা ও ঈর্ষা পুণ্য ফলের মূলোচ্ছেদ করে।"[৩]

বৃটিশ সরকার পাক ভারত উপমহাদেশ যখন ছেড়ে যান তখন হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ রেডক্লিফের সহায়তায় পাকিস্তান ও ভারতের সীমা নির্ধারণ করেন এবং পৃথক দু'টি রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এটা সামাজিক চুক্তির ফল বলা চলে। তবুও বল প্রয়োগ নীতি যে এর সঙ্গে ছিল না তা বললেও ভুল হবে। কেননা দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরুতে যথেষ্ট প্রাণহানি ঘটেছে। ভারত জোরপূর্বক কাশ্মীর ও হায়দারাবাদ দখল করে নিয়েছে। সামাজিক চুক্তি ভিত্তি হলেও শেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রতিটি জাতি যদি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চল্‌ত –হযরতের (দঃ) অমিয় বাণীর উপর শ্রদ্ধা রাখ্‌ত তাহলে এ ধরা শান্তির লীলাভূমিতে পরিণত হতো। কিন্তু তা মেনে চলে না বলেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের মত ভয়াবহ পন্থাকেও বেছে নিতে হয়। আর বল প্রয়োগনীতিকে ধর্মের অঙ্গ বলেও স্বীকার করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন ঃ-

"উৎকৃষ্ট লোকদিগকে নেতা কর যেহেতু তাহারা তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মধ্যে প্রতিনিধি স্বরূপ।"[১]

শাসনকর্তাগণ যে আল্লাহর প্রতিনিধি এ কথা আমি পূর্বেও লিখেছি এবং তা প্রমাণ করতে কোরআনের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি। এখন একটা প্রশ্ন আসে যে আল্লাহ তাঁর আরশ থেকে অথবা বেহেশত হতে কোন রাজা বাদশা প্রেরন করেন না। অথচ কিভাবে এ মনোনীতি ব্যক্তিগণ শাসনকর্তা রূপে একটি রাষ্ট্রের নায়ক হতে পারেন? সে পদ্ধতিই আমরা বের করব। প্রতিটি কার্যই যখন একটি নিয়মের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে এবং তা জনগণের দ্বারাই সম্পন্ন হবে–এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ও বিধান। এ বিধানই দিয়েছে আল্লাহর রসুল (দঃ)।

নেতা নির্বাচনের যে শর্তটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো উৎকৃষ্ট লোক। এটাই হলো নেতা নির্বাচনের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

---

২ – কোরআন, সূরা শূরা। আয়াত ৩৮।

৩ –হাদস–আবুদাউদ ও তিরমিজি। সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড–কৃত মুঃ আজহার উদ্দিন এম. এ. টীকা ঃ ১ –হদিস– তিরমিজি।

www.pathagar.com

উৎকৃষ্ট গুণের সংজ্ঞাতে আমরা বুঝি–শিক্ষিত, মর্জিত, বুদ্ধিমান, সংযমী, সৎ, ন্যায় নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, দয়ালু ইত্যাদি।

কি কি গুণে বিভূষিত হলে একজন উপযুক্ত নেতা হতে পারে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তার বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত তুলে ধরে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরতের সিদ্ধান্ত দেখব ও গ্রহণ করব।

Professor Millar (মিলার) বলেছেন ঃ-

"আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস, বিশ্বাস ও আনুগত্য হইল যোগ্য নেতার গুণাবলী।"

Munson (মানসন) বলেন ঃ-

"যোগ্য নেতার গুণাবলী হইতেছে সদাচরণ, ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা, কৌশল, প্রফুল্লতা, ন্যায়নীতি ও সংযম।"

Bogordus (বোগরদাস–) বলেন ঃ-

"নেতার পাঁচটি গুণাবলী থাকিতে হইবে। তাহা হইল দূরদৃষ্টি, কল্পনাশক্তি, নমনযিতা, প্রতিভা এবং আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা।"

Burtrand Russel (বারট্রান্ড রাসেল) বলেন ঃ-

"আত্মবিশ্বাস, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।"

Michels (মিচেলস) বলেন ঃ-

"ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা।"

এবারে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর বাণী ধরে আবার আলোচনায় মন দিচ্ছি। হযরতের **'উৎকৃষ্ট লোকের'** সংজ্ঞায় আমরা যা পাই তা নিম্নরূপ ঃ

'ইন্না অকরামাকুম ইনদাল্লাহে আতিকাকুম'।

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে সেই বেশি মর্যাদার অধিকারী যে অধিক মুত্তাকী।'[১]

এখান থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে একমাত্র সেই ব্যক্তি সব চেয়ে উপযুক্ত যিনি অধিকতর ধর্মবিশ্বাসী। আর অধিকতর ধর্মবিশ্বাসী হ'তে হলে তাঁকে অধিক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হতেই হবে, নইলে একজন অজ্ঞানী, স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন অশিক্ষত ব্যক্তি মুত্তাকী হতে পারে না এ ছাড়া তাঁকে স্বাধীন হতে হবে, পুরুষ হতে হব, প্রকৃতিস্থ হতে হবে, বয়োঃপ্রাপ্ত, কার্যপরিচালনায় দক্ষ, শৃঙ্খলাবিধানে সক্ষম, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, শত্রুর কবল হতে দেশকে রক্ষার ক্ষমতা এসব ইত্যাদি গুণে বিভূষিত ব্যক্তিই মুত্তাকী। এর শাব্দিক অর্থ পরহেজগার, ধর্মবিশ্বাসী, সৎ কর্মশীল ব্যক্তি।

এই উৎকৃষ্ট ব্যক্তি যে কোন বংশের বা যে কোন গোত্রেরই হোন না কেন, নেতা হবার উপযুক্ত। কোরেশ বেদুইন বা আজমী বংশের কোন লোকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তাঁর বাণীতে যেখানে বলা হয়েছে–"হে মুসলমানগণ। হুশিয়ার! নেতৃ-আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না যদিও কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা করিয়া দেওয়া হয়। এবং সে যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তোমাদিগকে চালনা করে-তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে।"[২]

টীকা ঃ ১ –হাদিস তিরমিজি, সংগৃহীত হাদিসের আলো–কৃত আজহার উদ্দিন।

২ –হাদিস–বিদায় হজ্ব।

www.pathagar.com

আর একটি কথা গভীর ভাবে চিন্তা করবার আছে। সর্বসাধারণের প্রতি নেতা নিবাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেশের জনসাধারণকে নাগরিকের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে তাদের মতামতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই এ বাণী বহন করে। রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্তের এখানেই তিনি কবর রচনা করলেন এবং **গণতন্ত্রের জন্ম দিলেন**।

'গণতন্ত্র'-'ফরাসী বিপ্লবের' ফলাফল নয়, তেরশত বছর পূর্বের মহামানব হযরত মুহাম্মদেরই (দঃ) এক সুন্দর বিধান। এ বিধান শিখিয়ে দিল, রাষ্ট্র জনসাধারণের। কোনব্যক্তি মালিকের সম্পত্তি নয়। বংশানুক্রমিক রাজা, বাদশা হবার কোন অধিকার কোন ব্যক্তির নেই সে যে কোন বংশেরই হোক না কেন বা যত বড় ধনী বা ক্ষমতাশালীই হোক না কেন। সাধারণ এক নাগরিকের যতটুকু অধিকার ঠিক ততটুকুই তাঁর-এর বেশি নয়। তাই তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাসীন হ'তে হলে জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতেই হতে হবে। কোন সুপারিশ বা অধিকারের বলে নয়।

মানুষ যেখানে স্বাধীন হয়ে জন্মলাভ করে সেখানে অধিকারের প্রশ্ন পরাধীন হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষ মাত্রই সমান-এ কথাই শেখালেন মুক্তির দূত, সাম্যের নায়ক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। মায়ের পেটে ধনী-গরীব সবাই একই কৌশলে রূপ লাভ করে, বেঁচে থাকে ও খাবার পায়। সেখানে যখন মর্যাদা ও অধিকারের পার্থক্য নেই তখন পৃথিবীতে এসে পার্থক্যের সৃষ্টি হবে তা মানুষের নবী মানবেন কেন? এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ-

"শোন এবং মান শাসনকর্তার কথা যদিও তোমাদের উপর শাসনভার দেওয়া হয় কোন হাবসী গোলামকে যাহার মস্তক যেন মুনাক্কা।"[১]

"ফরাসী বিপ্লব' নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি। কেননা আমাদের সবারই একটা বদ্ধ মূল ধারণা যে সারা পৃথিবী ব্যাপী আজ যে শাসনতন্ত্র চলছে তা এ বিপ্লবেরই ফল।

ফরাসী বিপ্লবের উদ্যোক্তা ছিলেন **জন রুশো**। তিনি একজন বিপ্লবী চিন্তাবিদ ও বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তাধারা 'Social Contract'-১৭৫৬ সনে প্রথম প্রকাশ পায়। তিনি রাজতন্ত্র ও একনায়কত্বের ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে একনায়কত্ব, স্বৈরাচারী জুলুম ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। একক শাসকের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন। আর এ বিপ্লবই এনে দেবে **গণতন্ত্র**। অর্থাৎ রাজজন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে রাষ্ট্রকে উদ্ধার করে সর্বক্ষমতা জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া।

বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে ফরাসী ঐতিহাসিক 'Chiseignobos' তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন যে, এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ-

(১) একক ও ব্যক্তি শাসনের উচ্ছেদ। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রাধাণ্যকে বিলোপ করে শাসনভার জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া। কোন ব্যক্তি বা কোন গোত্রের একক ক্ষমতা বা শাসন অধিকার না থাকা।

(২) সম অধিকার। সাধারণ মানুষের যে অধিকার থাকবে একজন রাষ্ট্রপতিরও ঠিক ততটুকুই থাকবে। এর বেশি নয়। নর-নারীর সাম্য, গোত্রের সাম্য, অর্থ-নৈতিক সাম্য, আইনগত সাম্য এবং নাগরিক অধিকারের সাম্য।

(৩) রাষ্ট্রীয় অর্থের মালিক হবে রাষ্ট্রের জনসাধারণ, রাষ্ট্রপতি নয়।

(৪) মৌলিক অধিকার যেমন মত, চিন্তাধারা ও প্রেসের স্বাধীনতা।

---

১ -তজরীদুল বুখারী-তর্জমা আঃ রহমান খাঁ। বিধান পরিচ্ছেদ। হাঃ নং /৯৮০।

www.pathagar.com

১৮৭৯ সনকে বর্তমান গণতন্ত্রের প্রথম বছর বলে ধরা হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এ গণতন্ত্রের জন্মদাতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

ব্যক্তি বা গোত্রের একক ক্ষমতার বিলোপ করে হযরত জনসাধারণের ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নাগরিক হিসাবে সবাই সমান এ কথাও তিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছেন এই বলে ঃ-

"কোন আরববাসী অন্য কোন অনারব বা আজমী লোকের তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহে। পক্ষান্তরে কোন অনারববি আজমী ব্যক্তি ও তদ্রূপ আরববাসী কোন লোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। তদ্রূপ শ্বেতকায় কোন ব্যক্তি কৃষ্ণকায় কোন লোকর তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে।" (বিদায় হজ্ব)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁকে বাদশা, প্রভু বা অন্য কোন সম্মানজনক খেতাব ধরে কাউকে ডাকতে দিতেন না। সাধারণ একজন গ্রাম্য লোকও তাঁকে 'ইয়া মুহাম্মদ'! বলে ডাকত। কথিত আছে একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে এসে হাজির হলো এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে ভয় কর? আমি সেই মায়েরই সন্তান যিনি 'কাদিদ' (সাধারণ খাদ্য খেতেন)। সাম্যবাদ বা সমঅধিকারের দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে!

হযরত নাগরিকের সব অধিকার দিয়েছেন কিন্তু রাষ্ট প্রধানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেন নি বরং কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে মান্য করতে, তাঁর আদেশ ও উপদেশকে অনুসরণ করতে। এ নিয়ে পরে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব।

এবারে তৃতীয় বিষয়টি অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় অর্থ' নিয়ে আলোচনা করছি।

হযরত শাসনভার গ্রহণ করে 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থ এ বায়তুল মালে জমা হতো আর সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ খরচ করা হতো। রাষ্ট্রপতির নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী এ বায়তুল মাল থেকে একটি মুদ্রাও খরচ করবার অধিকার ছিল না। এ অর্থে উপকৃত হতো সর্বসাধারণ। এক কথায় বলতে গেলে সমগ্র রাষ্ট্র।

চতুর্থত স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যক্ত করা, লিপিবদ্ধ করা ও জনসাধারণের মাঝে প্রচার করার আইনগত অধিকার দিলেন এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কারো মর্যাদার উপর কিছুমাত্র আঘাত হানা যাবে না, কারো রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে না, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা যাবে না, দোষী ব্যক্তিই কেবল শাস্তি পাবে, কারো সম্পক্তি জোর করে দখল করা চলবে না, এগুলোই হলো এ মহা বিজ্ঞানীর নির্দেশ। একথা দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণীতে, যেমনঃ- "তোমাদের পরস্পরের রক্ত ও ধনসম্পত্তি পরস্পরের জন্য হারাম।" (বিদায় হজ্ব)

এক কথায় বলতে হয় জন্মগত ভাবে মানুষের যে সব মৌলিক অধিকার থাকা উচিত, যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তা এবং আত্মরক্ষার স্বাধীনতা এসব দিলেন মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

নেতার মর্যাদা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সর্বসাধারণের মধ্য হতে যাকে আমরা নেতা বলে নির্বাচন করব তাঁকে নেতার প্রকৃত মর্যাদাই দিতে হবে। এটা শৃঙ্খলার দিক থেকে যেমন অপরিহার্য রাষ্ট্রচালনার পক্ষেও তেমনি সহজ ও সুন্দর। বিশ্বাস ভক্তি আনে, বিশ্বাস শৃঙ্খলা আনে, বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে উন্নতির পথ দেখায়। যেখানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানেই জন্ম নেয় হিংসা, বিদ্বেষ ও অরাজকতা। পরিবারের নেতাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করলে যেমন অপার সুখ ও শান্তি বিরাজ করে তেমনি রাষ্ট্রের যিনি নেতা হন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে তাঁর আদেশ ও নির্দেশ পালন করলে রাষ্ট্রে নেমে আসে শান্তি। জুলুম করে রাজ্য শাসন করলে যেমন প্রজার কষ্ট হয় তেমনি জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা, হীনতা, নির্বুদ্ধিতা ও রাষ্ট্রনায়কের বুদ্ধি লোপ করে। এ জন্যই তার

www.pathagar.com

প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এ নির্দেশও দিয়েছেন বিশ্বের নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি বলেছেন ঃ-

"নেতৃ-আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না।"

আল্লাহ পাক নিজে যেখানে রাজা-বাদশাকে সম্মানিত করেছেন সেখানে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা শুধু পাপই নয়, আল্লাহ ও রসুলকেও অশ্রদ্ধা করা। কেননা রসুল (দঃ) বলেছেন ঃ-

"তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ইমাম হচ্ছে সেই যাকে তোমরা অন্তরে ভালবাস এবং যে তোমাদেরকে অন্তরে ভালবাসে। তাঁর মুখ থেকে তোমাদের জন্য দোয়া বের হয়। এবং নিকৃষ্ট ইমাম হচ্ছে সেই যার প্রতি তোমরা অন্তরে দুষমণী পোষণ কর এবং সেও তোমাদেরকে দুষমণ মনে করে,যাকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং যে তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।" (হাদিস)

জনৈক সাহাবী আরজ করিলেন,–"হে রসুলুল্লাহ! এমন ইমামের সাথেও আমরা কলহ করব না?।' **হযরত বললেন, না। যতক্ষণ সে তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম রাখে ততক্ষণ তার আনুগত্যকেই যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। যদি তাহাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী কিছু দেখ তা তোমরা মনে করো না কিন্তু ইমামের আনুগত্য থেকে হাত গুটাইও না।"**[১]

"যদ্যপি তোমার উপরে শাসনকর্তার মনে বিরূপভাব জন্মে তথাপি তোমার স্থান ছাড়িও না, –কেননা শান্তভাব বড় বড় পাপ ক্ষান্ত করে।"[২]

হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) বলা হয় 'হায়াতুন্নবী' অর্থাৎ যে নবী চিরকাল, চিরঞ্জীবি হয়ে আছেন। তাই, তিনি সর্বযুগের, সর্বকালের ও সর্বদেশের নবী হিসাবেই অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর বাণীগুলো শুধু সে যুগের জন্য নয় এবং একমাত্র আরবভূমির জন্যই প্রযোজ্য নয়। স্বৈরতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র শুধু আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বিশ্বজুড়েই এ প্রথা ছিল। আজও আছে এবং দূর ভবিষ্যতেও থাকবে। এক শ্রেণী থাকবে যারা নিজের আধিপত্য ও ক্ষমতারই বিকাশ করার প্রয়াসী হবে। রাজতন্ত্র বা বাদশাহীকেই সমর্থন করবে। উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, অশিক্ষিত জনতার রায়কে দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যাঘাত স্বরূপ বলেই মনে করবে। কেউ বা অত্যাচারী হবে, আল্লাহর রসুলের বিধানকে খেয়াল করবে না। কেউ বা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে স্বীকার করবে কিন্তু সে বিধান অনুযায়ী নিজেও চলবে না, প্রজাকেও চালাবে না। কেউ বা আবার বাইরে দেখাবে পরহেজগারী কিন্তু অন্তরে থাকবে লুকোচুরী। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এরূপ বিভিন্ন স্বভাবের শাসকেরই জন্ম হবে। তাঁদের প্রতি জনসাধারণের কেমন মর্যাদা প্রদর্শন করা উচিত, তাঁদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরা উচিত কি না, এদের নিধন ক'রে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা কৃতিত্বের বিকাশ কিনা সে সব জটিল প্রশ্নের সমাধানও দিয়েছেন এ মহান রাষ্ট্রনেতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি বলেছেন ঃ-

"আমার পরে এমন সব ইমাম হবে যারা আমার তরিকা বর্জন করবে, আমার সুন্নাহর অনুসরণ করবে না। অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসনকর্তা হবে যাদের শরীয়ত মানুষেরই হবে কিন্তু অন্তর হবে শয়তানের অন্তরের ন্যায়।" বর্ণনাকারী বলেছেন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা যদি সে যুগের দেখা পাই তবে আমাদের পথ কি হবে? **'শ্রবণ এবং আনুগত্য'** তোমাদের পিঠে যদিও কোড়া লাগায়, যদিও তোমাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবু তাদের কথা শুনো–তাদের আনুগত্য স্বীকার করো।" (হাদিস)

টীকা ঃ ১ –হাদিস, সংগৃহীত ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র। কৃত আবুল কালাম আজাদ, তর্জমা মওলানা নূর উদ্দিন আহমদ— পৃষ্ঠা ১০৫।

২ –বাইবেল তৌরাত অংশ উপদেশ পরিচ্ছেদ ১০/৪।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রনায়কের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের এমন নির্দেশ বিরল। রসুলের (দঃ) এ মহাবাণী অনুসরণ করলে রাত্রির অন্ধকারে কোন রাষ্ট্রনায়ক আততায়ীর নির্মম আঘাতে প্রাণ দিত না। রাষ্ট্রনায়কের সুরক্ষিত দুর্গে ভীত সন্ত্রস্ত মনে দিন অতিবাহিত করতে হতো না। সবাই শাসকের আনুগত্য হৃষ্টমনে স্বীকার করে নিজ নিজ দায়ত্ব পালন করতে বাধ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও সম্মান যে কত অধিক, একজন সুশাসক বাদশার পারলৌকিক পুরস্কার যে কেমন সম্মানজনক হযরতের (দঃ) নিম্নোক্ত বাণী থেকে তা বুঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ-

"একজন সুবিচারক বাদশার জন্য ফেরেশতারা প্রত্যহ ৬০ জন সিদ্দিক শ্রেণীর আবেদ লোকের নিরবচ্ছিন্ন এবাদতের সমপরিমাণ আমল লিপিবদ্ধ করিয়া আসমানে লইয়া যান।"[১]

"ন্যায় বিচারক বাদশার জন্য তাঁহার অধীন সমস্ত প্রজার আমলের সমপরিমাণ আমল প্রত্যহ ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে লইয়া যায় এবং তাঁহার প্রত্যেক নামাজের জন্য ৭০ হাজার নামাজের সওয়াব লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।"[২]

"সুবিচারক বাদশা আল্লাহর অতি প্রিয় বন্ধু। পক্ষান্তরে অত্যাচারী বাদশা আল্লাহর ঘোর শত্রু এবং ভীষণ দণ্ড ভোগের উপযোগী।"[৩]

"কোন শাসনকর্তার একটি দিনের জন্য সুবিচারের সহিত রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করা একাধারে ৬০ বছর ব্যাপী অনবরত আল্লাহর এবাদত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"[৪]

জানি না কয়জন রাজা বাদশা প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত রাত -দিন পরিশ্রম করে এবং হাত তুলে আল্লাহর কাছে অশ্রুসজল চোখে প্রার্থী করেন। সিংহাসনে বসেই দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারে ভরে উঠে তাঁদের মন। বিরুদ্ধে সমালোচনা হলেই গুলি করে হত্যা অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। রাজকোষ শূন্য করে নিজের বাহাদুরী ও কৃতিত্ব প্রচার করা, নিজ দল গঠন করে গদি টিকিয়ে রাখার অদ্ভুত ও স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করাই হলো বর্তমান যুগের শাসনকর্তাদের রীতি। এ ঘৃণ্য ও অসহযোগী মনোভাব দেশের জন্য বয়ে আনে কলঙ্ক আর প্রজার জন্য আনে অসীম দুঃখ ও কষ্ট। দেশের সংস্কারমূলক কাজে হাত না দিয়ে লাঠি খেলা, যাদু খেলা, হকি, ফুটবল খেলায় অজস্র অর্থ ব্যয় করা হয়। লাখ লাখ বেকার সমস্যার সমাধান নেই, ভূমি সংস্কারের চিন্তা নেই, এতিম-দুঃখী ও গরীবের মুখে হাসি ফুটানোর কোন ব্যবস্থা নেই। মিথ্যা বক্তৃতা মাঠে-ঘাটে-হাটে অহেতুক ঘোরাফেরা করার পিছনে কত যে অপচয় হয়, বর্তমানের শাসকগোষ্ঠী তা কোন দিনই চিন্তা করেন না। আল্লাহ-পাকই ভাল জানেন–তাঁর মনোনীত এ শাসকগণ কি পুরস্কার ও মর্যাদা পাবেন।

নেতৃ–আদেশ লঙ্ঘন করা

উপরে বর্ণিত বাণী পাবার পরে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে একটা প্রশ্ন তবু দোলা দেয় যে রাষ্ট্রনায়ক যদি ইয়াজিদ ও ইয়াহিয়ার মত পাষাণ ও প্রাণহীন হয়, মাতাল ও মদখোর হয়ে প্রজার উপর নির্মম অত্যাচার করে, স্বার্থের লোভে নিজ রাষ্ট্রে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে, নির্যাতন, ঘর বাড়ী পোড়ান নীতি অবলম্বন করে লক্ষ লক্ষ নরনারীর আত্মমর্যাদা ও বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া উচিত কি না।

বিশ্বের নবী তথা সমগ্র মানুষের নবী ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি জানতেন যে

টীকা ঃ ১ –কিমিয়ায়ে সাআদত হতে সংগৃহীত। ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।

২ হতে ৪–কিমিয়ায়ে সা-আদত হতে সংগৃহীত। ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।

www.pathagar.com

এমন দুরাচারী শাসকের অভাব ভবিষ্যতে হবে না। এরা ন্যায়নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে হিংসা ও লোভের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে। প্রজাদের করুণ আর্তনাদ ও রক্তবন্যা দেখে উল্লসিত হৃদয়ে এরা হাসবে। এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অপরিহার্য। পাষাণের হাত থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণই বীরত্ব। ন্যায় নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করাতেই সার্থকতা। রসুলের (দঃ) নিকট হতে এরূপ নির্দেশ আমরা পেয়েছি।

তিনি বলেছেন ঃ-

"অত্যাচারী নরপতিকে ন্যায্য কথা শুনাইয়া দেওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জেহাদ।"[১]

"যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কোন জালেমকে সাহায্য করে সে নিশ্চয় ইসলামের গণ্ডি হতে বহির্গত হয়।"২

"তোমাদের কর্তব্য নেতার কথা শুনা ও মানা যতক্ষন না আদেশ দেওয়া হয় কোন গুনার কাজের কিন্তু যখন কোন গুনার কাজের আদেশ দেওয়া হয় তখন না শুনা, না মানা।"[৩]

নেতার প্রয়োজন

হাল ছাড়া নৌকা যেমন চলে না, খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর থাকে না, তেমনি নেতা ছাড়াও একটি রাষ্ট্র চলে না। নেতাই চালক, নেতাই পথ নির্দেশক এবং নেতাই জনসাধারণের সেবক। একথাও আমরা পাই রসুলের বাণীতে, যিনি বলেছেনঃ- "সম্প্রদায়ের নেতা তাহাদের সেবক।"[১]

সেবক হিসাবে নেতার কর্তব্য কি–এগুলোর বিশদ আলোচনা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে করব। এখন শুধু উপরের বাণী ধরে একটু আলোচনা করি।

যারা রসুলের (দঃ) এ বাণীটি স্মরণ করে তাঁরা নেতা হবার লালসা করে না। কেননা নেতা হয়ে যদি জনসাধারণের সেবক হতে না পারে তবে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে, মানুষের নিন্দা ও অপবাদও শুনতে হবে। এ জন্য তাঁরা নিজকে গোপন করে দূরে থাকে। সমাজের এরূপ লোকের অভাব নেই। জনসাধারণ তাদের চেনে না। অথচ এরাই খাঁটি ইমানদার ও নেতা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। রসুলের আর একটি বর্ণনায় এ তত্ত্ব আমরা জানতে পাই। তিনি বলেছেনঃ-

"তোমরা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে এই কার্যে নিযুক্ত হইতে ঘৃণা করিতে দেখিবে যে পর্যন্ত সে ইহাতে নিযুক্ত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম, বর্ণনায় আবু হোরাইরা।)

যে পদের উপর নির্ভর করে সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতি, জনগণের সুখ-দুঃখ ও অস্তিত্ব যার উপর নির্ভরশীল—সেই পদে সমাসীন ব্যক্তির জন্য যে বিধান দিয়েছেন তার চেয়ে সুন্দর বিধান কেউ দিতে পারেন নি। নেতৃত্বের লোভে শুধু আমাদর দেশে কেন সুসভ্য দেশ ইংলেন্ড ও আমেরিকাতেও যে সব কাণ্ড-কীর্তি ঘটে তা দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতিকে দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে হত্যা করা, সুরক্ষিত প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে বের করে তাকে বন্দী করে ক্ষমতা দখল করা, রাষ্ট্রপতির অবর্তমানের সুযোগে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার নীতি আজ-কাল খুবই সহজ হয়ে পড়ছে। কারো অধীনে কেউ থাকতে রাজি না, কারো শাসনেই কেউ খুশি না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা নেশা যেন রাজনীতিবিদ ও সুযোগ সন্ধানীদের মস্তিষ্কে লেগেই আছে। একে অপরের দুর্বলতার সুযোগেই হোক, অপবাদ, নিন্দা ও কুচক্রের

টীকা ঃ ১ –আবু দাউদ। ২–মিশকাত

৩ –সহীহ বুখারী হাঃ নং ৬৫। ১৪ জেহাদের মাহাত্ম পরিচ্ছেদ।

১ –ছগির। সংগহীত হাদিসের আলো, হাঃ নং ৬৮৩।

www.pathagar.com

বলেই হোক, অথবা সাময়িকভাবে ক্ষমতা হাতে পেয়েই হোক–প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাস্ত করতেই হবে। নইলে পেটের ভাত হজম হবে না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে কেউ রাজি না। যদি রাজি থাকত তা হলে এ ধরা বেহেশতে পরিণত হতো।

শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এ জন্যই জনগণের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিতেন এই বলেঃ- "নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে।"[২]

পদের লোভে যদি কেউ লালায়িত না হতো–তা হলে উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করা কঠিন হতো না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। মানুষ মাত্রেরই লোভ আছে। এর ব্যতিক্রম শুধু দেখা গেছে খেলাফতের যুগে–এ যুগে নয়।

প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রকাশ্য সভায় জনসাধারণের সম্মতিতে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর, হযরত আবুবকর কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু এর অনুমোদন দিয়েছিলেন জ্ঞানী-গুণী সাহবা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানকে নির্বাচিত করা হয়েছিল একটি পরামর্শ সভার মাধ্যমে। আর চতুর্থ খলিফা হযরত আলী নির্বাচিত হয়েছিলেন সমগ্র দলের সমবেত রায়ে।

এখন আমরা দেখব যে একজন মাত্র নেতাই কি একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার বহন করতে সক্ষম? তিনি একাই কি কোটি কোটি মানুষের সেবার জন্য দায়ী। তাঁর একার পক্ষে কি এটা সম্ভব?

না–কিছুতেই না। একটি পরিবার বা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে সবার ইচ্ছা অনুযায়ী সব কিছু করা যেখানে সম্ভব নয়–সেখানে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা একজন মাত্র রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজন–যাঁরা এক একটি বিভাগের দায়িত্ব নিতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তিনিও তাঁর পারিষদবর্গ গঠন করেছিলেন শ্রেষ্ঠতম সাহাবাদের মধ্য হতে। শাসন কার্যে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন দেশের জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাতেন, যুদ্ধ পরিচালনার নিমিত্ত একটি পৃথক বিভাগ গঠন করতেন এবং প্রধান সেনাপতির পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিয়োগপত্র দিতেন।

জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা যায় অথবা রাষ্ট্রপতি অভিজ্ঞ ও পরহেজগার ব্যক্তিদের মনোনীত করতে পারেন। এতে রাষ্ট্রপতির কোন অন্যায় হবে না। তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতেই মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হবার নিয়ম। যখন মনোনয়নের পরিবেশ আসে তখন রাষ্ট্রপতিকে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি রাষ্ট্রের একজন সেবক। তাই উপদেষ্টা পরিষদকেও এমন হতে হবে যেন তাঁরা নিজ স্বার্থ উপেক্ষ করে জনগণের স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যারা মন্ত্রীত্বের জন্য অথবা কোন বিশিষ্ট পদের জন্য রাষ্ট্রনায়কের পদ লেহন করে অথবা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গদীনসীন হতে চায় তাঁদের মনোনীত না করাই হযরতের বিধান। এ সম্বন্ধে রসুলের একটি হাদিস নিম্নরূপ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু মুসা। তিনি বলেছেন ঃ-

আমার দুইজন চাচাত ভাই রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট গিয়ে বলিল, 'আল্লাহ আপনাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন উহাদ্বারা আমাদিগকে কোন দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন–আল্লাহর শপথ। যাহারা প্রার্থী হইবার জন্য অথবা ইহার জন্য লালায়িত, তাহাদিগকে আমি এই কাজে নিযুক্ত করি না।'

---

২ –হাদিস, সংগৃহীত – ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, কৃত পূর্বে বর্ণিত

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় 'যাহারা এই পদের আশা করে আমি তাহাদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করি না।'[১]

নেতা নির্বাচনে হযরতের আর একটি বাণী গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই–

"কখনও সফলকাম হইবে না ঐ জাতি যারা শাসনভার দেয় কোন নারীর উপর।"[২]

উক্ত হাদিসটি আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন পারস্যবাসীরা কেসরার কন্যাকে নিজেদের শাসনকর্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিল তখন রসুলুলাহ (দঃ) এ বাণীটি দেন।

বর্তমান বিশ্বে এ বিষয়টির উপর যদিও কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না তবুও এ বাণীর মূল্য অপরিসীম এটা স্বীকার করতেই হবে। নারী ও পুরুষের দৈহিক, মানসিক ও চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাহস, বল-বীর্য ও বুদ্ধিমত্তায় নারী পুরুষের অর্ধেক। নারী যতই উচ্চ শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও শক্তিশালী হোক না কেন সে প্রকৃতিগতই নারী। পুরুষের কার্য তার দ্বারা সম্ভব নয়। কেন? এসব প্রশ্নের জবাব আমি বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) দ্বিতীয় খণ্ডে নারী পুরুষের পার্থক্য পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি। তবুও অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক নারীকে শাসনভার নিতে দেখা গেছে যেমন-সুলতানা রাজিয়া, বেগম নূরজাহান, মহারানী ভিক্টোরিয়া, রানী এলিযাবেথ, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, মিসেস বন্দর নায়ক, মিসেস গোল্ডা মায়ার ইত্যাদি। শাসনকার্য তাঁরা কি পুরুষের চেয়ে কম দক্ষতা দেখিয়েছেন? বেশ, স্বীকার করলাম তাঁরা বুদ্ধিমতী, রাজনীতিজ্ঞ ও সুশাসিকা ছিলেন। কিন্তু এর কি কোন উত্তর আছে–যে সুনাম তাঁরা শাসন ক্ষেত্রে অর্জন করেছেন কোন পুরুষকে তাঁদের পরিবর্তে দিলে তাঁরা তাঁদের চাইতে কম কৃতিত্ব দেখাতেন? ১৯৬৪ সনের নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসকরূপে যদি মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ নির্বাচিত হতেন তবে ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে পাকিস্তানের ভাগ্যে কি হতো এ কথার জবাব কি কেউ দিতে পারবে? আয়ুবের নেতৃত্ব না পেলে কেউকি বুকে মাইন নিয়ে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দুর্বার সাহসে বুক পেতে দিত? শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠ না শুনলে কেউ কি প্রেরণা পেত? লাঠি হাতে সুশিক্ষিত এক লক্ষ পাক-সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার দুর্বার সাহস বুকে পেত? না, কখনই না। শেখ মুজিবের উদাত্ত আহ্বান বজ্রকঠিন শপথ, দেশাত্মপ্রেম, এবং দূরদর্শিতাই সাড়েসাত কোটি বাঙ্গালীর প্রাণে তুলে দিয়েছিল এক নতুন সুর, অস্ত্রে তন্ত্রে দিয়েছিল ঝংকার আর চিন্তাধারায় এনে দিয়েছিল এক যুগান্তরকারী বিপ্লব। তাই বাঙ্গালী হলো স্বাধীন, মুক্ত। কোন তেজস্বিনী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ও রাজনীতিজ্ঞা নারীর পক্ষেই শেখ মুজিবের কণ্ঠ ও দুর্বার সাহস কেড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নারী চিরদিনই নারী, সে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, পুরুষের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করতে পারে–জাগরণ আনতে পারে না।

রাষ্ট্রপতির কর্তব্য

আল্লাহ পাক প্রতিটি দেশ ও জাতির মধ্যেই যেমন নবী ও পয়গম্বর পাঠিয়েছিলেন তেমনি সেই দেশ ও জাতির মধ্যে এক একজন রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন ক'রে তাদের নিরাপত্তা, শান্তি ও সুবিচারেরও ব্যবস্থা করেছেন। হানাহানি, জুলুম, অত্যাচার, পথভ্রষ্টতা হতে মানুষ মুক্ত হোক, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটুক, সর্বস্তরে শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পূর্ণতা আসুক এটাই হলো খলিফা, বাদশা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের কারণ। এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করাই হলো রাষ্ট্রপতির কর্তব্য।

হযরতের জীবনচরিত আলোচনা করলে আমরা প্রতি কাজেই এ শিক্ষা পাই। তাঁকে

টীকা ঃ-১ –বুখারী ও মুসলীম। সংগৃহীত হাদিসে রসুল।

২ –সহীহ বুখারী। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত হাঃ নং ৯৯/১১৬।

www.pathagar.com

অনুকরণ ও অনুসরণ করবার মত শক্তি আমাদের সাধারণ মানুষের নেই সত্য কথা। তবু তাঁর আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশিত পথ ধরে চলার চেষ্টা করলে এ পৃথিবীতে অশান্তি থাকত না। রাজা-প্রজায় এত ব্যবধানের সৃষ্টি হতো না। দাম্ভিকতায় বাদশার মুখমণ্ডল রক্তিমরূপ ধারণ করত না। দেখুন, বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি হয়ে হযরত কি বলেছেন ঃ-

"আমি আল্লাহর বান্দা। একজন বান্দার মতই আহার করি।"[১]

এ মহাবাণীর বিশ্লেষণ দিতে গেলে কলম থেমে যায়। একটি বিশাল রাষ্ট্রের অধিনায়ক কি ভাবে দৈনন্দিন জবিন অতিবাহিত করেছেন, সামাজিক, পারিবারিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে কি তাঁর কর্তব্য ছিল, দায়িত্ব পালনে কেমন তৎপর ছিলেন ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী মূর্খ সবার জন্য কেমন মহৎ, বিনয়ী, সৎ, অমায়িক, ভদ্র ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, যুগ যুগের মনীষীরা তার সাক্ষ্য দেয়। বিস্তৃত আলোচনা না করে এর উপর বিধর্মী মনীষীদের মাত্র দুটি মন্তব্য তুলে ধরলাম। আশা করি সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়ক ও নেতাদের চিন্তার পরিবর্তন হবে এবং সুখীও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রগঠন করার এক পরিকল্পনা মনের মাঝে দোল খেলবে।

ঐতিহাসিক ষ্ট্যনলী লেইনপুল বলেছেন ঃ-

"তিনি (মুহাম্মদ) কল্পনার অদ্ভুত শক্তিতে হৃদয়ের উচ্চতায়, অনুভূতির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন বিশিষ্ট। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়–'পর্দার অন্তরালে কোন কুমারীর চেয়েও অধিক শিষ্ট ছিলেন তিনি'। অধস্তনদের কাছে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রশ্রয়দানকারী, এবং তাঁর আনাড়ী ছোট্ট বালক ভৃত্যটি যাই করুক না কেন তার জন্য তাকে কখনো তিরস্কৃত হতে দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ভৃত্য আনাস বলেছেন, 'দশ বছর নবীজির কাছে আমি ছিলাম, এর মধ্যে আমার প্রতি কখনো 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি তিনি। নিজ পরিবারের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই স্নেহশীল। ছেলে-মেয়েদের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন তিনি। রাস্তায় তাদের দাঁড় করিয়ে তাদের ছোট মাথায় দিতেন হাত বুলিয়ে। জীবনে কখনো তিনি কাউকে আঘাত করেন নি। সবচেয়ে খারাপ বাক্য যা কথাবার্তায় কখনো ব্যবহার করেছেন তা ছিল 'তার কি হয়েছে? তার কপাল কাদায় আচ্ছন্ন হয় যেন।' 'কোন একজনকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হই নি, প্রেরিত হয়েছি মানব জাতির কল্যাণকারীরূপে। অসুস্থদের তিনি দেখতে যেতেন, কোন শবযানের সম্মুখীন হলে, তিনি অনুগমন করতেন তার, গোলামেরও খানার দাওয়াত গ্রহণ করতেন তিনি, সেলাই করতেন তাঁর নিজের পোশাক, ছাগীর দুগ্ধ দোহন করতেন, নিজের সেবা নিজেই করতেন, সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন হাদিস। অন্য কারো হাত থেকে কখনো নিজের হাত আগে টেনে নেন নি এবং অন্য লোকটির ঘুরে দাঁড়াবার আগে নিজে ঘুরে দাঁড়াতেন না।" (সংগৃহীত–সত্য সমাগত by এস. এ. সিদ্দিকী। পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫)

জন ড্যাভেন পোর্ট বলেছেন ঃ-

"মহতের প্রতি তাঁর বিনয়, বিনীতের প্রতি অমায়িকতা ও দাম্ভিকের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ তাঁকে এনে দিয়েছিল শ্রদ্ধা, ভালবাসা মিশ্রিত বিস্ময় আর উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি। তাঁর প্রতিভা প্রবর্তন বা নির্দেশনার জন্য ছিল সমভাবে উপযুক্ত। বিদ্যায় যদিও সম্পূর্ণ অজ্ঞ, প্রকৃতির গ্রন্থে গভীর পাঠ গ্রহণকারী তাঁর মন চরম সূক্ষদর্শী। শত্রুর সঙ্গে বিতর্কের মোকাবিলায় বিকশিত হতে পারত, অথবা নিম্নতম বুদ্ধিসম্পন্ন অনুগামীর বোধ শক্তি অনুসারে নিজেকে সঙ্কুচিত করতে পারতেন। তাঁর সহজ বাগ্মিতা মুখভাবের প্রকাশ দ্বারা যা হত চিত্তকার্ষক, যাতে মর্যাদার বিহ্বলতা প্রশমিত হত, অমায়িক মিষ্টতায় তা জাগিয় তুলত গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আবেগ এবং বিশিষ্ট ছিলেন তিনি প্রতিভার কর্তৃত্বকারী ভাবের দ্বারা যা সমভাবে শিক্ষিতকে করত প্রভাবিত আর অশিক্ষিতকে আদিষ্ট বন্ধু ও পিতা হিসাবে তিনি প্রদর্শন করেছেন মেজাজের কোমলতম অনুভূতি। কিন্তু হৃদয়ের মর্যাদা ও উদার আবেগে আবিষ্ট যখন এবং নিয়োজিত যখন

টীকা ঃ ১ –সংগৃহীত – ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, কৃত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, তর্জমা নুরউদ্দিন - পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

www.pathagar.com

অধিকাংশ সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য সমাপনে তখন অমর্যাদা করেন নি, তিনি 'আল্লাহর রসুল'–এই গৃহীত উপাধির। একটি বিরাট মনের স্বাভাবিক সবটুকু সারল্য নিয়ে তিনি সম্পন্ন করেছেন সামান্যতম কর্তব্য যার সাধারণত্ব সাড়ম্বর শব্দাবলীতে আড়াল করা নিরর্থক। এমন কি যখন তিনি আরবের অধিকর্তা। তখনও নিজ হাতে মেরামত করেছেন নিজের জুতা ও পরিধান করেছেন মোটা পশমী পোশাক, দোহন করেছেন ভেড়ীর দুধ, ঝাড়ু দিয়েছেন ঘরের মেঝে এবং চুলোয় ধরিয়েছেন আগুন। খেজুর আর পানি ছিল তাঁর চিরাচরিত খাদ্য এবং দুধ ও মধু তাঁর বিলাসবস্তু। সফরে বেরুতেন যখন, তখন সামান্য খাদ্যের গ্রাস তিনি মুখে তুলতেন চাকরের সঙ্গে ভাগ করে। বদান্যতায় তাঁর উৎসাহদানের সততা, তাঁর মৃত্যুর সময় নিজ বাক্সের শূন্যাবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।" [এ্যাপোলজি ফর কোরআন এন্ড মুহাম্মদ]

বসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেনঃ-

"By a fortune absolutely unique in history Muhammad is that three fold founder of —a religion, a state and a nation" [Bosworth—Life of Muhammad]

খলিফাগণ হযরতের আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেছেন। হযরত আবুবকর তাঁর খেলাফতের প্রথম ভাষণে বলেছিলেন,

"হে ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদের খলিফা নিযুক্ত হয়েছি যদিও আমি তোমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নই। হে ভ্রাতৃগণ! আমি আল্লাহ ও রসুলের অনুগত। কোন নূতন কিছু করার অধিকার আমার নেই। যদি আমি সঠিক পথে থাকি তবে তোমরা আমার সহযোগীতা করবে আর যদি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হই তবে তোমরা আমাকে শোধরিয়ে নিও।"

হযরত উমর এসময় সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

"আমিও তোমাদের মত একজন ব্যতীত নই। আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি যা চাই তোমরাও তাই মেনে নেবে।"

দায়িত্ব ছাড়া নেতৃত্ব অচল। যার দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব। একজন্যই নেতার থাকতে হবে। (১) গভীর জ্ঞান, (২) দূরদৃষ্টি, (৩) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (৪) ন্যায় নীতি, (৫) সংযম, (৬) ভাষার দৃঢ়তা।

রাষ্ট্রপতি যদি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন, সুখের আতিশয্যে গা ঢেলে দেন, প্রজারা যদি অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মে অমনোযোগী হয় তবে রাষ্ট্রপতিকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী হতে হবে। মহাবিচারের কাঠগড়ায় তাঁকেও দাঁড়াতে হবে। হযরতের বাণী এর সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেনঃ- "যাহাকে আল্লাহ প্রজার উপর শাসনভার দিয়াছেন কিন্তু সে পালন করে নাই উহা শুভেচ্ছার সহিত সে পাইবে না বেহেশতের খুশবু।"[১]

অন্যত্র বলেছেন ঃ-"যে ব্যক্তি শাসন কর্তৃত্ব করে মুসলামান প্রজার উপর এবং মারা যায় তাহাদের প্রতি অত্যাচারী অবস্থায়, খোদা হারাম করিবেন বেহেশত তাহার উপর।"[২]

"কেউ যদি নামের জন্য কাজ করে আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দিবেন কিয়ামতের দিনে এবং কেউ যদি কষ্ট দেয় লোকদের, আল্লাহ কষ্ট দেবেন তাহাকে কিয়ামতের দিন।"[৩]

সৃষ্টির সেরা মানুষকে ভালবাসা, তার উপর কর্তৃত্ব করা, সুখে-দুঃখে অংশীদার হওয়া কম কথা নয়। আল্লাহ যাকে এ সুযোগ দিয়েছেন, যার উপর এমন কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তিনি সত্যি সৌভাগ্যবান—প্রকৃত রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে তাই স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি। বিশেষ দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত। বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র, সমাজ তথা রাষ্ট্রের যাবতীয় বস্তুর উপরই তাঁর দায়িত্ব রয়েছে। অন্যের উপর জুলুম ক'রে নিজ প্রভুত্বের বাহাদুরী

টীকা ঃ ১ –৩ তজরীদুল বুখারী, বিধান পরিচ্ছেদ তর্জমা আঃ রহমান খাঁ। হাঃ নং ৩/৮৮৯২, ৪/৯৮৩ এবং ৫/৯৮৪।

www.pathagar.com

করা, মানুষকে দাসে পরিণত করা, করভারে জর্জরিত ক'রে নিজের বিলাস ভবন তৈরি করার হীন প্রবৃত্তি হতে তাকে হতে হবে মুক্ত। স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, স্বেচ্ছাচারিতার বহু উর্ধ্বে তাকে থাকতে হবে। প্রজার সন্তুষ্টি বিধানই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ কথাই তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে রসুলের (দঃ) আদর্শ ও তাঁর মহাবাণী।

"সমস্ত সৃষ্টজীব আল্লাহর পরিজন এবং সেই ভক্তিই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে তাহার সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে।"[৪]

"যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দেয়।" (হাদিস)

হযরতের এমন উদার ও মহামূল্যবান বাণী একটি দুটি নয়, শত শত। রাষ্ট্রপতি হিসাবে, ন্যায়ের শাসক হিসাবে তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগযুগ ধরে অমর হয়ে থাকবে।

সুবিচার

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে রসুল যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্ -পাকও তদ্রূপ নির্দেশ দান করেছেন। কোরআন এর সাক্ষী–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদেশ করেন ন্যায় বিচারের, পরোপকারের এবং আত্মীয়গণের প্রতি দানের এবং নিষেধ করেন কুকর্ম, ঘৃণিত কার্য এবং অত্যাচার। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা মনোযোগ দাও।"[১] (১৬ ঃ৯০)

"হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি–অতএব ন্যায্যভাবে মানুষের মধ্যে বিচার কর। প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। তাহা হইলে ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। অনন্তর যাহারা আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হয় তাহারা কঠিন শাস্তি ভোগ করে যেহেতু তাহারা হিসাব নিকাশের দিনকে ভুলিয়া যায়।"[২]

"তোমরা সুবিচার কর। উহা ধর্মভীরুতার নিকটবর্তী।"[৩]

"অতএব তোমাকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে, তুমি তাঁহার উদ্দেশ্যে তদ্রূপ আহ্বান কর ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং তুমি বল, গ্রন্থ হইবে আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা আমি বিশ্বাস করি; এবং আমি তোমাদের মধ্যে সুবিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; আমাদের জন্য আমাদের কার্য এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য; এবং আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনই কলহ নাই; আল্লাহই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং তাঁহারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[৪]

"এবং যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে তোমরা তদ্বারা যেরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছ তদানুরূপ শাস্তি প্রদান করিও; এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে নিশ্চয় উহা ধৈর্যশীলগণের জন্য কল্যাণকর। এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর ও তোমার ধৈর্য ধারণ আল্লাহর সহিত ভিন্ন নহে এবং তাহাদের প্রতি বিষন্ন হইও না ও তাহারা যে চক্রান্ত করিতেছে তৎসম্বন্ধে সঙ্কুচিত হইও না। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমীদিগের ও যাহারা সৎকর্ম করে; তাহাদের সহিত রহিয়াছেন।"[৫]

"তুমি বল–আমার প্রতিপালক সুবিচারের আদেশ করিয়াছেন----।"[৬]

টীকা ঃ ১ –কোরান সূরা নহল। আয়াত ৯০।

২ –৪ কোরআন সুরা শূরা। আয়াত ১৫ (৪২ ঃ ১৫)।

৫ । ঐ " নহল। " ১২৬-১২৮ (১৬ ঃ ১২৬-১২৮)।

৬ – ঐ " আরাফ । " ২৯ (৭ ২৯)

www.pathagar.com

"পুরুষ চোর ও নারী চোর কিছু অর্জন করিলে ওকে তৎপরিবর্তে আল্লাহ হতেই **শাস্তি স্বরূপ তাহাদের হস্ত সমূহ কর্তন কর। আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। কিন্তু যে স্বীয় অত্যাচারের পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সংশোধিত হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করেন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।**"[১] (৫ ঃ ৩৮)

"ব্যাভিচারিনী ও ব্যভিচারী–ইহাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর; এবং আল্লাহর আদেশ সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি যেন তোমাদের মমতা আকৃষ্ট না হয়–যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া থাক।"[২] (২৪ ঃ ২)

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ–নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন এবং দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী; কিন্তু যদি কেহ তাহার ভ্রাতা কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় ওকে নিয়মিত প্রথার অনুসরণ করিবে এবং সদ্ভাবে উহা পরিশোধ করিবে; ইহা তোমাদের প্রতিপালকের লঘু বিধান ও করুণা। সুতরাং ইহার পর যে কেহ সীমা লঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য যন্ত্রণাপদ শাস্তি রহিয়াছে। যে জ্ঞানবান লোক সকল প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য জীবন আছে যেন তোমরা ধর্মভীরু হও।"[৩] (২ ঃ ১৭৮-১৭৯)

উপর্যুক্ত বাণী সমূহ বিচার ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারকদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে কোরআন বহু উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। নিম্নে আর একটি বাণীর উল্লেখ করছি।

"হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদানকারী সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা হও এবং যদিও ইহা তোমাদের নিজের অথাবা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিকূল হয়; যদি সে সম্পদশালী অথবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহই তাহাদের জন্য যথেষ্ট, **অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং যদি তোমরা নীরব থাক অথবা বিরত হও তবে তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ অভিজ্ঞ।**[৪]

(৪ ঃ ১৩৫)

বিচারকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী দিয়া বলা হয়েছে **'আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদানকারী সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা হও'** এর অর্থ আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে–অর্থাৎ আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন ও শুনছেন এই ভীতি অন্তরে রেখে সুবিচার করতে হবে। এতে আপন পরের কোন প্রশ্ন থাকবে না। ছেলে-মেয়ে, পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, দেশী-বিদেশী, শত্রু-মিত্র, স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে পার্থক্য করাও চলবে না আল্লাহর আদেশ ও বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রকৃত ঘটনা জেনে শুনে চাপা দেওয়া বা স্বার্থের বশে নীরব থাকাও অবৈধ।

হত্যার বিনিময় ঃ এবং কোন বিশ্বাসীর উচিত নহে যে, ভ্রম ব্যতীত কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে। যে কেহ ভ্রম বশতঃ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে সে জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করিয়া দিবে এবং ক্ষমা না করিলে স্বজনগণকে হত্যা বিনিময় সমর্পন করিবে। অনন্তর যদি সে তোমাদের **'শত্রু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও বিশ্বাসী হয়'**, তবে

---

১ । কোরান । । সুরা মায়েদা । আয়াত -৩৮ ।

২ । "নূর । " ২৪ ।

৩ । " । " বাকারা । " ১৭৮-১৭৯ ।

৪ । সূরা নেসা । আয়াত ১৩৫ । কোরআন ।

টীকা ঃ ১ -২ । কোরআন । সূরা নেসা । আয়াত -৯২ ।

www.pathagar.com

জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্তিদান করিবে এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে 'সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তবে তাহার স্বজনদিগকে হত্যা বিনিময় অর্পন করিবে এবং জনৈক বিশ্বাসীদাসকে মুক্তিদান করিবে; কিন্তু যদি সে উহা প্রাপ্ত না হয় তবে আল্লাহর নিকট হইতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিকক্রমে দুই মাস রোজা রাখিবে; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।"[২] (৪ ঃ ৯২)

উপরে বর্ণিত কোরআনের বাণী সমূহ হতে আমরা দেখতে পাই যে কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ কোন বিশ্বাসী মুসলমানকে হত্যা করে তা হলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার বিশ্বাসী একজন দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন সবার মাথায় এবং বিচারকদের পর্যন্ত আসবে যে, সে যুগে দাসপ্রথা আরবে প্রচলিত ছিল। তাই হত্যার বিনিময়ে বিশ্বাসী একজন দাসকে মুক্ত করলেই হত্যাকারী মুক্তিলাভ করত। কিন্তু এখন আরবেও দাস প্রথা নেই। অন্য কোন সভ্য দেশেও নেই। তাহলে বিচারক কি ব্যবস্থা নেবে?

গভীরভাবে কোরআনের বাণীগুলো বিশ্লেষণ করলে বিচারকগণ ব্যবস্থা নিতে দোদুল্যমান অবস্থায় পড়বেন না। কেননা দাসকে মুক্ত করার সঙ্গেই বলা হয়েছে-**'এবং ক্ষমা না করিলে হত্যা বিনিময় সমর্পন করিবে**। অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা বিনিময় স্বরূপ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।

কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী বিনিময়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে এই বলেঃ-

"এবং আমি তাহাদের নিমিত্ত উহার মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, **জীবনের জন্য জীবন ও চক্ষুর জন্য চক্ষু ও নাসিকার জন্য নাসিকা ও কর্ণের জন্য কর্ণ ও দন্তের জন্য দন্ত এবং সকল আঘাতের বিনিময় আছে।**"[৩] (৫ ঃ ৪৫)

'যুদ্ধ কি আল্লাহর নির্দেশ'–পরিচ্ছেদে এ মূল্যবান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছি। সুবিচার পদ্ধতি অনুসরণের জন্য এ মহাবাণী বিশেষভাবে প্রয়োজন বলেই উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম। কেননা বাইবেলের–তৌরাত অংশে ঠিক অনুরূপ বাণীই উল্লেখ করা হয়েছে যা বাইবেল অংশে লিপিবদ্ধ করেছি। বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতির প্রতিটি বিচারকের একই পন্থা অবলম্বন করার জন্যই আল্লাহর বাণী বিভিন্ন গ্রন্থে একই শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদন বিষয়ে কোন মুসলমান বিচারক তাঁর দেশে খ্রীষ্টান, ইহুদী বা হিন্দু অপরাধীর বিচারে কোরআনের এ নির্দেশ পালন করলে সুবিচারক হিসাবেই খ্যাতি লাভ করবেন এবং আল্লাহর প্রিয় হবেন। অনুরূপভাবে অন্যজাতির বিচারকও একই পন্থা অবলম্বন করলে খ্যাতি অর্জন করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্‌তে পারবে না। অন্যায় বিচার করেছেন বলেও কোন আপীল গ্রাহ্য হবে না। কেন না তাদের ধর্ম গ্রন্থেও একই নির্দেশ দান করা হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, সাংসারিক বা রাজকীয় যে কোন বিষয়েই সুবিচার করার নির্দেশেই এ মহাবাণীতে উল্লেখিত হয়েছে। এর ব্যতিক্রম করলে বিচারককে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এর উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ ও রসুলের বাণীতে। এবারে চলুন, আমরা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হতে বিচার ব্যবস্থা কিরূপ দেখে নিই।

---

৩ । কোরআন। সূরা মায়েদা। আয়াত— ৪৫।

www.pathagar.com

বাইবেল

দ্বিতীয় বিবরণ–(তৌরাত অংশ -দ্বিতীয় বিবরণ পরিচ্ছেদ। (১৯./১৬-২১) "কোন সাক্ষী যদি অন্যায়ভাবে কাহারো বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় কার্যের সাক্ষ্য দেয়, তবে সেই বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে তৎকালিন যাজকদের ও বিচারকর্তাদের সম্মুখে দাঁড়ায়। পরে বিচার কর্তারা সযত্নে অনুসন্ধান করিবে,আর দেখ, সে সাক্ষী যদি মিথ্যাবাদী হয় ও তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকে, তবে সে তাহার ভ্রাতার প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবে এরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে। তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকেরা ভয় পাইয়া তোমার মধ্যে সেরূপ দুষ্কর্ম আর করিবে না। তোমার চক্ষু দয়া না করুক; প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধ চক্ষু, দন্তের পরিশোধ দন্ত, হস্তের পরিশোধ হস্ত, পদের পরিশোধ পদ।"

যাত্রাপুস্তক

[তৌরাত অংশ ২১/১২-২৩]

"কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এমন আঘাত করে যে, তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে বধ করিতে চেষ্টা না পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পন করেন, তবে যে স্থানে সে পলাইতে পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপন করিব। কিন্তু যদি কেহ দুঃসাহস করিবার ছলে আপন প্রতিবাসীকে বধ করনার্থে তাহার উপর চড়াও হয়, তবে সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের করনার্থে তাহাকে আমার বেদির নিকট হইতেও লইয়া যাইবে।

আর যে কেহ আপন পিতাকে কি আপন মাতাকে প্রহার করে। তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

আর যদি কেহ কোন মনুষ্যকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার হস্তে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

আর যে কেহ আপন পিতাকে কি আপন মাতাকে শাপ দয়ে তাহার প্রানদণ্ড অবশ্য হইবে।

আর মনুষ্যেরা বিবাদ করিয়া একজন অন্যকে প্রস্তরাঘাত বা মুষ্টাঘাত করিলে সে যদি না মরিয়া শয্যাগত হয়, পশ্চাৎ উঠিয়া ষষ্টি অবলম্বন করিয়া বাইরে বেড়ায়, তবে সেই প্রহারক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে না। কেবল তাহার কর্মক্ষতির ও চিকিৎসার ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে।

আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু সে যদি দুই একদিন বাঁচে, তবে তাহার প্রভু দণ্ডাই হইবে না, কেননা সে তাহার রৌপ্য স্বরূপ।

আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপদ না ঘটে,তবে ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুসারে তাহার অর্থদণ্ড অবশ্য হইবে ও সে বিচারকদের বিচার মতে টাকা দিবে। কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তোমাকে এই পরিশোধ দিতে হইবে। প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশেধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা।

আর যে কেহ আপন দাস কি দাসীর চক্ষুতে আঘাত করিলে যদি সে চক্ষু নষ্ট হয়, তবে

www.pathagar.com

তাহার চক্ষুনাশের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে। আর আঘাত দ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐ দন্তের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে।"

যে কেহ গরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ করে, কিম্বা বিক্রয় করে, –সে এক গরুর পরিবর্তে পাঁচ গরু ও এক মেষের পরিবর্তে চার মেষ দিবে।

"আর চোর যদি সিঁদ কাটিবার সময় ধরা পড়িয়া আহত হয় ও মারা পড়ে তবে তাহর জন্য রক্তপাতের দোষ হইবে না। যদি তাহার উপরে সূর্য উদিত হয় তবে রক্তপাতের দোষ হইবে। ক্ষতিপূরণ করা চোরের কর্তব্য; যদি তাহার কিছু না থাকে তবে চৌর্য্য হেতু সে বিক্রিত হইবে। গরু, গর্দভ বা মেষ চুরির কোন বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবন্ত পাওয়া যায়, তবে সে তাহার দিগুণ পাইবে।

যদি কেহ শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে পশুচরায়, আর আপন পশু ছাড়িয়া দিলে যদি তাহা অন্যর ক্ষেত্রে চরে, তবে সে ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের উত্তম ফল দিয়া পূরন করিবে।

অগ্নি ধরিয়া কণ্টক বনে লাগিলে যদি কাহারো শস্যরাশি কিম্বা শস্যের ঝাড় কিম্বা ক্ষেত দগ্ধ হয়, তবে সেই দাহকারী অবশ্য ক্ষতি পূরণ করিবে। যে কেহ মূদ্রা কিম্বা জিনিস পত্র আপন প্রতিবেশীর কাছে গচ্ছিত রাখিলে যদি গৃহ হইতে কেহ তাহা চুরি করে এবং সেই চোর ধরা পড়ে তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। যদি চোর ধরা না পড়ে তবে গৃহস্বামী প্রতিবেশীর দ্রব্যে হাত দিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনীত হইবে।" যাত্রাপুস্তক-২২/১-৮]

"তুমি অন্যায় বিচার করিবে না, কাহাকেও মুখাপেক্ষা করিবে না ও উৎকোচ লইবে না; কেননা উৎকোচ জ্ঞানীদের চক্ষু অন্ধ করে ও ধার্মিকের বাক্য বিপরীত করে। সর্বোতভাবে যাহা ন্যায্য, তাহারই অনুগামী হইবে, তাহাতে তুমি জীবিত থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দণ্ডাদেশ অধিকার করিবে।

"প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দুই সাক্ষীর কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে হইবে। একমাত্র সাক্ষীর প্রমাণে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না। তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষীরা, পশ্চাতে সমস্ত প্রজা তাহার উপরে হাত উঠাইবে। এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"

"রক্তপাতের কিম্বা বিরোধের কিম্বা আঘাতের বিষয়ে দুই জনের বিবাদ তোমার কোন নগর দ্বারে উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিচার তোমার পক্ষে অতি কঠিন হয়–তবে তুমি উঠিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে যাইবে; আর লেবীয় যাজকদের ও তৎকালিক বিচারকর্তার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাতে তাহারা তোমাকে বিচার আজ্ঞা জ্ঞাত করিবে। তুমি সেই আজ্ঞার মর্মানুসারে কর্ম করিবে। তাহারা তোমাকে যাহা শিক্ষা দিবে সমস্তই যত্নপূর্বক করিবে। তাহারা তোমাদের যে ব্যবস্থা শিক্ষা দিবে তাহার মর্মানুসারে ও তোমাকে যে বিচার বলিবে তদনুসারে তুমি করিবে; তাহাদের আদিষ্ট বাক্যের দক্ষিণে কি বামে ফিরিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃসাহস পূর্বক আচরণ করে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরিচর্যার্থে সেই স্থানে দণ্ডায়মান যাজকের কিম্বা বিচার কর্তার কথায় কর্ণপাত না করে, সেই মনুষ্য হত হইবে; ফলে তুমি ইস্রাইলের মধ্যে হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"

"তোমাদের বিচারকদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম।–

তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের কথা শুনিয়া বাদীর ও তাহার ভ্রাতার কি সহবাসী বিদেশীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিও। তোমরা বিচারে কাহারো মুখাপেক্ষা করিবে না; সমভাবে ক্ষুদ্র ও মহান উভয়ের কথা শুনিবে; মনুষ্যের মুখ দেখিয়া ভয় করিবে না, কেননা বিচার ঈশ্বরের; এবং যে কথা তোমাদের পক্ষে কঠিন তাহা আমার কাছে আনিবে। আমি তাহা শুনিব।"

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ও বিচারকের বিচার

একটি রাষ্ট্রের শাসনভার যার উপর অর্পিত হয় তাঁকেই রাষ্ট্রপতি বলা হয়। তিনি হলেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এ জন্যই তাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক। রাষ্ট্রের জনসাধারণ থেকে আরম্ভ করে, রাষ্ট্রের উন্নতি, অবনতি, অর্থনীতি, যোগাযোগ, কল্যাণ-অকল্যাণ এমনকি সৃষ্টিজীব পর্যন্ত তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ নিজেই তাঁকে মনোনীত করেন ও দায়িত্ব অর্পন করেন। একথা আমরা তাঁর মহাবাণী হতেই দেখতে পাই এই বলে!-

"তুমি বল,-হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্-তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব প্রতিগ্রহণ কর; তোমারই হস্তে কল্যাণ; নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়োপরী -শক্তিমান।"[১] (৩ ঃ ২৬)

উপরে বর্ণিত মহাবাণী হতে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত গৌরব, সমস্ত রাজ্য, সমগ্র মান-সম্মান, গৌরব ও মহাশক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তাঁর মহান ইচ্ছাতেই একজন গৌরবান্বিত হন, শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অধিকারী হন। আবার তিনিই তাঁর এ সম্মান, গৌরব ও প্রতাপকে মুহূর্তের মধ্যেই প্রতিগ্রহণ ক'রে লাঞ্ছিত করতে পারেন। এর বাস্তব প্রমাণ আমরা কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস থেকেই দেখতে পাই।

আদ-সমূদ, কারুণ-ফেরাউন, সাদ্দাদ-নমরুদ, নাদির হিটলার -মুসলিনি, চেঙ্গিশ খাঁ, নেবুকটস, প্রভৃতি দাম্ভিক ও অত্যাচারী রাষ্ট্রপতি ও শাসকদের ইতিহাস কে না জানে। তাদের প্রতাপ, শক্তি, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য, বাহাদুরী এ পৃথিবীর বুকেই শেষ হয়েছে চরম লাঞ্ছনা, অপমান ও কষ্টের মাধ্যমে। তাদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, শোষণ, নির্যাতন, ধর্মদ্রোহিতা, পাশবিকতা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। মানবকুলকে ধিকৃত করেছে। দেশ ও সমাজকে নিপাত করেছে। ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে।

এইত আমাদের জীবনেই দেখলাম। আয়ুব-ইয়াহিয়ার তাণ্ডবলীলা। ক্ষমতার লোভে আয়ুব খান পাক রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মীর্জাকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে গদিচ্যুত করলেন। দেশ থেকে তাড়ালেন। অনাচার-অবিচার ও স্বৈরাচারী নীতিতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের; বাক-স্বাধীনতা হরণ করার কুচক্রী নীতি অবলম্বন করলেন ভাষানী-ও শেখ মুজিবকে ন্যায়-দাবীর অপরাধে জেলে পুরলেন। হত্যার ষড়যন্ত্রে মিথ্যা মামলা রুজু করলেন। বাঙ্গালাদেশীদের চিরতরে গোলাম করে রাখবার পাষণ্ড নীতি রচনা করলেন। পারলেন কি টিকে থাকতে? আজীবন প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকার যে কৌশল অবলম্বন করলেন তা কি বাস্তবে রূপায়িত হলো? সাড়ে-সাত কোটি মানুষের সুপ্ত রোষানল আয়ুবের পাষাণ প্রাণ পুড়ে ছারখার করে দিল। বলতে বাধ্য হলেন-'এই আমার শেষ ভাষণ। প্রেসিডেন্ট পদ আজ থেকে ছেড়ে দিলাম।' যে নাটকীয় ভঙ্গিতে সিংহাসন দখল করেছিলেন-ঠিক অনুরূপ ভঙ্গিতেই ইয়াহিয়া-বন্দুকের নল দেখিয়ে আয়ুবের তখত-তউস দখল করলেন। মদ্যপায়ী, পাষণ্ড, অধার্মিক, জুলুমবাজ ও রাষ্ট্রনেতা 'নেবুকটস্‌কেও'-হার মানালেন ত্রিশ-লক্ষ বাঙ্গালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ষাট হাজার গ্রাম বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে। দু-লক্ষ নারীর ইজ্জতকে হরণ করে! টিকে থাকতে পারলেন কি? বন্দী জীবনের অসহ্য জ্বালা তাঁকে কি পাগল করে নি? অপমান, অপদস্ত, তিরস্কার ও লাঞ্ছনার কঠিন শাস্তি হতে কি নিস্তার পেয়েছিলেন? আল্লাহর বাণী দেখুন কত সত্য-যা এ পৃথিবীর বুকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

টীকা ঃ ১ । কোরআন , সূরা-আল এমরান। আয়াত-২৬।

www.pathagar.com

এবার চলুন দেখি? এ অত্যাচারী পাষণ্ড রাষ্ট্রপতিদের পরকালের বিচারে সাজা কিরূপ!

এ মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যিনি ইহকাল ও পরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা,–যাকে দৃশ্য -অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞানদান করা হয়েছে, বিচার-দিবস, কিয়ামত দিবস, উত্থান দিবস ও বেহশত-দোজখ-এর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে–যাঁর বাণীতে কোন ভুল নেই, বিভ্রান্তের বিষয় নেই তিনি এ দুষ্কৃতিকারী, –স্বার্থান্বেষী ধর্মদ্রোহী বিচারকদের বিচার-দিবসের পরিনাম ব্যক্ত করে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে–

(১) "রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য আফসোস। 'বিচার দিনে তাহাদিগকে তাহাদের কেশগুচ্ছ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইবে। কেননা তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অবহেলা করিত।"[১]

(২) "যে ব্যক্তি অন্তঃত দশজন ব্যক্তির উপরও কর্তৃত্ব লাভ করে কিয়ামত দিনে তাহার হস্ত শিকল দ্বারা বাধিয়া মহাবিচারকের সম্মুখে বিচারার্থে আনয়ন করা হইবে। বিচারে সে ব্যক্তি পুণ্যবান অর্থাৎ যথারীতি কর্তব্য সম্পাদনকারী বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।"[২]

(৩) "যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছে, কিয়ামতের তিন তাহার গলায় শিকল পরা অবস্থায় সে উত্থিত হইবে। তাহার হাত তাহার নিজের গর্দানের সহিত বাধা অবস্থায় থাকিবে আহাকে এই অবস্থা হইতে একমাত্র তাহার নিজ আমলই মুক্ত করিতে পারিবে। অথবা তাহার কৃত গুণাহ তাহাকে ধ্বংস করিবে। নেতৃত্বের প্রথম অবস্থায় নিন্দা ও তিরস্কার, মধ্যম অবস্থায় লজ্জা, পরিশেষে লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিতে হয়।"[৩]

(৪) হজরত হোযাইফা হতে বর্ণিত –তিনি বলেছেন–"আমি রসুলুল্লাহ্কে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছিঃ–

'কিয়ামতের দিন সুবিচারক এবং অত্যাচারী সর্বপ্রকার শাসনকর্তাদিগকে একত্র করিয়া পুলসেরাতের উপর দাঁড় করান হইবে এবং আল্লাহ্ পুলসেরাতকে নির্দেশ দিবেন একবার ইহাদিগকে ঝাঁকি দাও; যাহারা বিচার মীমাংসায় জুলুম করিয়াছিল কিম্বা ঘুষ গ্রহণপূর্বক অন্যায় বিচার করিয়াছিল একপক্ষের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল এবং অপর পক্ষের কথা শ্রবণ করে নাই সেই ঝাঁকিতে তাহারা পুলের ওপর হইতে ছিট্কাইয়া দোজখে পতিত হইবে এবং সত্তর বছর ধরিয়া পুড়িতে পুড়িতে দোজখের গভীরতম গহ্বরে যাইয়া ঠেকিবে। উহাই হইবে তাহাদের বাসস্থান।"[৪]

(৫) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেনঃ–

"যে ব্যক্তি দুইজন লোকের বিচার করিতে গিয়া তাহাদের উপর অন্যায় করে তাহার প্রতি আল্লাহর লানৎ হউক। আরও বলেছেন–কিয়ামতের দিন পরম করুনাময় আল্লাহ্ ক্রোধভরে তিন প্রকার লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না (১) মিথ্যাবাদী শাসনকর্তা (২) ব্যভিচারী বৃদ্ধ লোক (৩) গর্বিত ও দর্পকারী ফকির। অতঃপর তিনি সাহাবাদের বলিলেন–**অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যগুলি তোমাদের কবলে আসিবে এবং** তথাকার শাসনকর্তাগণ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকিবে পরহেজগারী অবলম্বন করিবে এবং আমানত রক্ষা করিবে তাহারা অবশ্যই বেহশতে প্রবেশ করিবে।

তিনি আরও বলেনঃ–আল্লাহতায়ালা যে শাসনকর্তার হস্তে প্রজাপালনের ভার অর্পন করিয়াছেন–সে যদি প্রজার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সস্নেহে প্রজাপালন না করে আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশতের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবেন।

টীকা ঃ ১ ও ২ কিমিয়ায়ে সাআদাত–পৃঃ নং ২৮। ৩নং মেশকাত শরীফ। থাং নং ৮৮৮১৭।
টীকা –৩ হতে ৫। হাদিস। সংগৃহীত কিমিয়ায়ে সাআদত–মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ)। ২য় খণ্ড

www.pathagar.com

তিনি পুনরায় বলেনঃ–আল্লাহ্ যাহাকে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব দান করিয়াছেন–সে যদি ঠিক নিজের পরিবারবর্গের ন্যায় স্নেহ ও যত্নের সহিত মুসলমান প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করে তবে তাহাকে বলিয়া দাও সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া লয়।"[৫]

"সেদিন সদাপ্রভু ঊর্ধ্বলোকে ঊর্ধ্বলোকীয় সৈন্যসামন্তকে ও পৃথিবীতে পার্থিব রাজগণকে প্রতিফল দিবেন। তাহারা তাহাতে কূপে একত্রিকৃত বন্দীগণের ন্যায় একত্রীকৃত হইবে ও কারাগারে বদ্ধ হইবে, পরে অনেকদিন গত হইলে তাহাদের তত্ত্ব লওয়া যাইবে। আর চন্দ্র ও সূর্য লজ্জিত হইবে; কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু সিয়নপর্ব্বতে ও যেরূশালেমে রাজত্ব করিবেন; এবং তাঁহার প্রাচীনবর্গের সম্মুখে প্রতাপ থাকিবে।" বাইবেলঃ তৌরাত অংশ যিশাহর পরিচ্ছেদ ২৩২১।

ন্যায়-বিচারক মুহাম্মদ (দঃ)

বিশ্বের বুকে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)–ন্যায়-বিচারের যে আদর্শ রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল। আল্লাহ্ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন এই বলে–**'তুমি বল, আমি তোমাদের মধ্যে সুবিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।** [সূরা শুরা আঃ- ১৫ 'সুবিচার-পরিচ্ছেদে'-এর উল্লেখ রয়েছে।]

দয়া-মায়া, প্রেম-ভালবাসা, ধৈর্য-বিশ্বাস, মানবতা, অমায়িকতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার; রীতি-নীতি, ভদ্রতা-সহনশীলতা, সুবিচার-শিষ্টাচার, আল্লাহ্-প্রেম, সৃষ্টজীবে প্রেম—এক কথায় বলতে হয় বিশ্ব-প্রেমে সৃষ্ট এ মহামানব যার খ্যাতি শুধু আরবেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশ, জাতি, মানব-দানব, জ্বীন-এনসান, এমনকি ফেরেশতাকুলেও ব্যাপৃত। তাই জয়ধ্বনি উঠে আকাশে বাতাসে, পাতালে সলিলে, সৃষ্টিসেরা মুহাম্মদ (দঃ), বিশ্ব নবী মুহাম্মদ, নবী সর্দার মুহাম্মদ (দঃ), রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (দঃ), বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ), মানবকুলের মুহাম্মদ (দঃ), ন্যায়-বিচারক মুহাম্মদ (দঃ)। আমি মুসলমান হিসাবেই তাঁর এসব অশেষ ও অসাধারণ গুণের কথা বলেই তৃপ্তি লাভ করছি না–বিজাতীয় ধর্মপ্রাণ–মণীষী ও লেখকগণও ধন্য হচ্ছেন তাঁর সুমধুর আচরণ, কোমলতা, ভাষার মধুরতা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করেছেন তাঁর মহাবাণীতে এই বলেঃ-"অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-চিত্ত; এবং যদি তুমি কর্কষভাষী-কঠোর হৃদয় হইতে, নিশ্চয় তাহারা তোমার সংসর্গ হইতে অন্তর্হিত হইত। অতএব তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; এক, তাহাদের সহিত কার্য সম্বন্ধে পরামর্শ কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করিয়াছ, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন। [৩ঃ১৫৯][১]

আল্লাহর এ মহাবাণীর প্রতিটি অক্ষরই তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন জীবনভর। আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফীয়ান; তায়েফবাসীদের অবর্ণনীয়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও জুলুম, নির্যাতন, অবিচার ও পশু প্রবৃত্তির আচরণ নীরবে সহ্য করেছেন। প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন দিন প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করেন নি। উপরন্তু শত্রুকেও আপন চোখে দেখেছেন। তাদের সেবায় রত হয়েছেন। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন। কোমল চিত্তে ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এ ইতিহাস সবাই জানে। বিশ্বমণীষী ও ঐতিহাসিকরাও তাঁর মহান জীবন-চরিত্রে তুলে ধরেছেন–এ সব

টীকা ঃ ১ । সূরা আল ইমরান আয়াত ১৫৯।

www.pathagar.com

কথা। আমি পূর্বোক্ত 'যুদ্ধ-পরিচ্ছেদে' সামান্য কয়েকটি উদাহারণ তুলে ধরেছি মাত্র।

চলুন, এবার তাঁর মুখ নিসৃত পবিত্র বাণী হতে কয়েকটি প্রামাণ তুলে ধরছি।

(১) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে–

"রসুলুল্লাহ্ (সঃ) জি'রানে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বণ্টন করিতে ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল,–ন্যায় বিচার করুণ'। তিনি বলিলেন–'আমি যদি ন্যায় বিচার না করিয়া থাকি, তবে তুমি হতভাগ্য।"[১]

(২) মিকদাদ বিন-আমর-কিদি-বনু যোহরার গোত্রবদ্ধ ছিলেন এং বদরে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন–"আমি রসুলুল্লাহ্কে (সঃ) বলিলাম, 'বলুন তো–যদি আমার সাক্ষাৎ হয় কোন কাফেরের সহিত এবং আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি আর সে তরবারির আঘাতে আমার এক হাত কাটিয়া ফেলে তারপর এক গাছের আড়ালে গিয়া (ভয়ে) বলে, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম খোদার-ওয়াস্তে, আমি কি তাহাকে মারিব উহা বলিবার পরে? রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলিলেন, 'মারিও না তাহাকে'। কেননা যদি তুমি মার তাহাকে তাহার স্থান হইবে যে স্থানে তুমি ছিলে তাহাকে মারিবার পূর্বে, আর তোমার স্থান হইবে যে স্থানে সে ছিল সে যে বাক্য বলিয়াছে তাহা বলিবার পূর্বে।"[২]

এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূরা নেসার ৯২ নং আয়াতে যা সুবিচার পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি–প্রথম আয়াতে যেখানে বলা হয়েছ–'এক, কোন বিশ্বাসীর উচিত নহে যে–ভ্রম ব্যতীত কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে.....।'

(৩) উপরে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ একই বিষয়ে আরও দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বিশ্বাসী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। রসুলের (দঃ) বাণী অবজ্ঞা করলে কি অবস্থা হতে পারে এ ঘটনা দুটো তা শিক্ষা দেবে। সাবধান করে দেবে। মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টিলাভ করে চিরস্থায়ী সুখের আবাস তৈরি করবে।

(ক) হযরত উসামা-বিণ-যায়েদ এক বিধর্মীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বিধর্মীকে কাবু করে ফেলেন। তখন সেই বিধর্মী–'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্–উচ্চারণ করে। তিনি তা সত্বেও তাকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে এই নিয়ে হযরত উসামার মনে ব্যথার উদ্রেক হলে তিনি পুরা ঘটনা হযরত (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে হুজুর (সঃ) মর্মান্তিকভাবে ব্যথিত হন। তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন যে–'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'–পড়া সত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? উসামা উত্তর দিলেন যে–সে মৃত্যুভয়ে কলেমা পড়ছিল। তখন হুজুর বললেন –তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ? আর এই কথা হুজুর (সঃ) বার বার পুনরাবৃত্তি করলেন। হুজুর (সঃ)-এর বেদনার অবস্থা দেখে উসামা (রাঃ) বলেন যে ('হায় যদি আমি এর আগে মুসলমান না হতাম তাহলেই ভাল হতো'।[১] (মুসলিম কিতাবুল ঈমান)

(খ) হযরত ইমাম সুইউতি (আলাইহের রহমত)-এর পুস্তক 'খাসায়েসুল কুবরা'-এর (দ্বিতীয় খণ্ড ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা –প্রকাশক মকতুবা নুরীয়া লায়েলপুর)–বাব মুজেযাতুন ফিমান মাতা ওয়া' লাম তাকবেলুহুল আরজু অধ্যায়ের একটি ঘটনা চিন্তার যোগ্য যে–হুজুর (সঃ)-এর সময়ে এক যুদ্ধে একজন মুসলমান এক মুশরেককে পরাভূত করে তরবারী নিয়ে হত্যার জন্য উদ্যত হলে সে তাৎক্ষণিকভাবে-'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে। কিন্তু এ মুসলমান ব্যক্তি (হত্যা হতে) বিরত হল না, –তাকে হত্যা করল। অতঃপর তার হৃদয়ে

টীকা ঃ ১ –২ হাদিস। সহীহ বুখারী তজরীদ। জিহাদের মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদ। হা নং ১২৩/১৫২। তর্জমাঃ আঃ রহমান খান।

১ –(ক) -(খ) মুসলিম কিতাবুল ঈমান ও কাসায়েসুল কুবরা–২য় খণ্ড সংগৃহীত পাক্ষিক আহদী–১৫ই ডিসেম্বর/১৯৯১ ইং

www.pathagar.com

বিষয়টি সম্বন্ধে ব্যাকুলতা বাড়ল এবং তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা হুজুর (সঃ)-কে শুনালেন। সবিস্তারে শোনার পর হুজুর (সঃ) বললেন–'তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে?' যখন সেই হত্যাকারী মুসলমানের মৃত্যু হলো তাকে কবর দেওয়ার পরবর্তী দিন দেখা গেল যে,–তার মৃত দেহটি কবরের বাইরে পড়ে আছে। তার আত্মীয়স্বজনগণ হুজুরের (সঃ) নিকট এ বিষয়টি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন–তাকে আবার দাফন করে দাও। দ্বিতীয়বার দাফন করার পর পরবর্তী দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। তাকে তৃতীয়বার দাফন করার পরও দেখা গেল কবর তাকে গ্রহণ করল না। রসুল (দঃ) বললেন 'ওকে কূপে ফেলে দাও'। অতঃপর হুজুর (সঃ) বললেন,–

"মাটি তার চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা এই ব্যক্তিকে তোমাদের জন্য শিক্ষার উদাহরণ স্বরূপ এরূপ করেছেন যাতে পরবর্তীতে তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন কলেমা পাঠকারীকে অথবা যে নিজেকে মুসলমান দাবী করে এমন ব্যক্তিকে হত্যা না করে।"[১]

উপরে বর্ণিত হাদিসটি হতে প্রতিটি দেশের প্রতিটি রাষ্ট্রপতি ও বিচারকদের জন্য রয়েছে সাবধান বাণী। নিজ স্বার্থের খাতিরে আমরা এ সব তত্ত্বমূলক নির্দেশ মানি না। গদী রক্ষার্থে আমরা কি না ক'রে থাকি? শত শত দেশ প্রেমিক সৈন্যদের হত্যা করে বাহাদুরী দেখাই। আপন ভাইকে হত্যা করে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করি। এক দেশের মুসলিমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হরণ করি। মা-বোনের সতীত্বের মাথায় কুঠারাঘাত ক'রে জাতির নেতা হবার দুরভিসন্ধিতে মেতে উঠি। কাউকে বিদেশীর চর, কাউকে দেশদ্রোহী, কাউকে পার্টির শত্রু মনে করে জীবন নাশ করার কৌশল অবলম্বন করি শুধু নিজ স্বার্থে। ধর্মের স্বার্থে নয়। মানবতার স্বার্থে নয়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে নয়। এর দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষেই দেখে আসছি বিগত কয়েক যুগ ধরে আমাদেরই এ পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে। অথচ চিন্তা করি নি এ অন্যায়ের প্রতিশোধ কি হবে। বিচারের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে কি জবাব দেবে?

মহানবী (সঃ) বিচারের ক্ষেত্রে আপন-পর, দেশী-বিদেশী, আত্মীয়-স্বজন বা নিজদলীয় প্রিয়জনদের স্বার্থে কোন ভেদাভেদ করেন নি। আইনের ঊর্ধ্বে তাঁদের স্থান দেন নি। ন্যায় বিচারক হিসাবে বহু দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন–যা ঐতিহাসিকগণ চিরদিন তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং করবেন। আমরা যদি এ মহানবীর আদর্শকে সম্মুখে রেখে বিচার করতাম তাহলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হতো না। আপন পরে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে খুনোখুনি হতো না। চলুন, রসুলুল্লাহ্ (দঃ)- ন্যায় বিচারের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নিই।

(৪) হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

"মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করিয়াছিল। যাহাতে কোরেশগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা বলিল, (পরস্পরের মধ্যে)–কে রসুলুল্লার (দঃ) নিকট এই ব্যাপারে সুপারিশ করিবে? আবার তাহারাই বলিল,–উসামা-বিণ-যায়েদ ব্যতীত কে এই ব্যাপারে সাহস করিবে? কারণ, সে হইল রসুলুল্লাহর (দঃ) অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর সে (তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী)–হুজুর (দঃ) সমীপে এ ব্যাপারে আলোচনা করিল। তাহার কথা শুনিয়া রসুলুল্লাহ্ (দঃ) ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া) বলিলেন,–"তুমি কি আল্লাহ্‌র দণ্ডবিধি হইতে একটি ব্যাপারে সুপারিশ করিতেছ?" অতঃপর তিনি দাঁড়াইলেন এবং ভাষণ দিয়ে বলিলেন–

www.pathagar.com

"হে জনগণ! জানিয়া রাখ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকগণ এই আচরণের কারণেই ধ্বংস হইয়াছে যে–যখন তাহাদের মধ্যে কোন ভদ্র-সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করিত তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিত। আর যখন তাহাদের মধ্যে কোন অসহায় দুর্বল লোক চুরি করিত তখন তাহার উপর দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করিত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার হাত কাটিয়া দিতাম।"[১]

(৫) একান্ত আপন জন হযরতের (দঃ) চাচা–আব্বাস ও তদীয় জামাতা আবুল আসের বদর যুদ্ধে বন্দী হিসাবে ধৃত হন। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) অন্যান্য বন্দীদের ন্যায় তাদের সঙ্গে একইরূপ ব্যবহার করার জন নির্দেশ দেন এবং বলেন,

"খোদার কসম! অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় এদের প্রতি যেন কোন বাড়তি সুযোগ দেওয়া না হয়।"

জানিনা কয়জন রাজা-বাদশা বা শাসনকর্তা বিচার ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বিধর্মী, কাফের ও শত্রুদের বিচার ক্ষেত্রেও কোন পক্ষপাতিত্ব করেন নি। বন্দীদের সমানভাবে ব্যবহার, খাওয়া ও যত্ন নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রক্তপণ ও মুক্তিপণে ছেড়ে দেবার নির্দেশও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে নিজ আত্মীয়দের জন্য স্পেশাল কোন সুযোগ দেন নি। মুক্তি-পণের একটি দেরহামও কম করতে নির্দেশ দেন নি। উপরে বর্ণিত তাঁর চাচা হযরত আব্বাসের জন্য মুক্তিপণ মাফ করার জন্য এক আনসারী রসুলুল্লার (দঃ) নিকট এই সুপারিশ করলঃ-

"হে রসুলুল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তি-পণ ছাড়িয়া দেই।"

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বললেনঃ-

"একটি দিরহামও ছাড়িও না তাহা হইতে।"[২] কেমন পক্ষপাতহীন বিচার! কি ন্যায় বিচারক! এমনকি আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁর মহাবাণীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন–এই বলে,–**'তুমি বল, আমি সুবিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'**

আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ-

"হুনাইনের যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) কতক লোককে প্রাধান্য দিলেন বণ্টনে। আক্‌রা-ইবনে হাবিসকে দিলেন একশত উট। উইয়ানাকে দিলেন ঐরূপ (একশত উট) এবং আরবের ভদ্রদের মধ্যেও কতককে দিলেন। এইরূপে তিনি প্রাধান্য দিলেন সেইদিন বণ্টনে। তখন এক ব্যক্তি বলিল, –'কসম খোদার এই বণ্টনে ন্যায় -বিচার করা হয় নাই [বা উদ্দেশ্য করা হয় নাই খোদার সন্তুষ্টি]। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম,

'আমি নিশ্চয় রসুলকে (দঃ) একথা জানাব। তারপর আমি তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে জানাইলাম। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন,

'কে ন্যায় বিচার করিবে যদি খোদা ও তাঁহার রসুল না করে?'[১]

হুনাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানগণ অসংখ্য পশু ও ধনসম্পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এগুলো রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হতে সবার মধ্যে বণ্টন করেছেন। তাদের মধ্যে যারা জীবন

টীকা ঃ ১ । হাদিস–মেশকাত শরীফ। ৭৬ তম খণ্ড। তর্জমা–এম. আলতাফুন -কায়সার। হা নং ৪৩২১/১ পৃঃ নং –১৩৭।

টীকা –২ । হাদিস । সহীহ বুখারী [তজরীদ]। অনুবাদ পূর্বে বর্ণিত। জেহাদ পরিচ্ছেদ। হা নং –৯৯/১২৮। পৃঃ নং –১৩৩।

টীকা –১ । পূর্বে বর্ণিত–সহীহ বুখারী [তজরীদ] আঃ নং ১৩০/১৫৯।

www.pathagar.com

মরণ পণ করে যুদ্ধ করেছিলেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন–যুদ্ধ -লব্ধ মাল বণ্টনে তাদের প্রাধান্য দেওয়াই ন্যায় বিচারের মাপকাঠি। এ ছাড়া সবাইকে সমান অংশে বিভক্ত করে দিলে সেটাকে ন্যায় বিচার বলা যেত না। যার যতটুকু প্রাপ্য কর্তব্য অনুযায়ী ততোটুকু বণ্টনই সুবিচার। এটা পক্ষপাতিত্যের উর্ধ্বে। আইনের উর্ধ্বে নয়। এ নিয়ে বেদুইনদের মধ্যে একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু লোক হুজুরকে (দঃ)–বল্‌ল–'অশ্রাব্য ভাষায়,

'আমাদেরকে কিছু দিন। আমরা আপনার বাপের মাল চাচ্ছি না। আল্লাহর মাল চাচ্ছি।'

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন এরূপ অশ্লীল ভাষা সহ্য করেও। এরপর বললেন,–

"যদি আমার কাছে থাকিত এই 'ইযাহ গাছের'[২] সমান সংখ্যক উট ছাগলাদি, তবে আমি বাটিয়া দিতাম তাহা তোমাদের মধ্যে; তোমরা আমাকে পাইতে না কৃপণ বা মিথ্যাবাদী বা কাপুরুষ।"[৩]

"হে আবুযর! আমার ইহা পছন্দনীয় নয় যে আমার কাছে ওহদ পাহাড়ের সমতুল্য স্বর্ণ জমা হবে আর তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমার কাছে উহা এক দিনারও অবশিষ্ট থেকে যাবে। হে আবুযর এরকম হলে আমি ঐ সম্পদকে উভয় হাতে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বণ্টন করেই সেখান থেকে উঠব।"[৪]

ব্যভিচারের শাস্তিঃ-

(৭) বুরাইদা (রা) বলেন,–

একদা মাইয়িয-বিন-মালেক (রাঃ) রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) নিকট আসিয়া বলেন–'ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমাকে পবিত্র করুন।' তিনি বলিলেন–"আক্ষেপ তোমার প্রতি, চলিয়া যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর।"

বর্ণনাকারী বলেন, –তিনি চলিয়া গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে যাইয়াই পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আবার বলিলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমাকে পবিত্র করুন।' নবী (সঃ) এবারও তাহাকে পূর্বের ন্যায় বলিলেন। এইভাবে তিনি যখন চতুর্থবার আসিয়া বলিলেন তখন রসুলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ-

"আচ্ছা আমি তোমাকে কোন্ জিনিস হইতে পবিত্র করিব?" তিনি বলিলেন যিনা হইতে। তাঁহার কথা শুনিয়া রসুলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন (সাহাবীদের)ঃ–'এই লোকটি কি পাগল?'

লোকেরা বলিল–'নাতো'–সে পাগল নয়।' তিনি আবার বলিলেন, –'লোকটি কি মদ পান করিয়াছে?'

তৎক্ষণাৎ একব্যক্তি দাঁড়াইয়া তাহার মুখ শুকিয়া দেখিল কিন্তু মদের কোন গন্ধ তাহার মুখ হইতে পাইল না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ)–তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি কি সত্যই যিনা করিয়াছ?'

সে বলিল, -'জি-হাঁ।'

ইহার পর রসুলুল্লাহ্ (দঃ)–তাহাকে 'রজম'–এর নির্দেশ দিলেন তখন তাহাকে 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে নিহত) করা হইল।

২। এক রকমের কাটা গাছ।

৩-৪। হাদিস। সহীহ বুখারী [তজরীদ]। হাঃ নং ১২৮/৫৭ এক পর্যায়ে তিনি হযরত আবুযর গেফারীকে (রাঃ) বলেনঃ

www.pathagar.com

এই ঘটনার দুই তিন দিন পর রসুলুল্লাহ্ (দঃ) সাহাবাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,–'তোমরা মায়েজ-বিন-মালেকের জন্য ইসতিগফার কর–অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা সে এমন তওবাই করিয়াছে, যদি উহা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করিযা দেওয়া হয় তবে উহা সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।"[১]

উপরে বর্ণিত হাদিসটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিচারকগণ ন্যায় বিচারে সুষ্ঠু পদ্ধতি খুঁজে পাবেন। অপরাধকারী নিজেই স্বীকার করছে যে–সে যিনা করেছে। এটা সাধারণ মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। অন্যায় ক'রে কেউ স্বীকার করে না। নিজকে বাঁচাতে চায় সে যত বড় শিক্ষিত বা পদমর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন। যারা একান্তই ধার্মিক, খোদা-ভীরু, আর পরকালে বিশ্বাসী তারাই মাত্র নিজের অনায়কে স্বীকার করে। মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে এবং পাপ হতে মুক্তি পাবার জন্য তওবা করে। অনুশোচনা ক'রে চোখের জলে বুক ভাসায়। আর মুক্তির আশায় হাত তুলে খোদার কাছে মাফ চায়।

যিনার অপরাধে 'রজম' বা প্রস্তরাঘাতে নিহত হবার বিধি জেনে কেউ অপরাধ করেও তা গোপন রাখে। স্বীকার করে না নিজকে অভিযুক্ত করতে। এ জন্যই এ অপরাধে দণ্ডিত করতে প্রত্যক্ষদর্শীর তিনজন সাক্ষী প্রয়োজন। এ সাক্ষীর অভাব হলে তকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না –কোরআনের বিধি অনুযায়ী।

পাগলের স্বভাব সৎ-অসৎ উভয় শ্রেণীর মানুষ হতে ভিন্নতর। হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা; কি সব বলে, তার বুঝবার ক্ষমতা থাকে না। কথায় আছে–'পাগলে কি না বলে আর ছাগলে কি না খায়'। এ জন্য তার কথায় বিচার করা যায় না। এ জন্যই রসুলুল্লাহ্ (দঃ)–উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন 'লোকটি পাগল নয়তো?' তখন সবাই সাক্ষ্য দিল যে অপরাধী পাগল নয়। তখন তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, লোকটি মদ্যপায়ী কিনা। মদ্যপায়ীরা পাগলের পূর্ণস্বভাব না পেলেও আংশিক অংশ কিছু সময়ের জন্য পেয়ে থাকে। তাই মা-বাবা, ভাই-বোন,আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞানী-গুণীর মর্যাদা ও সম্মান বুঝতে পারেন। যাকে যা খুশি বলে থাকে। মান-ইজ্জত, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা থাকে না। অন্যায়-অত্যাচার, খুন-জখম, জুলুম-ব্যভিচার প্রভৃতি অপকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না। এ অবস্থায় তারা যে অন্যায় করে সে অন্যায়ের জন্য জেল, ফাঁসী বা 'রজম' করে শাস্তি দেবার বিধান নেই। এ জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) এক সাহাবীকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে বললেন–সে অপরাধী সত্যিই মদ্যপান করেছে কিনা। যখন এ গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় জনতার নিকট জান্‌তে পারলেন যে-সে পাগল নয়–মদ্যপায়ী নয়, তখনি তাঁকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করার নির্দেশ দিলেন। পরিশেষে সবাইকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল্‌লেন এবং জানালেন যে তার তওবার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি যার পরিমাপ নেই।

(৮) অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারীণীর শাস্তি কিরূপ হ'তে পারে নিম্নবর্ণিত দুটি ঘটনা হতে আমরা তা দেখতে পাই। দণ্ডবিধির সময় রসুলুল্লার (দঃ)-এ বিচারের পন্থা বিচারকদের জন্য অনুসরণীয়। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

টীকা ১ । হাদিস।

www.pathagar.com

আয্‌দ বংশের গোমেদী গোত্রিয়া একটি মহিলা আসিয়া বলিল,– 'হে রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) আমাকে পবিত্র করুন।'

নবী (সঃ) বলিলেন–' তোমার প্রতি আক্ষেপ। চলিয়া যাও আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও মাফ চাও।' মহিলাটি বলিল,

'আপনি মায়েয-বিন-মালেককে যেই ভাবে ফিরাইয়া দিয়াছেন, আমাকেও কি সেইভাবে ফিরাইয়া দিতে চান? দেখুন, আমার এই গর্ভ ব্যভিচারের কারণে।'

রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন–'তুমি কি সত্য গর্ভবতী?'–মহিলাটি বলিল–'জি, হাঁ।'

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,–'যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

সন্তান প্রসব হবার পর যখন মহিলাটি আবার আসিল তখন তিনি বলিলেন–'আবার চলিয়া যাও এবং সন্তানকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বাচ্চাটির দুধ খাওয়া যখন বন্ধ হইল, তখন মহিলটি বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি দিয়া রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট গেল এবং বিলল,

'হে আল্লাহর নবী! এই দেখুন, —দুধ ছাড়ানো হইয়াছে। এমনকি বাচ্চা নিজের হাতে খাইতে পারে।'

তখন হুজুর (দঃ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোড়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাহার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হইল। তৎপর লোকদিগকে নির্দেশ করিলেন,–তাহারা মহিলাটিকে 'রজম'-করিল। হজরত খালেদ-বিন-ওলীদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার মাথায় একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করিতেই রক্ত ছিটিয়া আসিলে তাহার মুখমণ্ডলের উপর পড়িল। তাই তিনি মহিলাটিকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিলেন। নবী (সঃ) তখন বলিলেন,

"হে খালেদ। থাম। সেই সত্ত্বার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ। মহিলাটি এমন তওবা করিয়াছে–যদি কোন বড় জালিমও এই ধরনের তওবা করে তাহারও গুণা মাফ হইয়া যাইবে। অতঃপর মহিলাটির জানাজার আদেশ হইল। তার জানাজা পড়া হইল এবং দাফন করা হইল।"[১]

উপরে বর্ণিত ঘটনা বিচারকদের শিক্ষা দেয় যে কোন মহিলা ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হলে তাকে তৎক্ষণাৎ প্রস্তরাঘাতে নিহত (রজম) করা চলবে না। তাকে সময় দিতে হবে সন্তানের জন্ম ও তাকে প্রতিপালনের দিন পর্যন্ত–অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে।

আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ পালন করতে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে ন্যায়ের বিচার করতে, মানব-সমাজ হতে অপকর্ম দূরীভূত করতে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে রসুলুল্লাহকে (দঃ) এভাবে বিচার করতে হয়েছিল। সন্দেহের অবকাশ থাকলে শাস্তি প্রয়োগ এড়াইয়া যাওয়া বিচারকদের কর্তব্য–এটা দেখাতেই তিনি অপরাধীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন্ 'তুমি কি পাগল? তুমি কি মদ্যপায়ী? মহিলাকেও যখন জেনেছেন–সে গর্ভবতী তখন তাকে সময় দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ পালন করতেই রজমের নির্দেশ দিয়েছেন অথবা হয়ত মাফ করে দিতেন–তাঁর শেষের পবিত্র বাণী হতে তাই বুঝা যায়। চলুন দেখি, এ কথাটির সত্যতা তাঁর বিচারে প্রমাণিত হয় কিনা।

(৯) হযরত ওয়ায়েল-বিন-হুজুর (রাঃ) বলেনঃ-

রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) যামানায় এক নারী নামাজের জন্য বাহির হইল। এমন সময় এক ব্যক্তি ঐ নারীকে গলায় কাপড় মোচাড় দিয়া জড়াইয়া ধরিল এবং তার সঙ্গে ব্যভিচার করিল

www.pathagar.com

জোরপূর্বক। তখন মহিলাটি চিৎকার শুরু করিলে ঐ লোকটি চলিয়া যাইতে লাগিল এমন সময় একদল মোহাজের সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া মহিলাটি বলিল,–'এই লোকটি আমার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে। তাহারা লোকটিকে পাকড়াও করিয়া রসুলুল্লার নিকট লইয়া গেলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–'তুমি চলিয়া যাও'।'

তোমার অনিচ্ছা এবং এমন কাজের প্রতি ঘৃণার কারণে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আর যেই লোকটি তাহার সঙ্গে কুকর্ম করিয়াছে তাহার সম্পর্কে লোকদিগকে বলিলেন, 'যাও-এই লোকটিকে 'রজম' কর অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে নিহত কর। এবং তিনি বলিলেন: অবশ্য এই লোকটি এমন তওবা করিয়াছে যদি মদিনার সমস্ত পাপীরা এইরূপ তওবা করিত তাহা হইলে সকলের পক্ষ হইতেও উহা কবুল হইত।[৩] [তিরমিজি, আবু দাউদ]

উপরে বর্ণিত হাদিস হতে দেখা যায় যে মহিলাটি ইচ্ছাপূর্বক এ লোকের সঙ্গে সঙ্গম করে নি। জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। মুখে কাপড় দিয়ে বাধ্য করা হয়েছিল যেন কথা বলতে না পারে। পরে মহিলার চিৎকারে লোকজন এসে ঐ লোকটিকে ধরে ফেলে। এতে মহিলাটি নির্দোষিণী হিসাবে প্রমাণিত হয়। আর ঐ ব্যক্তি যেহেতু মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল সেজন্য সে বিচারের দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল। এরূপ ব্যাপার সমাজে অনেক ঘটে থাকে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অসৎ, বখাটেদুর্ধর্ষ, লম্পট তরুণ ও যুবক ছেলেরা অসহায়, দুর্বল দরিদ্র মেয়েদের মুখে কাপড় দিয়ে নির্জন স্থানে, খেতের আড়ালে নিয়ে যায় এবং উপর্যুপরী ধর্ষণ করে জীবন নাশ করে। অথবা সারা জীবনের কলঙ্কের বোঝা মাথায় দিয়ে দেয়। ফলে বিবাহ হয় না। স্কুল-কলেজের মেয়েদের নিয়েও সমস্যা। কতিপয় চরিত্রহীন ছেলেরা এরূপ অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয় দাসীবৃত্তি করতে গিয়ে গরীবের মেয়েরা ধনীর ছেলেদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, ধর্ষিত হয়। প্রভুদের অত্যাচারে ও ভয়-ভীতিতেও এরূপ অনেক ঘটনা সর্বদাই ঘট্ছে। এজন্য কি এসব মেয়েরা দায়ী? তারা কি রজমের আওতায় পড়বে? না–রসুল (দঃ) তা দেখিয়ে দিয়েছেন অনেক বিচারের ক্ষেত্রে। পূর্ববর্তী ঘটনা এর একটি নিদর্শন।

(১০) এবার দেখব, যৌন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তাড়নায় অথবা প্রভুর মনোতুষ্টির কারণে যদি কোন দাসী ব্যভিচার করে তাহলে তার জন্য 'রজম'-এর নির্দেশ সঠিক কি না।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ- "আমি শুনিয়াছি নবী (সঃ) বলিয়াছেন –যদি তোমাদের কাহারো দাসী যিনা করে আর তাহা প্রকাশ হইয়া যায়, তখন তাহাকে চাবুক মার। কিন্তু তাহাকে তিরস্কার করা যাইবে না। পুনরায় আবার যদি যিনা করে এইবারও তাহাকে দোর্‌রা লাগাও। কিন্তু তিরস্কার করা যাইবে না। কিন্তু ইহার পর যদি তৃতীয় বারও যিনায় লিপ্ত হয় এবং তাহা প্রমাণিত হয় তখন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হইলেও তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেল।"[১]

[দাসী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যাই হোক না কেন তাহাকে চাবুক মারিতে হইবে–তাহাও স্বাধীনা নারীর অর্ধেক। হাদিসটির ব্যাখ্যায় একথা বলা হয়েছে]

(১১) হযরত আবু উমাইয়া মাকযুমী হতে বির্ণতঃ-

"একবার নবী (সঃ)-এর নিকট এক চোরকে আনা ইহল। সে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করিল যে সে চুরি করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে চুরির কোন মাল পাওয়া যায় নাই। তখন রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,–

'আমার ধারণা যে তুমি চুরি কর নাই।'

কিন্তু সে বলিল,–'হাঁ, আমি চুরি করিয়াছি।'

www.pathagar.com

হুজুর উক্ত কথাটি দুই-তিন বার পুনরাবৃত্তি করিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই চুরি করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল। অতঃপর হুজুর (সঃ) নির্দেশ দিলেন এবং তাহার হাত কাটা হইল। ইহার পর আবারও হুজুরের খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তখন রসুরুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে বলিলেনঃ-

'যাও, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তওবা কর।' সে বলিল আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাহিতেছি এবং তওবা করিতেছি। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার জন্য তিনবার এই দোয়া করিলেনঃ-

'আয়-আল্লাহ্! তাহার তওবা কবুল কর'।[২]

(১২) মদ্যপানের শাস্তি ঃ-

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মদ্যপান মুসলমানের জন্য হারাম। কোরআনে বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। কেন নিষিদ্ধ এ বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আলোচনা করেছি–আমার রচিত বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের ১ম খণ্ডে শরীরবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে। এখানে শুধু উল্লেখ করছি রসুলুল্লাহ্ (দঃ) মদ্যপায়ীর কি শাস্তি দিয়েছেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন-আযহার বলেনঃ- 'একটি দৃশ্যকে আমি এখনও চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি। আর তা হাহইল এই–একদা নবী (সঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি কে উপস্থিত করা হইল। সে মদ্যপান করিয়াছিল। তখন তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ-'তোমরা ইহাকে মার।' সুতরাং তাহারা কেহ জুতা দ্বারা, কেহ লাঠির দ্বারা, এবং কেহ খেজুর ডাল দ্বারা লোকটিকে আঘাত করিল।"[১]

(৭) **'ন্যায়-বিচারক মুহাম্মদ (দঃ)**–শুধু এ বিষয়ের উপর লিখলে বিরাট আকারের একটি বই রচিত হবে। তাই এর উপর আর অগ্রসর হতে চাচ্ছি না। রসুলুল্লাহর (দঃ) বাল্যকালের দুটি ঘটনা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপন করছি এবং চিন্তা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি যদিও এ ঘটনা সবাই জানেন।

(ক) আমরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শৈশব জীবন অধ্যয়ন করতে দেখেছি যে তিনি দু-বছর পর্যন্ত হালিমা-মার-দুধ পান করেছেন। মা-হালিমার ভাষা অনুযায়ী রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁর বুকের মাত্র একটি দুধ খেয়েছেন। দু'টি নয়। এ কথা আমরা পড়েছি। অবাক হয়েছি। লেখকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনেছি যে দ্বিতীয় দুধটি হতে তিনি পান করেন নি এজন্য যে মা-হালিমার অন্য ছেলেরা তা পান করবে। একা পান করে নিঃশেষ করলে তাঁর ছেলে-মেয়েরা কাঁদবে খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবে।

এখন আমার প্রশ্ন–'জন্মের পর থেকেই কি তিনি সাম্যবাদ,উদারতা, জ্ঞান ও ন্যায়বিচার শিক্ষালাভ করেছিলেন? নইলে কেন তিনি মা-হালিমার একটি দুধ স্পর্শ করেন নি? কে তাঁকে অলক্ষ্যে থেকে এমন চিন্তাধারা দিয়েছিলেন?

(খ) রসুলুল্লাহ (দঃ) শৈশব জীবনে একবার কাবা-গৃহের সংস্কার ও মেরামত করার পরিকল্পনা করা হয়। আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাধ্যমেই এ পবিত্র কাজটি সম্পন্ন হয়। সংস্কারের সময় **'হজরে আসওয়াদ'**–(কালো পাথর যা বেহেশতের পাথর বলে মূল্যায়িত)–পাথরটি স্থান চুত্য করা হয়। কাবা সংস্কার কার্য সম্পন্ন হলে ঐ পাথরটি স্ব-স্থানে রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। কোন্ গোত্র এ পাথরটিকে স্ব-স্থানে রেখে চিরকাল গর্ববোধ করবে–এটাই ছিল মত বিরোধের মূল কারণ। এ নিয়ে চরম এক সমস্যা দেখা দিল। কোন গোত্রই পিছ-পা হতে চায় না। সমাধানেরও কোন পন্থা খুঁজে পেল না। নিজ নিজ দলের স্বার্থ ও গৌরবকেও বিসর্জন দিতে কেউ রাজি হলো না। অথচ এ পাথরটি কাবারগায়ে সংস্থাপন করতেই হবে। বহু মতান্তর ও বিবাদের পর একজন বিজ্ঞ নেতা প্রস্তাব দিলেন যে আগামী কাল ভোরে অর্থাৎ

www.pathagar.com

সোবহে-সাদেকের পূর্বে যে ব্যক্তি এ কাবাগৃহে প্রথম প্রবেশ করবে–তার হাতেই ন্যস্ত করা হবে এর সমাধানের ব্যাপারটি। সবাই এ প্রস্তাবে রাজি হলো। অপেক্ষা করতে লাগল–প্রতিটি দলের মনোনীত ব্যক্তি, ঐ আগমনকারীর জন্য। দেখা গেল সর্বপ্রথম আগমনকারী এবং কাবা-গৃহে প্রবেশকারী সেই মুহাম্মদ (দঃ)–যিনি সবার প্রিয়। সবার আদরনীয় ও প্রীতিভাজন। আরবের সবাই মিলে যাকে **সাদিক ও মাকসুদ'** (সত্যবাদী–যার সত্যবাদিতা সারা বিশ্ব কর্তৃক আদৃত।) উপাধি দিয়েছিল। **'কাশিম' ও 'আল্-আমিন'**–অর্থাৎ ন্যায়ের শাসক ও বিশ্বাসী বলে সারা আরবে যার খ্যাতি –সেই আজ -এ জটিল সমস্যার সমাধান দেবেন। দু-দিন ব্যাপী যে সমস্যার কোন সমাধান হয় নি বলে মরুর তপ্ত হাওয়া সবাইকে পুড়িয়ে ছারখার করছিল–তাদের হৃদয় মনে দেহে–সে সমস্যার আজ সমাধান হবে–ঐ 'কাসেম'-এর হাতে। তাই সবাই চিৎকার দিয়ে উঠল। সাদরে অভ্যর্থনা জানালো ঐ প্রিয় মুহাম্মদকে (দঃ) যিনি করবেন আজ ন্যায়ের বিচার।

মুহাম্মদ (দঃ) তাদের ঘটনা শুনলেন। অবস্থা দেখলেন, এরপর চিন্তা করলেন–'তিনি আল্লাহর নবী। সাম্যের গায়ক। পার্থক্যের অবসানকারী। কলহ-বিবাদের উচ্ছেদকারী। মিলনের দূত। শান্তির বাহক। সত্যের নায়ক।'

এরপর নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। নিজ হাতে এ কালো পাথরটি তুলে ধরে এর মাঝখানে রাখলেন। চার গোত্রের চারজন দলপতিকে ডেকে চাদরের চার কোনা ধ'রে কাবা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে তা বসিয়ে দিলেন। হিংসা তিরোহিত হলো। রক্তপাত বন্ধ হলো। প্রেম-প্রীতি ও সাম্যের এক চিরস্থায়ী ভিত্তি আল্লাহর ঘরে স্থাপিত হলো। জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-বিশ্বাস-কঠোরতা-কোমলতা-যার চরিত্রে শোভা পায়,–তিনিই ত কেবলমাত্র ন্যায়ের বিচার করতে পারেন। চরিত্রের এসব অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন–এ মহানবী, এ জগৎগুরু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

আমার সামান্যতম জ্ঞানের পরিধিতে, মহামানবকে **'জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ)'** –উপাধি দিয়ে একটি বই রচনা করেছি। পাঠকবৃন্দকে এ বইখানি পড়তে ও ঘরের আলো হিসাবে রাখতে অনুরোধ জানাই।

উপরে বর্ণিত দুটি ঘটনাই চিন্তাশীলদের অবাক ক'রে দেয়। অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকদের এ ঘটনা বিশ্লেষণের কোন যুক্তি বা থিওরী নেই। দ্বিতীয় ঘটনা স্বাভাবিকের মধ্যে ধ'রে নিলেও প্রথম ঘটনা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক বলে আস্তিক নাস্তিক সবাইকে স্বীকার করতে হবে। জন্ম হতে দু-বছর বয়সের কোন শিশুর এ ধারণা হতে পারে না যে, দুটো দুধ স্বার্থপরের মত পান করলে তারই মত অন্য অসহায় শিশুর প্রাণ বাঁচবে না। খাদ্যাভাবে অকালে জীবন হারাবে। আর ঐ জন্মদাত্রী মাতা পরের শিশুকে স্তন দান ক'রে নিজের শিশুকে হারাবে খাদ্যাভাবে সেটাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

যাঁরা আল্লাহর প্রেমিক, যারা হযরত মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল তাঁরা এ মহমানবের জীবন ইতিহাস আলোচনা করে দেখতে পান যে শৈশবে তাঁর বক্ষচ্ছেদ করা হয়েছিল। অলৌকিকভাবে অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করেছিলেন তাঁর হৃদয়। সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে 'বায়তুল মামুর'-পৌঁছাবার শক্তি দিয়েছিলেন–সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিদার লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। অদৃশ্য বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন ক'রে সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটন করার কৌশল যিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন–তিনিই তো রসুলুল্লাহ্‌কে (দঃ) জন্মের পর হতেই 'ন্যায়-বিচারের' ট্রেনিং দিয়ে সুশিক্ষিত করেছিলেন। তাই এ ঘটনায় অবাক হবার কি আছে? সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এ জন্যই তাঁর মহাবাণীতে রসুলকে (দঃ) বলেছেন–তুমি বল, আমিত তোমাদের মধ্যে সুবিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

www.pathagar.com

সাম্য ও স্বাধীনতা

ধরাপৃষ্ঠের সকল সৃষ্টজীব যেমন আলো বাতাস পানি নির্বিবাদে ভোগ করতে পারে–সকলেরই এতে থাকে সমদাবী ও সমঅধিকার, তেমনি একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজন ও জরুরী ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাক্ স্বাধীনতা, চিকিৎসা, আইনের শাসন, যাতায়াত ব্যবস্থা ও খাদ্য সামগ্রীর উপর শ্রেণী বা বর্ণভেদের পার্থক্য মুছে দিয়ে যে ব্যবস্থা রচিত হয় সেটাই সাম্য। এ সাম্যের জয়গান–"মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সাদা কালোতে প্রভেদ নেই, উঁচু নিচুতে পার্থক্য নেই, সবাই আদম সন্তান আইনের দৃষ্টিতে সবাই সম মর্যাদার অধিকারী, কোন বিশেষ ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোত্রের জন্য বিশেষ ধরনের আইন বা সুযোগ সুবিধের বন্দোবস্ত নেই।"

সৃষ্টি পদ্ধতিতে সাম্য অসাম্য

এ বিশাল বিশ্বের দিকে তাকালে জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, চিন্তার বিবর্তন ঘটে,চোখ ঝল্‌সে উঠে। ছোট বড় উঁচু-নিচু, কালো-সাদা, লাল-নীল, সবুজ-হলুদ, আগুন-পানি, ঠাণ্ডা,-গরম, শক্ত -নরম, আলো-আধার, টক -মিষ্টি, ঝাল-নোনা কত প্রকার রূপ ও বৈচিত্র নিয়ে না ফুটে উঠেছে এ মহান সৃষ্টি। এ সৃষ্টির মাঝে যেমন রয়েছে সাম্য, তেমনি রয়েছে অসাম্য। এই সাম্য ও অসাম্যের সমন্বয়েই ফুটে উঠেছে অপরূপ এক সৌন্দর্য।

আমরা মানুষ–স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ সৃষ্টি কি ভাবে সম্ভব হয়েছে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি ভাবে সুবিন্যস্ত হয়েছে, কোন্ কোন্ মহা উপাদানের সংমিশ্রণে এমন সুঠাম দেহ তৈরি হয়েছে, সে তত্ত্ব আমরা জানি না। আর জানি না বলেই আজও অতি ক্ষুদ্রাকৃতির একটি মানুষ কোন রাসায়নিক ল্যাবরেটরী থেকে তৈরি করতে পারে নি। কাদা, কাঠ বা পাথর দিয়ে দেহ গঠন করতে পারি কিন্তু কথা বলাতে পারি না। আর্টারী ও ভেইন তৈরি করে রক্ত সঞ্চালন করেও দেহকে সজীব রাখ্‌তে জানি না। বৈদ্যুতিক যন্ত্র ফিট্ ক'রে চলাফেরা করার ক্ষমতা ও যৌন চেতনাও এনে দিতে পারি না। মনের সৃষ্টি ক'রে ভাল মন্দের বিচার, সুখদুঃখ ও ন্যায় অন্যায়ের পরিমাপও করতে পারি না। সাম্য ও অসাম্যের কোন পার্থক্য দেখিয়েও যুদ্ধের অস্ত্র তুলে দিয়ে বিপদ ঘটাতে সমর্থ হই না। চলুন দেখি, আল্লাহর এ বৈচিত্রময় সৃষ্টির মাঝে সাম্য ও অসাম্যের কি কি থিওরী দেখতে পাই।

ধনী ও গরীব দুটো সমাজই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। দুজনই মানুষ। সৃষ্টির তত্ত্বে দেখা যায় একই উপাদানে গড়া। একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেহ সুজ্জিত। ধনীর দুহাত, বিশ আঙ্গুল, গরীবেরও ঠিক তাই। ধনীরা চোখ কান দ্বারা যেমন দেখে ও শোনে, গরীবেরও ঠিক তেমনি চোখ ও কান দ্বারা দেখে ও শোনে। জিহ্বার স্বাদ ধনীদের যেমন গরীবদেরও ঠিক তেমনি। সুউচ্চ নাক দ্বারা ধনীরা যেমন ঘ্রাণ লয়, ভাল মন্দের বিচার করে গরীবেরাও নাক দ্বারা ঠিক তাই করে। ধনীর পা ও পাকস্থলীর কাজ গরীবের থেকেও পৃথক নয়। ধনী গরীব উভয়ের মুখেই বত্রিশটি দাঁত একই রূপ শোভা বর্ধন করে ও একই প্রণালীতে খাদ্য পেষণ করে রাসায়নিক ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দেয়। যৌন সুখ ধনীর বেশি ও গরীবের কম এ কথাও কোন ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক বলতে পারেন নি। যাতনা, চেতনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না রোগ-শোক সবারই সমান। জন্ম ও মৃত্যুর রহস্যও একই, আল্লাহর সৃষ্টিতে ভেদাভেদ নেই। পদ্ধতিতেও কোন পার্থক্য নেই।

পুরুষের একটি শুক্রকীট ও নারীর একটি ডিম্বকোষ একত্রিত হয়ে একই স্থানে একটি প্রক্রিয়ায়, একই ভঙ্গীতে একই পরিবেশে মিলন হতে থাকে, ধনী ও গরীবের ক্ষেত্রে এ

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় কোন পার্থক্য রয়েছে বলে আমার জানা নেই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গর্ভে সুন্দর খাবার, সুন্দর বিছানা ও আলোক সজ্জার পৃথক ব্যবস্থা করে রাখা হয় নি কোন অনাথা এক দরিদ্র ও অসহায় নারীর গর্ভের চেয়ে। যতদিন পর্যন্ত এ ভ্রূণ মায়ের পেটে থাকে ততদিন পর্যন্ত এ মহাসাম্য এদের বজায় থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই শুরু হয় প্রভেদ আর আকাশ পাতাল এক পার্থক্য, এক অসাম্য। মায়ের দুধেও সমপরিমান ভিটামিন, স্বাদ ও উষ্ণতা থাকে। কিন্তু পৃথিবী মায়ের পেটে এসেই ভিটামিনের তারতম্য হয়। কেউ পায় মধু আর কেউ পায় এক ফোঁটা গুড়ের পানি। কারো কপালে জুটে গ্লাক্সো, অষ্টারমিলক আর কারো কপালে আসে দু-আনা প্যাকেটের শটি বার্লি। কেউ খেলে রূপ সজ্জার দোলনায় আর কেউ কাঁদে ঠাণ্ডা মাটির বিছানায়। কে এ পার্থক্যের সষ্টি করে? কে সাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করে অসাম্যের এক পাহাড় গড়ে তুলে? আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতিতে তো সাম্য বিরাজমান।

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায় -কে ধনী-গরীর সৃষ্টিকারী? মানুষ ইচ্ছে করে কি কেউ গরীব থাকতে চায়? গরীবের পেটে যে বাচ্চা জন্ম লাভ করে সে কি ভুমিষ্ট হবার পর চায় না ধনীর ছেলের মত খেলনার দোলনায় দুলতে? ধনীর ছেলেই বা কোন্ পুণ্যে এ আলোক সজ্জিত প্রাসাদে স্থান পেল? এটা কি সে জোর করে দখল করে নিয়েছে না ঐ গরীব ছেলেটিকে বুদ্ধির জোরে হারিয়ে রাজার সন্তানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে? ধনীর ছেলেকে দেখে ঐ ছেলেটির কি মনে হয় না কেন গরীবের ঘরে জন্মেছিলাম? কোন্ পাপে রাজার ঘরে জন্ম না নিয়ে দুঃখী প্রজার ঘরে জন্ম নিয়েছি। এটা কি আমার ইচ্ছা? খোদা, কেন তুমি এত পার্থক্য করলে? এমন অভিযোগ প্রতিটি গরীব সন্তানেরই থাকে। আল্লাহরইতো এ দুনিয়া। এখানে ধনী-গরীব উঁচু-নিচুর প্রভেদ থাকবে কেন? আগুন, বাতাস, মাটি, পানি, চাঁদ,সূরুয, বৃক্ষলতা, তরুরাজী সবই যখন ধনী-গরীবকে সমভাবে সাহায্য করে, তখন আমরা মানুষে মানুষেই বা সম অধিকার পাব না কেন? এসব গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের জবাব আমার মত একজন ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি সৃষ্টির এক মহা সাম্য ও মহা অসাম্য। পিপীলিকা সৃষ্টির পাশে হাতীর সৃষ্টি নিয়ে তুলনা করলে মাথা ঘুরে যায়। বটবৃক্ষের পাশে মাটিতে বিছানো দুর্বা ঘাস দেখলে বুদ্ধি লোপ পায়, লৌহবৎ তমাল তরুর পাশে আলোকলতার করুণ আশ্রয় স্থল দেখলে জ্ঞান পিপাসা মিটে যায়। সম আকৃতি, সমপ্রকৃতি ও সমগুণ নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি বস্তু জন্মলাভ করলে সৃষ্টির বৈচিত্র ধরা পড়ত না। সৃষ্টির মাহাত্ম্য ফুটে উঠত না। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কেউ বুঝত না। হাত, পা, নাক, কান, ঠোঁট, জিহ্বা সবই যদি একই আকৃতির হতো তা হলেই বা কি হতো? সৃষ্টির রূপ বিবর্তিত হতো, না আরও সুন্দর হ'য়ে ধরা দিত সেওত বুঝি না। তাই আবার চিন্তায় মস্তিষ্ক অবসাদ হ'য়ে আসে যে ধনী-গরীব এক হলে, সবারই সম অধিকার থাকলে পরস্পর মারামারি ক'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে এ ধরা থেকে বিদায় নিত কি না। আর কয়দিনই বা টিকে থাকতো? দুই রাজা এক রাজ্যে রাজত্ব করতে পারে না। দুই কুলিন ব্রাহ্মণ এক গ্রামে থাকতে পারে না। দুই সিংহ এক বনে থাকে না। রাজা চায় প্রজা, ব্রাহ্মণ চায় শুদ্র। সিংহ চায় শৃগাল। পানির পাশে আগুন যেমন মানায়, নরের পাশে নারীর যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, পা হীন কেঁচো ও সাপের পাশে তেমন হাজার পা বিশিষ্ট কেন্নোকে মানায়–আর সৃষ্টির বৈচিত্র ও রূপ সুন্দর হয়ে চোখের উপর ভেসে উঠে। সমাধান হ'য়ে যায় উঁচু নিচুর পার্থক্যের কারণ, ধনী গরীব সৃষ্টির রহস্য আর ঠাণ্ডা গরমের প্রয়োজনীয়তা, আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি ক'রে যার যার ধর্ম পালন করারই নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

হযরতের (দঃ) দৃষ্টিতে সাম্য ও অসাম্য

সৃষ্টি পদ্ধতির সাম্যকে লক্ষ্য করে যারা মানুষের মাঝে যে প্রভেদ আছে তা ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে এক সাম্যবাদ রচনা করতে চান তাঁদের ধারণা যেমন ভুল–তেমনি সৃষ্টির অসাম্যকে লক্ষ্য করে মানুষকে হাতী ও পিপীলিকার মত বিরাট পার্থক্যের মাঝে তুলে দিতে চান তাঁরাও মারাত্মক ভুল করে থাকেন। এ দুটো-ভুলের মাঝে যে দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে বিরাজমান ছিল তার অবসান করলেন সমাজ বিজ্ঞানের অমর স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। উদাত্ত কণ্ঠে তিনিই সর্বপ্রথম গাইলেন সাম্যের জয়গান আর গড়লেন সাম্যের এক বিশাল রাজ্য। প্রমাণ করে দেখালেন মানুষ একই উপাদান থেকে তৈরি। সবাই আদম সন্তান–এক জাতি। একই স্থান থেকে আগত। একই স্থানে প্রস্থান। তাই মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। তাঁর নিম্নোক্ত ঘোষণা একথার সাক্ষ্য বহন করে।

তাকে থাকতে হবে। প্রজার সন্তুষ্টি বিধানই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ কথাই তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে রসুলের (দঃ) আদর্শ ও তাঁর মহাবাণী একই স্থান থেকে আগত। একই স্থানে প্রস্থান। তাই মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। তাঁর নিম্নোক্ত ঘোষণা একথার সাক্ষ্য বহন করে।

"ওহে মানবমণ্ডলী। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন যে, হে মানবজাতি, আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে পয়দা করিয়াছি। এবং তোমাদিগকে সমাজ ও গোত্রে ভাগ করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা পৃথকভাবে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে নাকি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশি ভয় করিয়া চলে এবং তাঁহার কথা বেশি খেয়াল রাখে। সুতরাং কোন আরববাসী অন্য কোন অনারব বা আজমী লোকের তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহে। পক্ষান্তরে কোন অনারব বা আজমী ব্যক্তিও শ্বেতকায় লোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। হ্যাঁ, মর্যাদা ও সম্মানের যদি কোন মাপকাঠি থাকে তবে উহা একমাত্র তাকওয়া ও পরহেজগারী। সমগ্র মানব জাতি এক আদমেরই সন্তান এবং আদমের প্রকৃতি স্বরূপ ইহাই যে তাঁহাকে মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে।" (বিদায় হজ্ব)

এখানে সৃষ্টিগত সাম্যকে উদ্দেশ্য করেই হযরত আমাদের জ্ঞানদান করেছেন। কেননা ধনী-গরীব, সাদা-কালো, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ যেখানে সৃষ্টির পদ্ধতিতে নেই, সেখানে মানুষ হ'য়ে মানুষকে ঘৃণা করবে, অহঙ্কার করবে, অস্পৃশ্য করে রাখবে, মজুর ও দাস হিসাবে ব্যবহার করবে তা চলবে না। প্রভু ভৃত্যের পার্থক্য, মানুষে মানুষে অসাম্য আর দাম্ভিকতার চরম বিপর্যয়ের মাথায় কুঠারাঘাত হেনে এতদ সঙ্গে আরও ঘোষণা করলেন ঃ-

"যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার আছে সে কখনও বেহেশতে যাইবে না।"[১]

বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা ও পরহেজগারীই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। একজন বিদ্বান ব্যক্তির সমান মর্যাদা একজন মূর্খকে তিনি দেন নি। জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞান ও নির্বুদ্ধিমানের পর্যায়েও কোন সময় দেখেন নি। শিক্ষকের আসন সমাজের সর্বস্তরের উর্ধ্বে এ জ্ঞান তাঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী সমূহ এ কথার প্রমাণ দেয়। তিনি বলেছেনঃ-

"অশিক্ষিত উপাসকের উপর শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব আমার অনুবর্তীদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সদৃশ।"[২]

টীকা ঃ ১ –শায়খান, তিরমিজি। সংগৃহীত–হাদিসের আলো ২য় খণ্ড-কৃত পূর্বে বর্ণিত।

টীকা ঃ ২ –তিরমিজি; ৩, ৪ ও ৫ সগির ও মুসলিম।

www.pathagar.com

"সমস্ত মানব স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি সদৃশ। যাহারা জ্ঞানী অন্ধকার যুগেও তাহারা উত্তম এবং ইসলামিক যুগেও তাহারা উত্তম।"[২]

"শিক্ষার্থী ইসলামের স্তম্ভ।"[৩]

"জ্ঞানী, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকগণ তত্তাবধায়কদের তুল্য।"[৪১]

"মূর্খদের মধ্যে শিক্ষার্থী মৃতদের মধ্যে জীবিতদের মূল্য।"[৫]

এমন গভীর ও তত্ত্বমূলক বাণী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মেলে না। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ শিক্ষাবিদদের এমন মর্যাদা কমই দিয়ে থাকেন। সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের করুণ কাহিনী ও দারিদ্রতার চরম অভিশাপের কথা শুনলে গা শিউরে উঠে, কিন্তু শাসকদের সুবুদ্ধি হয় না। হযরতের বাণীর মর্যাদা দিয়ে থাকে বিজাতিয়রা আমরা নই। পাষাণ রাষ্ট্রনায়ক ইয়াহিয়া নিজ স্বার্থের খাতিরে কত হাজার হাজার বুদ্ধিজীবীকে যে হত্যা করেছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। সাধারন ও নিরক্ষর একজন সিপাইয়ের হাতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের নামকরা ডক্টরেট মার খায় ও অকালে জীবনদান করে, অথচ রাষ্ট্রপতি এর কোনই ব্যবস্থা নেন না। এমন দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির ছাড়া আর কারো আছে বলে আমার জানা নেই। জাপানে দেখলাম শিক্ষার পরিবেশ কত সুন্দর, কত পবিত্র।

শিক্ষার্থিদের সম্মান সাধারণ নাগরিক ও মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। পুলিশ ও মিলিটারীগণ তাদের সহায়ক ও বন্ধু, আহম্মক মূর্খ নয়। পুলিশ থাকে সাহায্যের জন্য–পুলিশ থাকে জনসাধারণের সেবার জন্য,–সম্মান কেড়ে নেবার জন্য নয়। নিজে সরকারের একজন দায়িত্বশীল প্রথম শ্রেণীর অফিসার হয়েও সাহস পাই না থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে প্রানখুলে কথা বলতে। কি বিপদ ঘটে, সম্মানের কি হানি হয়–কোন বিপাকে পড়ে অর্থদণ্ড লাগে, এ চিন্তা করে পুলিশ ফাঁড়ি হতে বহু দূর দিয়ে চলি। অথচ বিদেশী ও বিজাতি হ'য়েও জাপানে পুলিশদের যে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা ও সাহায্যে পেয়েছি তা চিরদিনই স্মরণ থাকবে **'জাপানে যা দেখলাম'**–পুস্তকে এর সামান্য কিছু অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছি।

হযরতের বাণী উদ্ধৃতি করতে গিয়ে মনের চাপা দুঃখ প্রকাশ পেয়ে গেল। আমাদের নোংরা পরিবেশ, মর্যাদাশীল শিক্ষকদের প্রতি চরম অবহেলা, ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতন সহ্য করবার মত নয়। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে যেখানে একজন অধ্যাপক তৈরি করা যায় না সেখানে তাঁদের প্রতিপালন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যে সরকার ও জনসাধারণের কত দায়িত্ব তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। রাষ্ট্রপতি হতে আরম্ভ করে প্রতিটি দায়িত্বশীল অফিসার ও জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের যারা জ্ঞানদান করে তাঁদের প্রতি অবহেলার অর্থ অজ্ঞতা, মূর্খতা, দূরদৃষ্টিহীনতা ও জাতীয় স্বার্থে আঘাত হানা। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল মনীষীদের সাধারণ নীরেট মূর্খদের সঙ্গে এক লাইনে টেনে এনে সাম্যবাদ রচনা করার পক্ষপাতী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন না। সৃষ্টি বৈচিত্রের সাম্য ও অসাম্যকে স্বচ্ছ আয়নার সম্মুখে ধরে এদের রূপ ও গুণ বিচার করেছেন। যা সুন্দর, সহজ সরল ও ন্যায় তাই তিনি দিয়ে গেছেন মানব সমাজকে। দুর্ভাগ্য এ মানব জাতির। এমন মহামূল্যবান তত্ত্ব গোপন ক'রে ধরেছি আমরা কার্ল মার্কস ও লেলিনের সাম্যবাদ যা তৈরি করে হিংসা ও বিদ্বেষের দাবানল। এ অনল দাউ দাউ করে যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন পুড়ে ছারখার হবে ঐ আত্মঘাতী নীতি। **সেদিন বেশি দূরে নয়–যেদিন হযরত মুহাম্মদের (দঃ) সাম্যবাদ দেখে সারা বিশ্ব অবাক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আর এ সাম্যের ছায়াতলেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে।**

দেখুন–ইসলামের সাম্যবাদ কি? কোন্ দৃঢ় রজ্জুতে বেঁধে হযরত সামাবাদ রচনা করেছেন? কলেমা, নামায, রোযা, সালাম ও হজ্বের মধ্যে যে সাম্য নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা

www.pathagar.com

করবার ও বিশ্লেষণ দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। কেননা নেহায়েত মূর্খ ও হিংসুক ব্যক্তি ছাড়া প্রতিটি জাতির প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তির চোখেই ধরা পড়ে ইসলামের সুমহান সাম্য। এবারে অতি সংক্ষেপে আমরা এ কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি এবং সাম্যবাদের সৌন্দর্য ও আদর্শ দেখছি।

(১) কলেমাঃ- সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস ও একত্ববাদের মূল মন্ত্রকেই কলেমা বলে। হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্বের প্রতিটি নবী পয়গম্বরই এ একত্ববাদ বা 'তৌহিদ বাণী' মুখে নিয়ে এসেছিলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সকল পয়গম্বর তাঁর নাম এর সঙ্গে যোগ করে মানব সমাজে তা ঘোষণা করেছেন এবং শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন হযরত আদম (আঃ) প্রথম পয়গম্বর শেখাতেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম শফিউল্লা'; হযরত মুসার (আঃ) তৌহিদ বাণী 'লাা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কলিমুল্লাহ'; হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসারহুল্লাহ'; আর শেষ পয়গম্বর হযরত শেখালেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'।

যে কলেমা মুখে নিয়ে মুসলমান হয়, তৌহিদের যে বাণীতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়, যে বাণীতে আপন পর ভুলে যায় আল্লাহর সন্ধানে সে বাণী অমৃতধারা বর্ষণ করে, যে মন্ত্রের বদৌলতে পাষাণ আত্মাও আলোকিত হয় সে বাণীতে সবারই সম অধিকার। রাজা-মহারাজা ধনী-নির্ধন কারো জন্য কাঁটছাট ক'রে বা যোগ-বিয়োগ ক'রে দেওয়া হয় না। হয় শুধু পথ প্রদর্শনকারী নবী বা পয়গম্বরের নাম সংযুক্ত। এ বাণীতে বিশ্বাসী দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এক আত্মা, এক দেহ ও এক পরাণ নিয়েই নিজকে সঁপে দেয় আল্লাহর কাছে। সাম্যবাদের এটা এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রতিটি জাতির মধ্যেই সাম্যবাদের এ থিওরী রয়েছে কিন্তু বিশেষ স্বার্থের খাতিরে তারা তা পালন না ক'রে ব্যস্ত থাকেন বলেই তা প্রচার হয় না। তৌহিদবাদ বা তৌহিদমন্ত্র সবার জন্যই এক। হযরত আদম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)ও হযরত মুহাম্মদের (দঃ) তৌহিদবাণী পূর্বে উল্লেখ করে দেখিয়াছি **'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ** নেই, এটাই সার কথা–মূল বাণী। প্রাচীন গ্রন্থ বেদেও আমরা এ বাণীটিই দেখতে পাই। জানি না এ মহাগ্রন্থ কোন্ মহাপুরুষের উপ অবতীর্ণ হয়েছে বা কোন্ মহামানব তা রচনা করেছেন। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে **'লা-ইল্‌হা ইল্ল ইল্‌হা'** অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাসক নেই। বিধি, বিধাতা, ভগবান কোন নামই উচ্চাণ না ক'রে **অল্ল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।** শুধু তাই নয়, এই আল্লাহর নামের সাথে মুহাম্মদ (দঃ) নাম যোগ ক'রে বাণীটির সম্পূর্ণ মর্ম ও পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ-

"লা ইল্‌হা হরতি পাপম
ইল্ল ইল্‌হা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠ পর অপ ইনুতিত
জপি নাম মুহাম্মদম্।"

অর্থাৎ—লা-ইলাহা বললে পাপ মোচন হয়। ইল্লাল্লা বললে উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়। মুহাম্মদ নাম জপ না করলে সারাজীবন তপস্যা ক'রেও মুক্তি নেই।

আমার **"জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ)"** পুস্তকে এর উপর বিশেষ আলোচনা রয়েছে। শুধু বেদের এ মহাবাণী নিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, যে তৌহিদবাণী শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নিকট হতে নিয়ে আসলেন তা সমগ্র দেশ ও জাতির জন্যই প্রযোজ্য। সবার জন্যই এটা মুক্তির বাণী। সবার জন্য সাম্যবাদের এক মহান ও উজ্জ্বল থিওরী।

www.pathagar.com

(২) নামায ঃ- নামায শুধু আত্মার খোরাকই দেয় না, কলুষ কালিমাই মুছে ফেলে না, পরকালের পথই পরিষ্কার করে না, কবরের আজাব হতেই রেহাই দেয় না–ভ্রাতৃত্বের , সাম্যের, উদারতার, মহানুভবতার এক সুদৃঢ় বন্ধন এনে দেয়। শিক্ষা দেয় শৃঙ্খলার, নিয়মানুবর্তিতার, নেতৃ-আদেশ পালন করবার, দেহকে সুস্থ ও সবল রাখবার এ অতুলনীয় পন্থা-যা কোন দেশের কোন জাতির মধ্যেই নেই। যে কাতারে বিক্রমশালী বাদশা, সে কাতারেই আশ্রয়হীন ভিখারী। যে মসজিদে কৃষ্ণকায় কাফ্রী সে মসজিদেই শ্বেতকায় আরবী। যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিও যার আদেশ পালন করে, তাঁর নিরীহখানসামাও সে আদেশরই অপেক্ষায় থাকেন। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নেই, রাজায় প্রজায় পার্থক্য নেই, যুবক বৃদ্ধেরও তফাৎ নেই যে সাম্যে সেটাই হলো নামায, মিলন সূত্রের এক অপূর্ব কৌশল–যা নিয়ে এলেন সাম্যের গায়ক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

(৩) রোযা ঃ রোযা সাম্যের আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, বাদশা-ফকির সবার জন্য ঐ একই নিয়ম, প্রভাত থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত একবিন্দু পানিও কেউ পান করতে পারবে না। এ রোযাতে ধনীর জন্য এক ব্যবস্থা আর গরীবের জন্য আর এক ব্যবস্থা নেই, ক্ষুধার জ্বালা সমভাবেই সইতে হয়। সুখের নিদ্রা থেকে উঠেও সকলকেই পানাহার করতে হয়। সম্মুখে খাবার রেখেও এক অদৃশ্য শক্তির ভয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ রোযার মাধ্যমেই গরীবের পেটের জ্বালা বুঝবার সুযোগ দেওয়া হয় ধনীদের। এমন নীতি –এমন সাম্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না। রোযার উপর হযরতের কঠোর নির্দেশ সাম্যবাদের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও, আল্লাহর নিকটতম বন্ধু হয়েও তা সারাজীবন পালন করেছেন আর দুনিয়ার মানুষকে পালন করবার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তিনি নিজে এ কঠোর ব্রত উপেক্ষা করে শুধু সাধারন মানুষের জন্য এ আদেশ রেখে যেতেন তা হলে এ সাম্যবাদ টিক্‌ত না। বহু আগেই উপেক্ষিত হ'য়ে এর কবর রচনা হতো। তাঁর এ সাম্যবাদের শিক্ষা মানবজাতির শিক্ষা, রাজা-বাদশার শিক্ষা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল স্তরের সকল মানুষের শিক্ষা।

(৪) হজ্ব ঃ-হজ্বব্রত শুধু মুসলমানকেই নয় দুনিয়ার সমগ্র মানুষকেই অবাক ক'রে শিক্ষা দেয় মহামিলনের এক জয়গান। সেখানে প্রভেদ নেই আরবী, আজমী, পাঠানী, বেলুচী, ইরাকী, ইরাণী, জার্মানী, জাপানী, কাল-ফর্সা, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খ, বাদশা-নফর সবাই দাঁড়ায় এক কাতারে। ধনের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, দেশ ও কৌলিন্যের অভিমান সেখানে থাকে না। শুধু এক চিন্তা–ঐ পরকালের এক উদ্দেশ্য এক নিয়ত ঐ সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা পাবার। তাঁকেই খুশি করবার। ইসলামের এ উদার সাম্যবাদ সম্মুখে রেখে যদি বিশ্বের প্রতিটি জাতি মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে আসত তাহলে এ পৃথিবীতেই বেহেশ্‌ত রচনা করা যেত।

(৫) সালাম ঃ- মূল আরবী শব্দ, এর অর্থ শান্তি। এখান থেকেই ইসলাম শব্দের উৎপত্তি।

শান্তি প্রতিষ্ঠায়, হিংসা বিদ্বেষের কবর রচনায়, মহামিলনের যোগসূত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ইসলামের 'সালাম' পদ্ধতি শুধু মুসলমানদেরই নয়; সারা বিশ্ব মানবকে হতবাক করে দেয়। অভিজাত্যের বড়াই ক'রে যারা এতদিন মুখ ফিরিয়ে থাক্‌ত, পদমর্যাদার গর্বে যাদের শরীর কাঁপত, অর্থের অহঙ্কারে যারা সাধারণ মানুষকে কুকুর শৃগালের মত জ্ঞান করত, সৌন্দর্যের বাহাদুরীতে যারা অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করত তাদের হঠাৎ করে পতন ঘটল এ **'সালামে'**। 'আসসালামো আলায়কুম' অর্থাৎ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক–হাসিমুখে এ মধুর বাণী যখন অর্পণ করা হয় তখন একজন কঠোর, নিন্দুক ও হিংসুক ব্যক্তিও লজ্জিত হয়। আর প্রতি

www.pathagar.com

-উত্তরে বলতে বাধ্য হয় **"ওয়া আলায় কুমুস-সালাম"**। অর্থাৎ তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। একই বস্তু একই পদ্ধতিতে হৃদয়মন উজাড় করে আনন্দচিত্তে দান ও গ্রহণ করার মাঝে যে অপূর্ব শান্তি রচিত হয় তার তুলনা বিরল। এ সালামের দান ও প্রতিদানেও তেমনি রচিত হয় পরম শান্তি সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব, আর মুছে দেয় জার্মানী, জাপানী, পাঞ্জাবী, পাঠানী, ইরাক-ইরানী, আরব অনারবের পার্থক্য। সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বজনীন সাম্য আনয়ন করে মানুষের মাঝে যে সম্বন্ধ ও মিলন ক্ষেত্র তৈরি করে তা হলো সালামধারি পুরুষ, পরিচিত-অপরিচিতি, দেশী-বিদেশী, কালো-ফর্সার কোন পার্থক্য এ সালামে নেই। সালাম ঘনিষ্ঠতা আনে, সহানুভূতি আনে, মিলন আনে। প্রেম-প্রীতির উৎস এ সালাম, কোটি কোটি সহৃদয় বন্ধু সৃষ্টির ফরমূলা এ সালাম। সালাম দূরকে নিকটে আনে, আর নিকটকে আরও নিকটতর করে। শত্রুকে মিত্র করে আর মিত্রকে পরম হিতৈষী বন্ধু করে। হৃদয়ের কালিমা মুছে দেয় মনে প্রাণে সৃষ্টি করে আনন্দের এক সুর লহরী। চেনা নেই, জানা নেই, পৃথিবীর উল্টো পৃষ্ঠে গিয়ে যদি লোক সমাগমে বলা যায় 'আসসালামো আলায়কুম' তা হলে দেখা যাবে যারা মুসলমান তারা হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ প্রতিউত্তর দিয়ে জানাবে 'ওয়া আলায় কুমুস সালাম।" শুধু তাই নয়, মুসলমান হিসাবে পরদেশী হলেও আপনার প্রতি আসবে শ্রদ্ধা ভালবাসা। সাহায্য করবার জন্য প্রতিটি মুসলমানই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সালাম যে কি মারাত্মক অস্ত্র, শান্তি সৃষ্টির কেমন অমোঘ ঔষধ তা আমরা দেখেছি বিগত ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধে। হিন্দুও শিখেছিল এ সালাম–খ্রীষ্টান বৌদ্ধও শিখেছিল এ সালাম! আর এর বদৌলতেই পাষাণ, বেঈমান, অশিক্ষিত ও মূর্খ একজন পাঞ্জাবী মিলিটারীও ক্ষমা করে দিত এক নিরপরাধ বাঙ্গালীকে। পাঞ্জাবী বাঙ্গালীর প্রভেদ, মেজর সিপাই এর তারতম্য, আর ফর্সা কালোর অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত হেনে সাম্যের 'সালাম' পেয়েছিল মর্যাদা। তাই লাখ লাখ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ওদের হাত থেকে পেয়েছিল মুক্তি।

শান্তির দূত, মহাসাম্যের গায়ক, সমগ্র মানবজাতির পথ প্রদর্শক, হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। শঠতা ও অহঙ্কারকে নির্মূল করার জন্যই তিনি নির্দেশ দিলেন। 'সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে প্রথম সালাম দেয়।' (তিরমিজি ও মুসলিম)। 'প্রথম সালাম দাতা অহঙ্কারমুক্ত।' (মিশকাত)

আল্লাহর নবী ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, পথিক সবাইকে সালাম দিতেন। ছোট ছোট বাচ্চা ও নারীদের পর্যন্ত এ সালাম সম্ভাষণ করতেন, আর শিখিয়ে দিতেন সাম্যবাদ। এমন দৃষ্টান্ত বিরল, এমন ইতিহাসও বিরল।

সালামের গুরুত্ব, মাহাত্ম ও সার্বজনীনরূপ ব্যাপকভাবে ব্যাখা করেছেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান নাদভী সাহেব তাঁর লিখিত **'মানবতার সন্ধানে'** পুস্তকে। সালামের উপর এমন লেখা আমি কোথাও দেখি নি।এমন সুন্দর শিক্ষাও কোথাও পাই নি। সাম্যবাদ নিয়ে যদি কেউ বিপ্লব সৃষ্টি করতে চান, সারা বিশ্বের বুকে শান্তির বাণী প্রতিষ্ঠা করে মানব সমাজকে একত্রিত করতে চান–রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সালামের অর্থ অনুধাবন ক'রে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) শিক্ষা ও নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচলনা করতে চান, আর ধনী নির্ধন সাম্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করতে চান, তবে ধরুন রসুলের পথ-ধরুন সাম্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা এ সালাম।

সাম্য তিন প্রকার ঃ যেমন (১) সামাজিক সাম্য। (২) রাজনৈতিক সাম্য এবং (৩) অর্থনৈতিক সাম্য।

প্রথমতঃ শান্তি ও সভ্যতার মাপকাঠি সামাজিক সাম্য। এ সাম্যে ভেদাভেদ নেই। উঁচু নিচুতেও তফাৎ নেই। কলেমা, নামায, রোযা, হজ্ব, সালাম প্রভৃতির উপর আলোচনা করে দেখিয়েছি এগুলি সামাজিক সাম্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত ঃ আসে রাজনৈতিক সাম্য। রাজনৈতিক সাম্য বলতে গণতন্ত্রকে বুঝায়। অর্থাৎ বাক্-স্বাধীনতা, জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ভোটাধিকারের অধিকার। এ স্বাধীনতার ফলেই যে কোন ধর্মের বা যে কোন অবস্থায় একজন লোকই ধনী বা প্রভাবশালী একজন জমিদারকেও হারিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও আসন লাভ করতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ- অর্থনৈতিক সাম্য। এ সাম্যের অর্থ এ নয় যে প্রতিটি ব্যক্তির সমান সংখ্যক ধন-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি সুযোগ সুবিধে থাকবে। প্রতিটি মানুষেরই যদি সমসংখ্যক অর্থ থাক্‌ত তা হলে কাজ করাবার মত কোন শ্রমিকই মিল-ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা ও সরকারি অফিস-আদালতে মিল্‌ত না। এ ছাড়া একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ পণ্ডিতের সঙ্গে অথবা দেশের রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে যদি কোন দারোয়ান বা পিয়নের মর্যদার তারতম্য না করে সম্পদ সম বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক সাম্য জোরদার করা হয়েছে বলে কেউ দাবী করে বা কোন দেশের শাসনকর্তা এরূপ ব্যবস্থার প্রচলন করেন তা হলে বল্‌তে হবে যে সে দেশ বা জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেটা হবে মূর্খের আইন-বিজ্ঞের নয়। শিক্ষিত অশিক্ষিতের তারতম্য কত, মর্যাদার দিকে ভারসাম্য কত, জ্ঞানী-গুণীর পার্থক্য কত–তাহার কিছুটা বর্ণনা করেছি সাম্য অসাম্য পরিচ্ছেদে। দক্ষতা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। মাথাপিছু অর্থসম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সাম্য হওয়া উচিত। জ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ধর্মপরায়ণ ও দার্শনিক ব্যক্তি মাত্রই এ ধারণা পোষণ করবেন এ মতবাদ সমর্থন করবেন। এ বিষয়ে দু-একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতামত তুলে ধরছি। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন,

"The purpose of society would be frustrated at the outset if the nature or a mathematecian met an identical response with that of the nature of a brick layer."

অর্থাৎ "ইট সাজানোর কাজে অভ্যস্ত যে শ্রমিক, সে যদি কোন অঙ্কশাস্ত্রবিদের সমান মর্যাদা লাভ করে তা হলে বলতে হবে সমাজ জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।"[১]

দার্শনিক হিউম বলেনঃ-

'Render possessions ever so equal, men's different degrees of art, care and industry will immediately break that equality.'

অর্থাৎ "যদি প্রত্যেককে সমান সম্পদ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়–তাহা হইলে বিভিন্ন জনের শিল্পকর্মের দ্বারা পরিশ্রমের মাধ্যমে, যত্ন ও কলা কৌশলের সাহায্যে তাহা পুনরায় বৈষম্য রূপ লাভ করিবে।"[২]

অবশ্য এ কথাও সত্য যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও সুষ্ঠু না হলে রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে বিত্তশালী লোকেরা সমাজের উপর প্রভাব খাটায় স্বৈরাচারে মত্ত হয়, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে প্রভাবান্বিত করে এক অরাজকতা ও নৈরাজ্য অবস্থার সৃষ্টি করে। সম্পদ বণ্টনের মধ্যে যদি পাহাড় সমান বৈষম্য থাকে তবে সাধারণ ও দরিদ্র লোকদের পক্ষে স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করবার সুযোগ থাকে না। স্বাধীনতা তাদের নিকট হয় অর্থহীন। এ জন্যই অর্থ-নৈতিক সাম্যের প্রয়োজন রয়েছে। এ অর্থনৈতিক সাম্য কি? কিভাবেই বা সমাজে এর প্রভাব বিস্তার করা যায় সেটার উপর আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামান্য একটু আলোচনা করছি।

১৯৭৮ সনের এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জাপানে ছিলাম। একটি সুসভ্য ও উন্নতশীল দেশ দেখতে পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করেছি ও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়

টীকা ঃ ১ হতে ২–সংগৃহীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা। কৃত ডঃ এমাজউদ্দিন আহম্মদ। পৃষ্ঠা ৩৭৪।

www.pathagar.com

করেছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান লিখতে গিয়ে সাম্য ও স্বাধীনতার কথা লিখতে হচ্ছে। আর এ দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়েই জাপানের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা মনে পড়ছে। তাই লিখতে বাধ্য হলাম।

দারিদ্র শব্দের যে অর্থটি বুঝায় জাপানীদের মাঝে তা দেখলাম না। সবার মুখেই হাসি, সবাই মিল-ফ্যাক্টরী অথবা সরকারী বেসরকারী অফিস কর্মচারী দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা শহর-বন্দর আলোকিত করে কর্মচারীরা নিজ নিজ কর্তব্যে তৎপর। মেশিন, কল-কব্জা, বিদ্যুৎ, ট্রেন-বাস, চল্‌ছে-বিকল নেই। কর্মীরাও তাই বিকল বা অলস হয়ে বসে নেই। কর্মসংস্থানের জন্য-'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয় না। টাকার জন্য বাবার পকেট মারতে হয় না অথবা মায়ের গহনাও বিক্রি করতে হয় না। কলেজ ও ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রীরা পার্ট টাইম অর্থাৎ চার ঘণ্টার জন্য হোটেল, দোকান বা মিল-ফ্যাক্টারীতে কাজ করে প্রচুর অর্থ পায়। তাই খাওয়া, থাকা, পড়াশুনা ও জামা-কাপড়ের জন্য পছন্দমত খরচ করার অধিকার থাকে। এ অধিকারে কেউ হাত দেয় না বাধার সৃষ্টি করে না। টাকার অভাবে কেউ কাঁদে না। সবার পরিবেশ, খাওয়া পরা প্রায় একইরূপ।

অর্থনীতির দিক থেকে বৈষম্যের বিরাট একটি পাহাড় গড়ে উঠে দাউদাউ করে যে হাজার হাজার পরিবারকে ভস্মীভূত করেছে এরূপ চেহারার কোন নারী বা পুরুষকে পেলাম না কোন সাম্য এরা তৈরি করেছে যে সাম্যে ফুটিয়েছে সাবার মুখে হাসি। কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, উচ্চ শিক্ষার অধিকার ও বাঁচার অধিকারের মূলে যে অর্থ প্রয়োজন তা সবারই রয়েছে। কোটিপতি যে নেই তা নয়-তবে এদের পাশে আমাদের মত নিঃসহায় দরিদ্র ও অনাথ এতিম নেই। ছয় মাসে একজন ভিক্ষুকও পেলাম না রাস্তার কোন মোড়ে অথবা গির্জা, উপাসনালয়, মঠ, মন্দির কোথাও হাত পেতে কেউ বসে নেই। ছেড়া ও নোংরা কাপড় পরে কাউকে কোথাও ঘোরাফেরা করতেও দেখালাম না। রেলওয়ে প্লাটফরম, বাসষ্ট্যান্ড ও রাস্তা-ঘাটে কোথাও তবলা হারমনিয়াম নিয়ে গান গেয়ে পয়সা আদায় করতেও দেখি নি। যে সমস্ত জিনিসপত্র ও খাবার জিনিস দৈনিক তারা রাস্তার পাশে রক্ষিত বাস্কেটে ফেলে দেয়-তা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। আমাদের দেশে হলে এগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্য দলে দলে লোক আসত, মারামারি ও খুনোখুনি করতো দমন করার জন্য পুলিশ লাঠি পেটা করতে আসতো। এদের ব্যবহৃত জামাকাপড় আমাদের খুশি করানো সেকেন্ড হ্যান্ড ক্লথ। ওদের নিলামে বিক্রি করা অথবা ফেলে দেওয়া গাড়ি আমাদের প্রিয় জাপানী রি-কনডিশনড কার, ওদের অচল পুরানো ওয়ারলেস, ট্রান্সমিটার রিসিভার আমাদের গৌরব-টেলিকমুনিকেশন সিস্টেম। ওরা যখন নীল আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে ছুটে চলে আমরা তখন স্বনির্ভরতার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মজা পুকুর, নদী ও খাল-বিল কেটে নিচের দিকে চলি।

এখান থেকে সামান্য একটু ধারণা করা যায় যে এদের অর্থনৈতিক সাম্য কি প্রকারের। কেউ গরীব নেই। উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও নিম্নতম বেতনের একটি সীমারেখা আছে-যে সীমারেখা অতিক্রম করে অতল সাগরে ডুবে যায় না। **নিচের সীমা আছে। উপরের সীমা নেই।** অর্থাৎ দারিদ্রতার একটি মাপকাঠি আছে। এ মাপকাঠির বাইরে যেতে থাকলেই সরকার এবং জনসাধারণ সজাগ হয়ে যায়। তাই অর্থনৈতিক অসাম্য টিকে থাকে না।

বিদেশী উন্নতশীল একটি দেশের অবস্থা দেখে আমরা তা হলে বলতে পারি যে কাজের অধিকার, কাজের সুবিধে, কাজের জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জনরে সুযোগ এবং প্রতিটি নাগরিকের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কমপক্ষে জীবিকা অর্জনের সুন্দর ব্যবস্থা থাকাই অর্থনৈতিক সাম্য। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কিভাবে সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন, অর্থনৈতিক সাম্য রচনা করে কিভাবে দীন-দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্ট করেছিলেন। যাকাত প্রথার উদ্দেশ্য কি সে আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ আমরা চতুর্থ খণ্ডে ধনবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে করব।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা

সাম্য নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। এবারে স্বাধীনতার উপর সামান্য কিছু আলোচনা করব। স্বাধীনতাকে সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় স্ব + অধীনতা = স্বাধীনতা। অর্থাৎ নিজ অধীন থাকাকেই স্বাধীনতা বলে। ব্যাপক চিন্তাধারায় স্বাধীনতার এ অর্থ ঠিক নয়। কেননা–এ বিশ্বের প্রত্যেকটি সৃষ্টি বস্তুই পরস্পর আকর্ষণ যুক্ত। তাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যেমন সূর্যের আলোক না পড়লে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয় না। বাষ্প না হলে মেঘ হয় না। মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি না হলে ভূমি সরস হয় না। ভূমি সরস না হলে তরুলতা, ফলমূল, খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয় না। আর এগুলো না হলে মানুষ ও জীবজন্তু বেঁচে থাকে না। তা হলে দেখা যায়-মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সূর্য, মেঘ,ভূমি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। এই সবের একটিও মানুষের অধীন নয়। তাই বলে কি বলব যে মানুষ স্বাধীন নয়? স্বাধীনতার উপর আলোকপাত করে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এর যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তার উল্লেখ এখানে না করে প্রকৃতির ও বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে বলা যায় যে–অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিজ বক্তব্য, প্রতিভা কার্যদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে বিকাশ করার পরিবেশ ও সুযোগ পাবার নামই স্বাধীনতা। (লেখক)

খেয়াল খুশিমত কাজ করা স্বাধীনতা নয়। গায়ের জোরে পরের সর্বনাশ করা স্বাধীনতা নয়, নিজে যা ভালবাসে না–পরের জন্য জোর করে তা চাপিয়ে দেওয়া স্বাধীনতা নয়। নদীর পাগলা স্রোতের মত ভেঙ্গে চুরে তছনছ করা স্বাধীনতা নয়। দুর্বলের উপর খড়্গ ধরা–সম্মানীর সম্মান নষ্ট করা স্বাধীনতা নয়। বাবা-মার আদেশ, রাজার আদেশ, শিক্ষকের আদেশ না মেনে স্ব-ইচ্ছায় কাজ করা স্বেচ্ছাচারিতা–স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার সংজ্ঞা ব্যাপক। কেউ এর প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে পারে না এ জন্যই স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও ধারণায় কারো সঙ্গে কারো কোন মিল নেই। তবু এ কথা বলা চলে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাই ঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। যেমন স্বাধীনতা ও এর দায়িত্ববোধের কথা বলতে গিয়ে আমেরিকান দার্শনিক বলেছেনঃ- "স্বাধীনতা যদি সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান কর্তৃক সংযত না হয় তা হলে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয় এবং দায়িত্ব পালনের সময় স্বাধীনতার কথা ভুলে গেলে স্বৈরাচারী শক্তির উৎপত্তি হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তাকে বাস করতেই হবে। একা কেউ বাঁচতে পারে না প্রত্যেকের জন্যই প্রত্যেকের প্রয়োজন। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও একটি অঙ্গ বাদ দিলে দেহ অসম্পূর্ণ। তেমনি রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট বড়, জ্ঞানী-মূর্খ, কামার কুলী, হিন্দু-মুসলমান, দেশী-বিদেশী সবাই মিলে যেথায় বাস করে সেথায় গড়ে উঠে সমাজ। সবার জন্য রয়েছে সবার প্রয়োজন। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে অপরের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কাজ করলেই আসে আনন্দ। তখনই হয় স্বাধীনতার চরম রূপ।

প্রত্যেকেই যদি সীমাহীন, অযৌক্তিক এবং অবাধ কার্যক্রমে লিপ্ত হয় তাহলে একের সঙ্গে অন্যের দ্বন্দ্ব হতে বাধ্য। জোরের নীতি অবলম্বন করে হয় খুনোখুনি। এ জন্যই বলেছি আপন মনে স্ব-ইচ্ছায় যা খুশি করার নাম স্বাধীনতা নয়। খুন, ডাকাতি, ব্যভিচারত, লুটতরাজ, স্বইচ্ছেতেই ঘটে থাকে। এগুলো উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচারিতা। স্বাধীনতার সংজ্ঞার মানে বুঝতে হবে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা। আর এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কার্যবিধির উপর দৃষ্টি রাখা এবং একে নিয়ন্ত্রণ করা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, (১) স্বাভাবিক স্বাধীনতা, (২) সামাজিক স্বাধীনতা, (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৪) জাতীয় স্বাধীনতা এবং (৫) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

উপর্যুক্ত বিষয়োপরি সাম্য পরিচ্ছেদে কিছুটা আলোচনা করেছি। তাই এর উপর আর অগ্রসর না হয়ে সামাজিক স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতার পর ইসলামের দৃষ্টিতে কিছু বল্‌ব।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ- জ্ঞান -বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় মানবজাতি এখন অনেক উন্নত। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার এখন সর্বত্রই স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানুষ মানুষের দাস হয়ে থাকবে, ঘৃণ্য শেয়াল কুকুরের মত জীবন যাপন করবে, অন্যায় অত্যাচারের স্বীকার হ'য়ে নিজকে অভিশপ্ত বলে মনে করবে–এটা সভ্য দেশ মাত্রই অস্বীকার করছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এক শ্রেণীর মানুষ প্রভু বলে স্বীকৃতি লাভ করত আর একশ্রেণীর মানুষ দাস, ক্রীতদাস ও অসহায় গোলাম রূপে জীবন অতিবাহিত করত। ধর্মের নাম করে মানুষ মানুষকে পাঁঠার মত বলি দিত। নারীদের আত্মা নেই, মন নেই মনে করে জ্যান্ত কবর দিত। স্বামীর চিতায় তুলে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করত। পিতৃ সম্পত্তি হতে করত বঞ্চিত। ধন -দৌলত ছিল তাদের করায়ত্ব। ইচ্ছে হলেই মুণ্ড নিত। কারাগারে নিক্ষেপ করত। তিলে তিলে ক্ষুধার যন্ত্রণা দিয়ে শুকিয়ে মারত। দেখবার কেউ ছিল না। বিচারের কেউ ছিল না। কথা বলার সাহস কারো ছিল না। মুনিব ছিল গোলাম ও ক্রীতদাসের একান্ত মালিক। আর পুরোহিতগণ ছিলেন আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যবর্তী উকিল। স্বামী ছিল স্ত্রীর প্রভু ও স্ত্রী ছিল স্বামীর ক্রীতদাসী। মানবতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা কেউ কোন সময় করতে পারে নি। সারা বিশ্বজুড়ে যখন এরূপ অন্যায় ও অত্যাচার চলছিল-মুক্তির জন্য যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক দিচ্ছিল ঠিক তখনই আল্লাহ্ পাঠালেন মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লামকে। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেনঃ-

"সমস্ত মানুষ আদম সন্তান। আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।"[১]

এ ঘোষণা যুগ যুগান্তরের পর্বতসম পার্থক্যের অবসান করল। শিখিয়ে দিল মানবের মাঝে সৃষ্টির কোন প্রভেদ নেই। তাই ইচ্ছেমত জোরপুর্বক ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারবে না। বন্দী করে রাখতে পারবে না। ক্রীতদাস ক্রীতদাসী করে নিজকে অন্যের প্রভু বলে মনে করার কুপ্রথা চলবে না। হুকুম দিলেন–**"ক্রীতদাসকে মুক্তি দাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর।"**[২] (সগির)

নিজ ক্রীতদাস জায়েদকে প্রথম মুক্তি দিয়ে তিনি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শুধু তাই নয় তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করে যুগান্তরের প্রভুদের মাথায় কুঠারাঘাত হানলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা পেয়ে জায়েদ নিজ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটালেন। নিপুণ যোদ্ধা ও নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসাবে নিজকে প্রমাণ করলেন। আরবের প্রভুরা হতবাক হলেন। বিশ্বস্ত মুসলিমগণ ক্রীতদাসদের মুক্তি দিলেন। যারা যুগ যুগের প্রথাকে তবুও টিকিয়ে রাখলেন তাদের প্রতি আবার নির্দেশ হলো ঃ-

"আমি কি বলিব তোমাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধম? সেই ব্যক্তি যে একাকী আহার করে, ক্রীতদাসদিগকে প্রহার করে এবং কাহাকেও কিছু দেয় না।"[১] (মিশকাত)

মানব অধিকার (Human Rights) বা ব্যক্তি স্বাধীনতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যা দেখিয়েছেন সারা বিশ্বে তার তুলনা মেলে না। ষষ্ট শতাব্দীর এ মহানায়কের অনুসৃত নীতি স্বীকৃতি পেল বিংশ শতাব্দীর মধ্যাংশে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন অগণিত মানুষ

টীকা ঃ ১-২। হাদিস। সংগৃহীত—হাদিসের আলো ২য় খণ্ড। কৃত পূর্বে বর্ণিত।

টীকা ঃ ১ । হাদিস । সংগৃহীত-হাদিসের আলো ২য় খণ্ড। কৃত পূর্বে বর্ণিত।

www.pathagar.com

অহেতুক মৃত্যু বরণ করল, অসংখ্য শহর ও দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, ক্ষুধার কঠোর জ্বালায় সারা বিশ্বে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হলো তখনি বিশ্ব মনীষীদের চেতনা হলো–কি ক'রে মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারে, একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে হিংসার বহ্নি জ্বলতে না পারে, সাদা-কালোর প্রভেদ টেনে অঘটন ঘটতে না পারে, মানব অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে। তাই গঠিত হলো (১) লীগ অব নেশান, (২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) (৩) আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) ও (৪) মানব অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Human Rights)। এ গুলোর উদ্ধৃতি আমরা পরে দিচ্ছি। এর পূর্বে দেখে নিই হযরতের আন্তর্জাতিক সনদ (International Magna Charta) কি? ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ সনদের কি প্রয়োজন ছিল?

হযরত মুহাম্মদের (দঃ) আন্তর্জাতিক চুক্তি

(International Magna Charta of Hazrat Muhammad.[S])
(বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম)

"মদিনার ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই এক দেশবাসী। সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলমান–সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেউ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে আল্লাহ্ ও রসুলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করতে হবে। বাইরের কোন শত্রুর সঙ্গে কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না। মদিনা নগরীকে পবিত্র মনে করবে এবং যেন তা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদিনা আক্রমণ করে তবে তিন সম্প্রদায় সমবেতভাবে তাকে বাধা দেবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করবে। নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে অথবা শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। সে যদি আপন পুত্রও হয় তবুও তাকে ক্ষমা করা যাবে না। এই সনদ যে বা যারা ভঙ্গ করবে তারা বা তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত"। (ষষ্ঠ শতাব্দী-হযরত মুহাম্মদ দঃ)

এ সনদের শুরুতে আছে–'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'–সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। যিনি মহান দাতা ও দয়ালু।

মানবজাতিকে সর্বপ্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে করুণাময় আল্লাহর প্রতি–যিনি সৃষ্টি করেছেন, যাঁর নিকট মহাপ্রস্থান। এ বিশ্বাস না থাকলে সন্ধি হয় না, কোন সনদ পত্রের চুক্তি হয় না। কোন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে মিলন হয় না। মানসিক দিক থেকে সৃষ্টি হয় চরম পার্থক্য।

মদিনায় প্রস্থানের পর হযরত (দঃ) দেখলেন, এ মদিনায় বাস করে বিভিন্ন গোত্র যাদের সামাজিক কৃষ্টি ও সাধনা পৃথক, ধর্মীয় ব্যবস্থা ভিন্ন, আচার অনুষ্ঠানেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য, অথচ নাগরিক হিসাবে সবাই সমান। এ মদিনায় রয়েছে প্রভাবশালী পৌত্তলিক, ব্যবসায়ী ইহুদী, শিক্ষিত খ্রীষ্টান আর নবাগত মুসলিম। এদের নিয়েই এ মদিনা। কাউকে ছোট করে, কাউকে ঘৃণা করে বা কারো উপর প্রভুত্ব করে মদিনার সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখা যাবে

www.pathagar.com

না। ধর্মের মাপকাঠিতে পৃথক হলেও নাগরিকত্বের মাপকাঠিতে সবারই সমান অধিকার। তাই প্রথম লাইনেই ঘোষণা করলেন 'মদিনার ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সকলেই এক দেশবাসী। সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান।'

নিজের দেশকে জানতে চিনতে ও ভালবাসতে শেখালেন মদিনার সবাইকে। এ দেশের মান-ইজ্জত, সম্ভ্রমের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মদিনাবসী। এর উন্নতির দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার দায়িত্বও প্রতিটি সম্প্রদায়ের। বিভিন্ন সম্প্রদায় সমবেত ভাবে, একাত্ম হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন নাগরিক যদি শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তির বিধান করা হবে। কেউ বাধা দিতে পারবে না। বিচারের ক্ষেত্রে নিজ পুত্রকেও ক্ষমা করা চলবে না। ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, সহিষ্ণুতা ও দেশপ্রেমের এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সনদভঙ্গকারী, অপরাধী, পাপী ও দেশদ্রোহী। বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করে মদিনার উপর নিবদ্ধ করল এ সনদ। এখন থেকে মদিনা হলো তাদের প্রাণ, মদিনা হলো পবিত্র তীর্থভূমি।

এছাড়া আর একটি বিশেষ ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো এই– 'সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেউ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।'

ঐ সময় ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি হতো যে সামান্য কারণেই একে অপরের উপর আঘাত হান্‌ত এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত করত। নিজের ধর্মকে সবাই বড় মনে করত, আর অপর ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। অবশ্য আজও এমন প্রথা প্রচলিত রয়েছে। রাশিয়ায় উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ ও মিনারে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ। ভারতে মুসলমানদের গরু-জবাই নিষিদ্ধ। হিন্দু মুসলমানদের ঘৃণা করে, মুসলমান হিন্দুদের কৃষ্টি সভ্যতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে। যে কোন দেশেই বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। সবার ধর্ম এক হবে, সবার কৃষ্টি সভ্যতা ও আচার আচরণ একইরূপ হবে এটা চিন্তা করাও যেন মূর্খতা। আল্লাহর ইচ্ছোতেই বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা, আকার-আকৃতি, বর্ণ-ও বৈষম্যের পার্থক্য হয়েছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টিতে এর উপাদানের কমবেশি হয় নি। তাই মানুষ হিসাবে সবাই সমান–নাগরিক হিসাবেও সবার সমান অধিকার, ধর্ম-কর্মেও সবাই স্বাধীন। হযরতের এ চিন্তাধারা বাস্তব, নিখুঁত ও যুগ যুগান্তরের জন্য মিলনের ভ্রাতৃত্বের ও উদারতার এক পরম নিদর্শন।

একটি দেশ তা ছোটই হোক বা বড়ই হোক –পরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ ও বিজ্ঞ নেতার প্রয়োজন। এ নেতার উপর থাকতে হবে দেশবাসীর বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাঁর আদেশ উপদেশ ও বিচার মানতে হবে সবাইকে অথচ মদিনাবাসীদের এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। গোত্র প্রধানই ছিল এদের নায়ক। তাই বিভিন্ন গোত্রের নায়কদের মধ্যে হতো দ্বন্দ্ব ও কলহ। নাগরিক জীবনে তাদের ছিল না কোন নিরাপত্তা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাষ্ট্র পরিচালনার কোন ক্ষমতা। তাই কঠোর নিয়ম ও কঠোর আদেশ দেবার মত সার্বভৌমত্বও কারো হয় নি। হযরত (দঃ) এ জন্যই কঠোর ব্রত অবলম্বন করে এক চরম আদেশ দান করলেন, তাঁর সনদে–'কেউ মুহাম্মদের বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।' মুষ্টিমেয় নব দীক্ষিত মুসলমানদের সর্দার -যার সিংহাসন নেই, রাজ্য নেই, ধন নেই, রাজকোষ নেই, মিলিটারী নেই তিনি সমগ্র গোত্র, শ্রেণী ও ধর্মাবলম্বীদের নেতার নেতা হয়ে এমন আদেশ সে যুগে সনদপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন ও সমগ্র মদিনাবাসীকে মানতে বাধ্য করবেন তা চিন্তা করতেও অবাক লাগে। সাহস শুধু তাঁরই থাকে যিনি চরম বিশ্বাসী, প্রবল আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। নির্ভীক, ন্যায়পরায়ণ, উদার ও ধৈর্যশীল। সবার চোখ প্রেমের ও ভক্তির দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

যার উপর নিপতিত তিনিই একমাত্র এ ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌমত্ব তাঁরই হাতে। হযরত (দঃ) সবার প্রাণ জয় করেছিলেন। সবার ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গোত্রে গোত্রের বিভেদ অবসান করেছিলেন বলেই মদিনার রাষ্ট্রপতি হয়ে এমন নির্ভীক ও ন্যায়ের সনদ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন-যার উপর স্বাক্ষর করেছিলেন বিভিন্ন গোত্রের দলপতি। পরবর্তী সময়ে যদিও কিছুসংখ্যক ইহুদী মুনাফেকী করে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন তবুও মদিনাকে ধ্বংস করতে পারে নি। মদিনাবাসীকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারেন। খন্দকের যুদ্ধে মদিনাবাসীরা তা প্রমাণ করেছে। 'নিজে বাঁচ অপরকে বাঁচাও'–রসুলের এ মহান ও উদার নীতি সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এটা মানবাধিকারের এক মহাসনদ। ব্যক্তি স্বাধীনতার এক অমোঘনীতি।

এবারে চলুন আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদটি দেখে নিই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত মানুষের মৌলিক অধিকার (Fundamental human rights as adopted by the U.N.O.)

১৯৪০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। সমগ্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্যকারী করার অনুরোধ জানিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ–

১। সমস্ত মানুষই জন্মগত ভাবে স্বাধীন এবং অধিকার ও মর্যাদা সমান। সকলেরই বিবেক ও বিবেচনা শক্তি আছে এবং কাজকর্মে তারা একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করবে।

২। এই ঘোষণায় যে সব অধিকার ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে প্রত্যেকের সেগুলো থাকবে এবং এ ব্যাপারে বংশ-বর্ণ, নারী-পুরুষ ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতামত জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পদ , জন্ম বা অন্য কোন কারণে মর্যাদার ভেদাভেদ হবে না।

তাছাড়া যে, যে দেশে বাস করে সে সেই দেশের। রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন তারতম্য করা হবে না। সে দেশ স্বাধীন হোক, স্বায়ত্বশসিত বা ক্ষমতাবিহীন হোক অথবা সার্বভৌমিকতায় যত ত্রুটি থাকুক–এসব অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ থাকবে না।

৩। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জীবন; স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার থাকবে।

৪। কাউকে দাসত্বে বা গোলামীতে আবদ্ধ করা যাবে না সে যে কোন আকারেরই হোক। দাসত্ব ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ।

৫। কারো উপর উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, অমানুষিক বা মানহানিকর ব্যবহার বা শাস্তি প্রদান করা চলবে না।

৬। আইনের চোখে সকলে সমান মর্যাদা পাবে।

৭। আইন বা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন মৌলিক অধিকার অপরে ভঙ্গ করলে এর বিরুদ্ধে জাতীয় বিচারালয় সমূহে ফলপ্রসূ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সকলেরই থাকবে।

৮। খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারভাবে কাউকে ধৃত বা আটক করা চলবে না।

৯। কারো গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহযোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা যাবে না কিংবা কারো মর্যাদা ও সুনামের ক্ষতি করা যাবে না। এরূপ হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় পাবার অধিকার সকলেরই থাকবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U.N.O.) সনদপত্র হতে আমরা মানব অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেখতে পেলাম তা সানন্দে গ্রহণীয়। প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতির নিরাপত্তা ও মুক্তির উদ্দেশ্যেই এ সনদ রচিত। তেরশত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সমগ্র বিশ্ব-

www.pathagar.com

মানবের জন্য যে ব্যবস্থা রেখে গেছেন, যে সনদ রচনা করেছেন-তা যুগ যুগ ধরে চলবে। (U.N.O.)-এর সনদপত্র এটাই গ্রহণ করে এ সাক্ষ্য বহন করেছে। বিশ্ব মনীষীরা ও রাষ্ট্রনায়করা যদি তাঁর প্রতিটি বাণী, নীতি ও সনদকে মর্যাদা দেন তবে নতুন কোন আই ও সনদের প্রয়োজন হয় না। বার্নাডশ' সত্যি বলেছেন–

"If a man like Mohammad were to assume the dictatorship of this modern world he could solve the problem in a way that would ultimately bring its much needed peace and happiness."

অর্থঃ-

"যদি মুহাম্মদের মত কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফল হতেন যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু আকাঙ্খিত সুখ ও শান্তি।"

যুদ্ধ পরিচ্ছেদ

"হে লোক সকল। তোমরা বাসনা রাখিও না শত্রুর সম্মুখীন হইবার এবং শান্তি চাও খোদার কাছে। কিন্তু যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হও, ধৈর্য অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে **"বেহেশত তরবারির ছায়ার নিচে।"**

(সহী বুখারী– জেহাদের মাহাত্ম্য পরিচ্ছে। হাঃ নং ৭২.১০১)

হযরতের (দঃ) এ বাণী গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে দেখা যায় যে তিনি অন্তর থেকে যুদ্ধের পক্ষপাতী নন–শান্তির প্রয়াসী। শান্তি ছিল তাঁর কাম্য। শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মহান উদ্দেশ্য। তাঁর মহান চরিত্রেও আমরা তাই দেখতে পাই। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অন্যায়, অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন। প্রতিশোধ নেন নি। শান্তিপ্রিয় মুহাম্মদ (দঃ) যে কথা বলতেন–সেটাই ছিল সত্য। যা কিছু শুনাতেন সেটাই ছিল মধুর বাণী। আরবের বিভেদ-বিচ্ছেদ, কলহ, নারী হত্যা, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ছিল যাঁর অভিযান, তিনি অশান্তি উৎপাদন করবেন কেন? অশান্তির বেড়াজালে নিজেকে জড়াবেন কেন? স্বনামধন্য কোরেশ বংশে ছিল যার জন্ম, সুখ্যাতি ছিল যার সমগ্র দেশব্যাপী, অমায়িক, ভদ্র, শান্তশিষ্ট বলে যাঁকে চিনত সবাই, তাঁর কাছে কেউ কি আশা করতে পারে অশান্তির কোন কার্য? যুদ্ধকে তিনি ভালভাবেই জানতেন। যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠত। কত দেশ, কত জাতি, কত নিরীহ প্রাণ যে যুদ্ধের তাণ্ডব লীলায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে–এ কথা কি তাঁর মত মহাজ্ঞানীর বুঝবার বাকি ছিল? আর এইটুকু বোধজ্ঞান ছিল বলেই যুদ্ধকে পরিহার করতে চেয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। তবুও কেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, একটি নয়, দু'টি নয়–৮৩টি ক্ষেত্রে। ২৭টি যুদ্ধের ময়দানে কেনই বা তিনি প্রধান সেনাপতির বেশে তলোয়ার ধরলেন? কেনই বা এ কথা বললেন–"বেহেশত তরবারির ছায়ার নিচে।" চলুন আমরা দেখি কিসের পরিপ্রেক্ষিতে হযরতকে (দঃ) যুদ্ধের ময়দানে নামতে হয়েছিল। হযরতের (দঃ) জীবনে প্রধান প্রধান যুদ্ধের ফলাফল কি? যুদ্ধ শেষে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর এ সব বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

১। কোন পরিপ্রেক্ষিতে হযরতকে (দঃ) যুদ্ধের ময়দানে নামতে হয়েছিল?

যাঁরা হযরতের (দঃ) জীবনচরিত আলোচনা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে হযরতকে (দঃ) কোরেশ সম্প্রদায়ই 'আল-আমিন' উপাধি দিয়েছিল। কেননা সত্যাশ্রয়ী এ মহামানব জীবনেও মিথ্যা কথা বলেন নি। সত্যের বাণী প্রচার করা, সত্য পথে চলা, সত্যকে

www.pathagar.com

অবলম্বন করা, সত্যের পথে মানুষকে তুলে দেওয়াই ছিল তাঁর ব্রত। এতিম দুঃখী বিধবার সেবা করা, উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল মুছিয়ে দেওয়া, অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভেঙ্গে চুরমার করা, মিথ্যার মূলোৎপাটন করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিমাপুঞ্জের বিনাশ করা আর আল্লাহ্ ও রসুলের উপর বিশ্বাস করা, এ সবই ছিল তাঁর শিক্ষা। এর দৃষ্টান্ত মেলে তরুণ মুহাম্মদের 'সেবা সংঘ' গঠন। তাঁর ভক্ত তরুণ বন্ধুদের এ কথা বলে প্রতিজ্ঞা করালেনঃ-

(১) আমরা অসহায়, নিঃস্ব ও দুঃস্থের সেবা করব।

(২) অত্যাচারীকে জীবন দিয়েও বাধা দেব।

(৩) উৎপীড়িতের সাহায্য করব।

(৪) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখব।

(৫) গোত্রে-গোত্রে মিলন ও সম্প্রীতির চেষ্টা করব।

হযরত যে উপদেশ দিতেন নিজেও তা পালন করতেন। কোথায় কোন্ এতিম বালক কাঁদছে, কোন্ অসহায়া বিধবা পুত্র-কন্যা নিয়ে দুঃখে জীবন কাটাচ্ছে, কোন্ রুগী রোগের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সেগুলিই ঘুরে ঘুরে দেখতেন আর প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। তবু কেন মুহাম্মদ (দঃ) কোরেশদের চক্ষুশূল হলেন? সত্য ছাড়া মিথ্যা যিনি বলেন না, ন্যায় ছাড়া অন্যায় যিনি করেন না, ভাল ছাড়া মন্দের চিন্তা যাঁর মাথায় ছিল না–প্রেম ছাড়া ঈর্ষা যাঁর হৃদয়ে স্থান পায় নি, তাঁকে অপমান করার জন্য কোরেশ বালকবৃন্দ কেন উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত? পথে কাঁটা বিছিয়ে মুহাম্মদকে (দঃ) কষ্ট দেবার ঘৃণ্য মনোবৃত্তি পোষণ করত? হযরত শুধু বলতেন–'তোমরা মূর্তিপূজা করো না। আল্লাহর এবাদত কর। বল,–'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।' ইসলাম-ই -আল্লাহর মনোনীত ধর্ম এটাই ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ এনে দেবে।' এটাই কি হযরতের গুরুতর অপরাধ? হযরত কি আরবের প্রভুত্ব চেয়ে ছিলেন? মুহাম্মদ (দঃ) কি কোরেশ নেতাদের নেতৃত্ব কেড়ে নেবার জন্য কোন ষড়যন্ত্র করেছিলেন? কিছুই করেন নি। অথচ আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, ওৎবা প্রভৃতি আরবের বিখ্যাত নেতারা মুহাম্মদের (দঃ) শির নেবার জন্য কেন লালায়িত হলেন?

হযরতের মধুর আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছিলেন, যারা ইসলামের অমিয় বাণীতে মুগ্ধ হ'য়ে এ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের উপর চল্‌ল–অমানুষিক নির্যাতন। এ নির্যাতনের কাহিনী সবাই জানেন। উমাইয়ার ক্রীতদাস বেলাল যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর প্রভু পাষাণ উমাইয়া তাঁকে গলায় দড়ি দিয়ে কুকুর-শেয়ালের মত বালকদের দ্বারা মক্কার রাজপথে টেনে হিচ্‌ড়ে খেলা করত। মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত বালুকার উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখা হতো। এর উপর আবার নির্মমভাবে অভুক্ত অবস্থায় বেত্রাঘাত করা হতো। তবুও তিনি এ ধর্ম পরিত্যাগ করে নি। পাষাণের কাছে ক্ষমা চান নি–নিজের জীবন ভিক্ষা চান্ নি।

পাষাণ আবু জেহেল নবদীক্ষিত মুসলিম বীর ইয়াসির ও তাঁর স্ত্রী সুমাইয়াকে কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করল। তাঁদের পুত্র আম্বুরকে উটের পায়ে বেঁধে দিয়ে খণ্ড -বিখণ্ড করে রোষ মেটাল। শুধু তাই নয়, মুসলিম নারী জেন্নিরার চোখ উপড়ে ফেলা হলো। এছাড়া হযরত ওসমান, শোয়েব, খাব্বার প্রভৃতি মুসলিম ভক্তবৃন্দকে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হলো। হযরত স্ব-চক্ষে এগুলো দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তুবও কোরেশদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তলোয়ার ধরলেন না। বর্শার আঘাতেও কাউকে হত্যা করলেন না। নীরবে সহ্য করলেন। ধৈর্য ধরে শুধু আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানালেন আর নব-দীক্ষিত মুসলিমদের ত্রাণের জন্য উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি শুনেছিলেন, আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান সম্রাট নাজ্জাশী অত্যন্ত দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ। অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তিরা তাঁর নিকট অভিযোগ

www.pathagar.com

করলে সুবিচার পায়। হযরত স্থির করলেন–কোরেশদের দ্বারা অত্যাচারিত নব মুসলিমদের (সংখ্যায় তখন চোদ্দজন) আবিসিনিয়া পাঠাবেন। এই দলের মধ্যে হযরতের জামাতা ওসমান ও তাঁর আদরের কন্যা রোকেয়াও ছিলেন। অত্যন্ত সংগোপনে মুহাম্মদ (দঃ) তাদের দোয়া করে বিদায় দিলেন। এরপর হযরত আলীর নেতৃত্বে আরও ৮৩ জন নব-দীক্ষিত মুসলিম আবিসিনিয়া রওয়ানা হলেন। মাতৃভূমি ছেড়ে বিনা অপরাধে কে অজানা স্থানে পা বাড়ায়? কার জন্য এঁরা পবিত্র জন্মভূমি ছেড়ে আবিসিনিয়ায় গমন করলেন? হযরতের কোমল হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছিল, তবুও এ জালিম ও পাষাণদের অত্যাচারের হাত থেকে এদের রক্ষা করতেই এ ব্যবস্থা করলেন। এদের মক্কায় রাখতে হলে দুটি পথ ছিল। একটি হলো ইসলাম প্রচার বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ কাফের ও মোশরেকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিরাচরিত প্রথার উপর আস্থা আনা। স্বীকার করতে হয় দেব-দেবীকে, পূজা করতে হয় প্রতিমাপুঞ্জকে। হার মানতে হয় চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রের শক্তিকে। প্রণাম করতে হয় নারী মূর্তিকে। বলিদান করতে হয় সৃষ্টি-সেরা মানুষকে। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে হয় ক্রীতদাসদাসীকে। তাই কি মুহাম্মদ (দঃ) করবেন? আল্লাহর নবী কি অত্যাচারীর সঙ্গে হাত মেলাবেন? তা হতে পারে না–কিছুতেই না। অসত্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না–অন্যায়কে ন্যায় বলে স্বীকার করা যায় না–পূজা-পার্বণকেও উপাসনা বলে গণ্য করা যায় না। এ অলীক উপাসনা–এ কল্পিত চিন্তাধারা; এ অবাস্তবকে আল্লাহর নবী মেনে নিতে পারেন না কোন কালে, কোন যুগেই তা হয় নি। কোন নবীই অত্যাচারের ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন নি। আর বিশ্বের নবী, মানুষের নবী, জ্বীন ইনসানের নবী-তিনি কি করে আরবের এ পাষাণদের কাছে নত হবেন? হযরতের চাচা আবু তালেবকে যখন কোরেশ দলপতিগণ ভর্ৎসনা করে বলল–'আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদকে যদি নিবৃত্ত না করেন তা হলে আপনাকেও আমরা মুহাম্মদের সমর্থক বলে ধরে নেব এবং অচিরেই এর ব্যবস্থা করব। আবু তালেব একটু শঙ্কিত হয়ে মুহাম্মদকে ডেকে যখন বললেন, 'মুহাম্মদ তুমি নিবৃত্ত হও। এ ধর্ম পরিত্যাগ কর। দেব-দেবীদের নিন্দা করো না।' আল্লাহর নবী মুহাম্মদ প্রতি উত্তরে বললেন, "শুধু কোরেশ কেন, সমগ্র পৃথিবী যদি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও আমি এ সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব না।"

আল্লাহর প্রতি যার চরম বিশ্বাস, সত্যের প্রতি যার কঠোর ব্রত, তিনি বিপদকে তুচ্ছ মনে করেন। তাই নব-দীক্ষিত মুসলমানদের প্রতি কঠোর অত্যাচার, তাঁর নিজের উপর এমন বিপদের ঝুঁকি নিয়েও চললেন ইসলাম প্রচারে। আল্লাহর নির্দেশ, 'তুমি বল, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। অতএব সরল পথ অনুরসরণ কর এবং তাঁহার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মূর্তিপূজকদের জন দুঃসংবাদ।" (সূরা হা-মিম)

কোরশদের ভয় করার চেয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই হলো তাঁর ব্রত। তাই নীরবে সব অপমান, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ সহ্য করেও চললেন তাঁর পথে। এতে দিন দিন শত্রুতাও যেমন বাড়তে লাগল–দিগ্-দিগন্তে ইসলামের অমিয় বাণীও তেমনি ছড়াতে লাগল–আর এই তৌহিদ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে লাগল হাজার হাজার আরববাসী। আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুনতে লাগল। আবিসিনিয়ার নজ্জাশীর কাছে উপঢৌকনসহ দূত পাঠিয়েও ব্যর্থ হলো। নব-দীক্ষিত মুসলিমদের আরবে ফিরিয়ে এনে এ শয়তানের দল বিচার করবে, মুহাম্মদের সম্মুখেই শিরচ্ছেদ করে মুহাম্মদকে (দঃ)শিক্ষা দেবে–এ কল্পনাও যখন ব্যর্থ হলো, (খ্রীষ্টান সম্রাট নাজ্জাশী যখন দূতকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন) তখন ক্রোধে অভিমানে কোরেশ দলপতিদের মস্তিষ্কে আগুন ধরে গেল। আবু জেহেল এ অপমান সহ্য করতে না পেরে একদিন মুহাম্মদকে (দঃ) ধন্যমগ্ন অবস্থায় হেরা পর্বতে পাথর মেরে মাথায় চরম আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদ প্রচারিত হল মুহাম্মদের (দঃ)-এর বংশে। বীর

www.pathagar.com

কেশরী হামজা ও হযরতের চাচা এ সংবাদ শুনে পাগল হয়ে উঠলেন, এতো বড় স্পর্ধা, এত সাহস। মুহাম্মদের শরীরে আঘাত! কোথায় আবু জেহেল–কোথায় সে শয়তান, এই বলে ঘর থেকে বের হলেন।

বললেন এতবড় স্পর্ধা! আমার ভাতিজার শরীরে হস্তক্ষেপ! মুহাম্মদ (দঃ) কি অপরাধ করেছে? কার সে ক্ষতি করেছে? মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলা কি অপরাধ? আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করাই কি তার দোষ? সে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করছে। কারো উপর জোর করে তো এ ধর্ম চাপিয়ে দিচ্ছে না। এ জন্যই এত অত্যাচার? আমি বেঁচে থাকতে আমার ভাতিজাকে এত বড় আঘাত দেবে আর আমি তা সহ্য করব–তা হতে পারে না। কোথায় আবু জেহেল, কোথায় সে শয়তান। দেখে নিচ্ছি তার বাহাদুরী। এ কথা বলেই তিনি ছুটলেন আবু জেহেলকে ধরতে। দেখলেন কাবার ঘরে বসে আবু জেহেল ব্যঙ্গ হাসি হাসছে, কি ভাবে মুহাম্মদকে (দঃ) আঘাত করেছে তার বর্ণনা দিচ্ছে আর নিজের বাহাদুরী দেখাচ্ছে।

বীর হামজা আবু জেহেলকে দেখে ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠলেন এবং বললেন "ওরে শয়তান—তোর এতবড় সাহস, আমার ভাতিজার গায়ে হাত তোলা, জানস না সে আমার কে?" এই বলে বেদম প্রহার শুরু করলেন। বীর হামজার এ ভাব দেখে সবাই পালাতে শুরু করল। আবু জেহেল বিপদ দেখে বলল, ধর্মের জন্যই এ কাজ করেছি। হামজা এ কথা শুনে আরও রেগে গেলেন এবং বললেন ধর্মের জন্য! তবে শোন, এখনই আমি এই ধর্ম গ্রহণ করলাম।" এই বলেই উচ্চারণ করলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।"

ধর্মের বাতি আপনা আপনি জ্বলে, মিথ্যা টিকে থাকে না। সত্যও চাপা থাকে না। যুগ যুগেই মহামনীষীদের এরূপ বিপদ এসেছে। এমন আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, তবুও তাঁরা হতাশ হননি, নিবৃত্ত হন নি। শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেন নি। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। মুহাম্মদ (দঃ) আঘাত পেলেন সত্য কথা, তবুও চাচা আবু জেহেলকে অপমান করেন নি। তাঁর পক্ষ হয়ে বীর হামজা এ প্রতিশোধ নিলেন, মুহাম্মদ নন।

মুহাম্মদকে প্রাণে বধ করতে কত চেষ্টাই না আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ান করেছে। একদা এক সুন্দর যুবককে নিয়ে কোরেশ নেতৃদ্বয় আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হলো এবং প্রস্তাব দিল–আপনি এই সুন্দর যুবককে নিয়ে মুহাম্মদকে আমাদের হাতে সপেঁ দিন। আমরা তাঁকে হত্যা করব। এ প্রস্তাব শুনে আবু তালেব গর্জে উঠে বললেন, 'সাবধান–এতবড় কথা। মুহাম্মদকে তোমাদের হাতে সঁপে দেব? আবু তালেব এত নিচু নয়। বের হও শয়তান।

কোরেশ দলপতিদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ওৎবাকে পাঠানো হলো মুহাম্মদের কাছে। অতি বিনীত ভাবে হযরতকে বলল, "মুহাম্মদ, তুমি কোন্ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আমাদের জাতীয় ধর্মের বিনাশ করছ? যদি ক্ষমতার লোভী হও তবে বল, আমরা তোমাকে শিরভূষণ ক'রে আরবের সব ক্ষমতা ন্যস্ত করছি। যদি ধন রত্নের অভিলাষী হও তবে বল, স্বর্ণের মাঝে তোমাকে ডুবিয়ে রাখছি। আর যদি নারীর লোভী হও তবে বল আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী তোমার হাতে অর্পণ করছি।"

মুহাম্মদ একটু হেসে উত্তর দিলেন, "আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দ্র এবং বাম হস্তে সূর্য এনে দিলেও এ সংকল্প হতে বিচ্যুত হব না" এরপর কোরআনের একটি বাণী পড়ে ওৎবাকে শুনালেন। ওৎবা শুনে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন যে এ বাণী মানুষের রচিত নয়। মুহাম্মদের কথা নয়! এ বাণী ঐশ্বরিক। তাই সাহস পেল না আর কিছু বলতে। ওৎবার উপর সবাই চটে গেল। রাগে-অভিমানে ক্ষোভে সবার হৃদয় জ্বলে যেতে লাগল। তারা স্থির করল, যে ভাবেই হোক মুহাম্মদকে (দঃ) নিশ্চিহ্ন করতে হবে, নইলে বাপ দাদাদের ধর্ম টিকিয়ে রাখা সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। তখন তারা এক জরুরী সভা আহ্বান করল; এ সভায় শ্রেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত হলো। আবুজেহেল সবাইকে সম্বোধন করে তেজদীপ্ত কণ্ঠে অগ্নিবাণী বর্ষণ করল, কোরেশদের ধিক্কার দিল এবং শেষে ঘোষণা করল–'যে মুহাম্মদের মাথা এনে দিতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একশ উট পুরস্কার দেব। কে আছে এমন বীর?'

বীর ওমর তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ঘোষণা করল, "আমি প্রস্তুত। আমি প্রতিজ্ঞা করছি মুহাম্মদের শির না নিয়ে ফিরব না।"

পাঠকবৃন্দ, সবাই জানেন এর পরের ইতিহাস। কিভাবে হযরত ওমর হযরতের শির আনতে গিয়ে নিজের শির হযরতের নিকট উপহার দিলেন আর আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে ফেললেন, 'এ অধমকে দয়া করে ক্ষমা করুন–আপনার পবিত্র চরণতলে স্থান দিন।' একথা বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।'

ওমরকে হযরত গালি দিলেন না। শত্রুকে হাতে পেয়ে প্রতিশোধ নিলেন না। অথচ প্রথম থেকেই ওমর , আবুজেহেল, আবুলাহাব, আবুসুফিয়ান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হযরতের উপর যে ভাবে অত্যাচার করেছেন তার তুলনা বিরল। এত সহজে ওমরকে মাফ করবেন–এত কুকর্মের ইতিহাস ভুলে যাবেন এটা চিন্তা করলে প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষই অবাক না হ'য়ে পারে না। ওমর ঘরে ঢুকলে হযরত শুধু তার বস্ত্রটি টান দিয়ে বলেছিলেন, হে ওমর, আর কতকাল আঁধারের মাঝে হাবুডুবু খাবে। ইসলামের বিরুদ্ধে আর কতদিন শত্রুতা করবে?' ওমর যেন তড়িতাঘাত পেল, জ্ঞান-বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি, বীরত্ব সব হারিয় ফেলল। আবু জেহেলের কঠোর হুশিয়ারী–'ওরে আরবের বীরদল', আর কতদিন ঘুমিয়ে থাকবি? তোরা কি মৃত? তোদের মান ইজ্জত সম্ভ্রম, পৈতৃক ধর্ম সব মুহাম্মদের কাছে জলাঞ্জলি দিলি? লজ্জা নেই, শরম নেই, বাহুতে বল নেই, ঘৃণা নেই, অভিমান নেই? নিষ্ক্রিয়সব আরবের যুবকদল। ধিক্ তোদের জীবন'– এ সব কথা এক নিমেষেই ওমরের হৃদয় থেকে মুছে গেল। নাগরদোলার চাকার মত ওমরের মন সম্পূর্ণ ঘুরে পড়ল। ওমরের মত বীর যোদ্ধা, সাহসী ও পরাক্রমশালী একজন কোরেশ নেতার এ হেন পরিবর্তনে বহু অবিশ্বাসী ভীত হ'য়ে উঠল। অনেকেই মনস্থ করল হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অনেকে মনে মনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো, কিন্তু কোরেশ নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুনল। তারা বৈঠক করে আবার স্থির করল, মুহাম্মদকে (দঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সম্পূর্ণ ভাবে বয়কট করতে হবে। তাঁদের সঙ্গে উঠা-বসা, কেনা-বেচা, আত্মীয়তা, লেনদেন, কথাবার্তা সব কিছুই বন্ধ করতে হবে। তা হলে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সব বন্ধ হবে। এ অবস্থায় মৃত্যু বা আত্মসমর্পণ ছাড়া মুহাম্মদের (দঃ) উপায় থাকবে না। এ প্রস্তাব সবাই একবাক্যে মেনে নিল। মুহাম্মদ (দঃ) সব জানলেন, সব কিছুই শুনলেন। হযরত আবুবকরের (রাঃ) সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন 'শেব' নামক এক পর্বত গুহায় নওমুসলিমদের নিয়ে প্রস্থান করবেন। হৃদয়ে যাদের মায়া নেই, অন্তরে যাদের দয়া নেই, হিংসায় ভরা যাদের মন তারা কি এতে সন্তুষ্ট হতে পারে? মুহাম্মদকে (দঃ) কষ্ট দিয়ে যারা আনন্দ পায়, গালি দিয়ে যারা খুশি হয়, পাথর মেরে যারা অট্টহাসি হাসে, মুহাম্মদ চক্ষুর অন্তরাল হলেও তারা শত্রুতা করবে এটাই নিয়ম। মক্কায় থাকবার অধিকার কোরেশদের যেমন, মুহাম্মদ (দঃ), তাঁর বংশধর এবং নও মুসলিমদেরও তেমনি। আল্লাহর রাজ্যে সবার সম অধিকার। মক্কার পুণ্য ভূমিতে হাশিম, কোরেশ, মুত্তালিব, পৌত্তলিক সবাই যেখানে জন্মলাভ করেছেন–সেখানে মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর শিষ্যদের তাড়াতে হবে–এমন কুচিন্তা শুধু পাপিষ্ঠ শয়তানের মাথায়ই খেলে।

মুহাম্মদ (দঃ) নও-মুসলিম নর-নারী ও বালক-বালিকাসহ 'শেব' গিরি সংকটে আশ্রয় নিয়েও শান্তি পেলেন না। একে তো ঘর-বাড়ি জিনিসপত্র ছেড়ে কঠোর পরীক্ষায় দাঁড়লেন,

www.pathagar.com

তদুপরি এ জালেমদের অত্যাচারে প্রতি মিনিটে মিনিটে অস্থির হয়ে উঠলেন। না আছে খাবার পানি–না আছে খাদ্য সামগ্রী। তার উপর পাষণ্ডদের জুলুম। কোরেশগণ এ গিরি উপত্যকা দিনের পর দিন অবরোধ করে রাখল। বাইরে যাবার উপায় নেই, খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ নেই। যারা কাবায় রয়ে গেছে তাদের সঙ্গেও বয়কট। হাটে, বাজারে, বাস্তাঘাটে দোকানে কোথাও বের হতে দেয় না। মুসলিমদের এ দিনগুলো যেভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা কল্পনার বাইরে।

কোরেশদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হলো। জোয়াহের নামক একব্যক্তি কাবাগৃহে কঠোরভাবে যখন বলল, 'এমন স্বৈরাচারী ও পাষাণ রীতি আমরা মানতে পারি না। আমরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে খাওয়া পরা করব আর হাশিম বংশ না খেয়ে মরবে এ কেমন যুক্তি? আমরা এ প্রতিজ্ঞা ঘৃণার সঙ্গে ভঙ্গ করলাম।' তার এ প্রস্তাব সমর্থন করল জাময়া ও আবুল বাখতারী নামক দু'জন সহৃদয়বান বীরকিশোর। কোরেশদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। যারা মুহাম্মদকে (দঃ) মনে মনে শ্রদ্ধা করত তারা এবার এ সুযোগে ইসলাম কবুল করল। এর মধ্যে আর একটি ঘটনায় কোরেশগণ ভীত স্বন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। যখন আবুতালিব গিরি গুহাতে এসে সবাইকে বললেন–'দেখ, তোমাদের প্রতিজ্ঞা পত্রটি অক্ষত নেই। কীট সবটুকুই খেয়ে ফেলেছে। কেননা এটি আল্লাহর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরূদ্ধে। এ কথা যদি সত্য না হয় তবে মুহাম্মদকে (দঃ) তোমাদের হাতে সমর্পণ করতে রাজি আছি। আর যদি সত্য হয় তবে তোমাদের উচিত হবে না তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা।

মোতাম নামে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কাবার দরজায় পৌছিল এবং প্রতিজ্ঞা পত্রটি ছিঁড়ে নিয়ে এলো। দেখা গেল আবু তালেব যা বলেছেন সম্পূর্নই সত্য। উপস্থিত জনতার বুঝতে বাকি রইল না যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লারই রসুল। ইসলাম খাঁটি ধর্ম।

এ ঘটনার পর হযরতকে (দঃ) সসম্মানে জোয়াহের, মোতাম এবং অন্যান্য বিশ্বাসী কোরায়েশগণ গিরিগুহা হতে মক্কায় নিয়ে এলেন।

মুহাম্মদ (দঃ) ইচ্ছে করলে হযরত ওমর, হযরত হামজা, বীর জোয়াহের, মোতাম সবাইকে নিয়ে অত্যাচারী আবু জেহেল প্রমুখ কাফেরদের চরম শাস্তি দিতে পারতেন। ঘর-বাড়ি থেকে এদের উচ্ছেদ করে ঐ গিরিগুহায় বন্দী করে এর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। জনবল, বাহুবল ও ধনবল এ সময় হযরতের (দঃ) কম ছিল না। তবু করেন নি। চাচা আবু জেহেলকে কোন কড়া কথা বলেন নি, অসম্মান করেন নি। যারা বলেন, মুহাম্মদ (দঃ) যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, তলোয়ারের শক্তি দিয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন, তারা দেখুন, শিখুন হযরতের (দঃ) নীতি, উদারতা, মহানুভবতা, সভ্যতা, ভদ্রতা ও সহিষ্ণুতা। লাঞ্ছনা পেয়েও গালি দেন নি, মার খেয়েও মুখ তুলেন নি। গিরি সংকটে বন্দী হয়েও বিদ্বেষ করেন নি। সহ্য, ধৈর্য্য, প্রেম ও ভালবাসায় প্রচার করে চলেছেন।

এ মহান নীতি শুনল না, মানল না, বুঝল না এ পাষাণ আবু সুফিয়ান ও আবুজেহেলের দল। হযরতের তারা ভাবল মুহাম্মদকে আর কিছু দিন এ ভাবে সময় দিলে তাদের প্রাধান্য আর থাকবে না। কোরেশগণই এদের ঘরছাড়া করবে। তাই অতি সংগোপনে নতুন এক প্রস্তাব উত্থাপন করল। মুহাম্মদকে এ ধরা থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেল্‌তে হবে। তা হলে কেউ আর মুহাম্মদের নাম করবে না। নতুন ধর্মেও দীক্ষিত হবে না। এখন থেকেই ইসলামের কবর রচনা হবে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।"

এ প্রস্তাবে সবাই সমর্থন করলো। কিন্তু কে সেই বীর যে মুহাম্মদকে খুন করবে? কার সে সাহস? হযরত ওমরের মত বীর যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে এমন বীর কে–যে মুহাম্মদকে মারবে? কেউ ওমরের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল না। কেউ স্পর্ধা করেও বলবার সাহস পেল না–'আমিই মুহাম্মদের শির এনে দেব।' সবার বাহু যেন ভয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। হৃদয়ে সাহস নেই–বুকেও বল নেই। এ ছাড়া আর এটি সমস্যা, যা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল যে কে মুহাম্মদকে খুন করবে–তার চোদ্দ পুরুষ হাশিম ও মুত্তালিব বংশের শত্রু

www.pathagar.com

হবে। এক মুহাম্মদকে মারতে গিয়ে সারা আরবে আগুন জ্বলবে। এ কথা চিন্তা করে স্থির হলো, প্রতিটি বংশ হতে একজন ক'রে বীর আবু জেহেলের নেতৃত্ব যোগ দেবে এবং মুহাম্মদকে হত্যা করবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর রাতে সবাই মুহাম্মদের বাসগৃহ ঘেরাও করল। ভাবল মুহাম্মদ যখন ভোরে বিছানা ত্যাগ করবেন, নামাজ পড়তে বের হবেন ঠিক তখনই একযোগে মুহাম্মদের (দঃ) শিরে আঘাত করবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হলো, আশা-প্রত্যাশা নিয়ে সবাই উৎফুল্ল মনে দাঁড়িয়ে রইল-কোন্ সময় মুহাম্মদ ঘর থেকে বের হন। ভোর হলো পাখি ডাকল। নীরব নিঝুম রজনী শেষ হলো। মুহাম্মদ ঘুম থেকে উঠলেন না। আর দেরি করা চলে না। লোকজন উঠে পড়লে বিপদ। তাই আবু জেহেল দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেই অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে চাদর ধরে টান দিল। ছুরিকাঘাত করবে, এর মধ্যেই দেখতে পেল, মুহাম্মদ নন, আলী। আবু জেহেল রাগে অভিমানে কাঁপতে লাগল, বল্‌ল, 'আরে আলী যে! মুহাম্মদ কোথায়?' আলী ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে উত্তর দিলেন–'মুহাম্মদ কোথায়, কে জানে, দেখে নাও।" এ কথা বলে নির্ভিক চিত্তে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মুহূর্ত মধ্যে এ ঘটনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জা ও অপমানে এরা জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। মুহাম্মদকে মারতে না পারলে সারা আরবে এদের ঠাঁই হবে না। তাই অশ্ব নিয়ে ছুটল আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান প্রভৃতি আস্ফালনকারী নেতারা। কিন্তু পারল না মুহাম্মদকে (দঃ) ধরতে। তাঁকে খুন করতে। তাঁর শির নিয়ে মক্কার পথে পথে খেলা করতে।

মুহাম্মদ (সঃ) সব কথা জানলেন জিব্রাইল মারফৎ। তাই আবু বকরের সঙ্গে পরামর্শ করে হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় সবার অজান্তে, শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে গভীর রাতে পর্বত গুহায় স্থান নিলেন। পাহারাদার বীর কোরেশ সেনাদল কেউ বুঝল না, টের পেল না, মুহাম্মদ কোন্ সময়, কোন্ স্থান দিয়ে কোন্ দিকে পালিয়ে গেছেন। রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহর বাণী যিনি প্রচার করেন—আল্লাহর মনোনীত ধর্ম যিনি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, তাঁর সাথীতো আল্লাহ নিজেই। তাই যে পর্বত গুহায় হযরত (দঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন,সেখানে বার বার ঘুরেও আবু জেহেল টের পেল না, মুহাম্মদ (দঃ) তার চোখের ডগার উপরেই বসে আছেন। গুহার মুখ নিরিহ ও বুদ্ধিহীন এক প্রাণী বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখবে আর আবু জেহেলকে সেই জালেই নিবদ্ধ করে প্রতারণা করবে, কেউ কি তা ভাবতে পারে? এ কার খেলা! এ কার লীলা! কার এ ইঙ্গিত!

মক্কায় বাস করা হযরতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কোথায় যাবেন, কোথায় বা স্থান পাবেন। পথে ঘাটে, যেখানে যান সেখানেই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অত্যাচার, অবিচার। তাঁর ভক্ত অনুসারীদের মদিনায় পাঠাবেন তাতেও বাধা। কেউ ধন-সম্পদ, সোনা-রূপা নিয়ে মদিনায় যেতে পারবে না। কাউকে স্ত্রী রেখে, কাউকে ছেলে-মেয়ে রেখে, কাউকে বা স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ সবই ত্যাগ করে চলেই যেতে হয়। কি ব্যথা হযরতের (দঃ) মনে। শেব পর্বতে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেলেন না। তায়েফ গমন করেও স্থান পেলেন না। ভেবেছিলেন তায়েফবাসী তাঁকে আদর ও সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নেবেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! খ্রীষ্টান নাজ্জাশী হযরতের (দঃ) নাম শুনে দূর থেকে বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহর নবী–তিনিই শেষ পয়গাম্বর। তাই আবু জেহেলের দূতকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন। নও-মুসলিমদের তাঁর রাজ্যে বসবাস করার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আর এ নির্মম, মূঢ়, অশিক্ষিত তায়েফবাসী মুহাম্মদকে (দঃ) নির্মমভাবে পাথর মেরে ক্ষত-বিক্ষত করল। অপরাধ শুধু এই যে, তিনি সত্যের পথে তায়েফবাসীকে আহ্বান করেছিলেন। আল্লাহর একত্ববাদকে

www.pathagar.com

স্বীকার করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মক্কায় অত্যাচার করলেও কিছু সংখ্যক ধার্মিক ও সহৃদয়বান ব্যক্তি হযরতের (দঃ) পক্ষ সমর্থন ক'রে বাধা দিতেন, জীবন উৎসর্গ করে হযরতকে সাহায্য করতেন। কিন্তু তায়েফে এসে একটি লোকেরও সহানুভূতি পান নি। বরং পেলেন–আঘাত শত আঘাত, নির্মম আঘাত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস, আর রাস্তার দু'ধারে রক্ষিত বালকদের প্রস্তরাঘাতে হযরত (দঃ) যেমন মানসিক যন্ত্রণা পেলেন, তেমনি ক্ষত-বিক্ষত পবিত্র চরণযুগল থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পথের মাঝে পড়ে গেলেন। এদিকে একমাত্র সঙ্গী জায়েদ, সেও একইভাবে অত্যাচারিত ও আঘাত প্রাপ্ত। তবুও নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে হযরতকে (দঃ) কাঁধে তুলে শহর থেকে বেরিয়ে এলেন। পার্শ্ববর্তী একটি আঙ্গুরের বাগানে হযরতকে রেখে প্রাণপণে সেবা যত্ন করার পর তাঁর চেতনা হলো। হযরত (দঃ) ঐ অবস্থাতেই নামাজ পড়লেন এবং দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেন ঃ

"হে আল্লাহ্! হে আমার প্রতিপালক–তোমাকে আমি স্মরণ করছি। আজ অবিশ্বাসী তাফেয়বাসী না বুঝে আমার প্রতি যে অত্যাচার করেছে এ জন্য তুমি তাদের শাস্তি দিও না প্রভু। তুমি তাদের ক্ষমা কর। তাদের কোন দোষ নেই। আমার অক্ষমতার দরুণই হোক বা দুর্বলতার কারণেই হোক, তারা তোমার বাণীকে গ্রহণ করতে পারে নি। তুমি আমাকে এহেন সময়ে সাহায্য কর। তুমি রহমানির রহিম তুমি আমাদের ভরসা। তোমাকে ছাড়া আমাদের আর কোনই সাহায্যকারী নেই। তুমি নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্বলের সাথী। হে আমার প্রভু! তুমি আমার প্রচেষ্টাকে কি সফল করবে না? তুমি কি অবিশ্বাসীদের উপর আমাকে জয়যুক্ত করবে না? ওরা কি চিরদিন আমাকে ভুল বুঝবে? ওরা কি তোমার পথ থেকে চিরদিন দূরে সরে থাকবে? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক খোদা! তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তুমি খুশি থাকলে–আমার ব্যথা-বেদনা, দুঃখ দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হাসিমুখে সইতে পারব। তুমি আমার চালক–আমার আশা ও ভরসা।"

জানি না দুনিয়ার বুকে কটা নিদর্শন এরূপ রয়েছে। কে সে মহান যিনি মার খেয়েও ভুলে যান? লাঞ্ছিত হয়েও ফিরে তাকান না। অত্যাচারিত হয়েও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন না। নির্মম, পাষাণ তায়েফবাসী যারা আল্লাহর নবীকে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে এভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, ভণ্ড নবী বলে দেশ থেকে বের করে দেবার আদেশ দিয়েছিল, পথের আবর্জনা গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে অপমান করেছিল–দশদিন দশরাত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস অত্যাচারে জর্জরিত ক'রে তুলেছিল, সেই তায়েফবাসীর জন্যই এ কোন্ মহামানব আল্লাহর কাছে শাস্তির পরিবর্তে শান্তি চান, ধ্বংসের পরিবর্তে ক্ষমা চান? ইচ্ছে করলে হাত তুলে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারতেন, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য আকুল আবেদন জানাতে পারতেন, বিচারের জন্য ফরিয়াদ করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে করলেন তাদের ক্ষমার জন্য মুনাজাত। নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা বলে তায়েক-বাসীদের নিরপরাধী করলেন বিচারকের কাছে। কথাগুলো যদি অন্যরূপ নিত তায়েফ বাসীদের চরিত্রের সামন্য রূপটাও যদি বিচারকের কাছে পেশ করা হতো তা হলে কি হতো কে জানে? আদ-সামুদ, কারুণ-ফেরাউন, সাদ্দাদ-নমরুদ সবই ত ধ্বংস হয়েছিল। হযরত দাউদ ত জুলুমের হাত থেকে বাঁচতে একই বিচারকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এই বলেঃ-

www.pathagar.com

'হে প্রভু! তাহাদের দন্তসমূহ চূর্ণ কর, তাহাদিগকে অগাধ সলিলে নিমজ্জিত কর, তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড কর, তাহাদের প্রত্যেককে ধ্বংস কর। তাহাদের কাহারো প্রতি দয়া করিও না। (বাইবেল–জবুর, গীতসংহীতা ৫৮৬–৮ এবং ৫৯৫–১৩)

সমগ্র তায়েফ নগরী নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ পাহাড় অথবা সাগর করে দিতে পারতেন। অথবা যুগ যুগের জন্য তায়েফবাসীদের ভেড়া, ঘোড়া অথবা অভিশপ্ত বানর করেও রাখতে পারতেন, যেমন–করেছিলেন পূর্বকালে। আল্লাহ দেখেছেন ঠিকই, বিচারও করতেন ঠিকই। অপেক্ষা করেছিলেন শুধু হযরতের প্রার্থনার দিকে। যে প্রার্থনা করলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর হলো বিফল হলো না। তায়েফবাসীরা রক্ষা পেল। বুঝতে পারল না। আল্লাহর দেওয়া বিপদ কি? প্রতিশোধ কাকে বলে।

শুধু তায়েফবাসী নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য হযরত (দঃ) সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক, কোরেশ সবাই হযরতের অমঙ্গল করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু হযরত কারো অমঙ্গল চান নি, কাউকে অভিশাপ দেন নি। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে এজন্য অভিশাপ করেন নি। শত্রু বিপদে পড়লেও তিনি খুশি হন নি। এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য। আবু জেহেল যখন হযরতকে কূপে ফেলার চেষ্টা করে নিজেই সে কূপে পড়ে যায় তখন মুহাম্মদই (দঃ) তাকে কূপ থেকে রক্ষা করেন। যে বুড়ী মুহাম্মদকে (দঃ) কষ্ট দেবার জন্য প্রতিদিন পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত সে অসুস্থ হলে তিনিই তাকে দেখতে যান–এবং তার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। মানুষের সেবা ও মানুষক বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্যই যে হজরত মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম হয়েছিল এ কথা আমরা বললে বিজাতিরা বিশ্বাস নাও করতে পারে। দেখুন সর্ব জীবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দেন।

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রসুল আগমন করিয়াছে, তোমরা বিপদাপন্ন হও, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য, তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্খী বিশ্বাসিগণের জন্য স্নেহশীল করুণাময়।" (সূরা তওবা। আয়াত ১২৮)

মদিনার পথে হযরত

বেইমান কোরেশদের হাত থেকে জীবন রক্ষার্থে তিনি নিজ গৃহ হতে বের হয়েছেন। তিন দিন তিন রাত মক্কা হতে তিন মাইল দূরবর্তী **'সওর'** পর্বতে অবস্থানের পর সিদ্ধান্ত নিলেন মক্কা ছেড়ে মদিনায় প্রস্থান করতে। আগে থেকেই কিছুটা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। হযরত আবুবকর তাঁর নিজস্ব দ্রুতগামী একটি উট মদিনায় যাবার জন্য প্রস্তুত রেখেছিলেন। ঠিক সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ দিন ভোরে উট দুটি **'সওর পর্বতে'** নিয়ে আসা হলো। আবুবকরের পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর নিজস্ব আর একটি উট নিয়ে তাঁদের সঙ্গী হলেন। একটি উটে হযরত, অন্যটিতে আবুবকর (রাঃ) ও আমের আরোহণ করলেন। মোট ৪ জন যাত্রী অতি সংগোপনে মক্কা ছেড়ে লোহিত সাগরের উপকূল বেয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন।

কার মন চায় আত্মীয়স্বজন, পরিবার পরিজন, জানা-চেনা, সব কিছু ছেড়ে এক অজানার পথে পা বাড়াতে। মক্কা পবিত্র জন্মভূমি কতই না আদরের। প্রতিটি বালুকার কণা তাঁর কাছে কতই না আপন। স্নেহ-মায়ামমতায় ভরা এ মাতৃভূমি। তাকে ছেড়ে যেতে কি মনোব্যথা, কি কষ্ট সেটা শুধু সেই অনুভব করবে যে স্বদেশ হতে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়। হোক না পৌত্তলিক, হোক না বেদুইন, হোক না কোরেশ, তারাও যে তাঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ় সব কয়টি জীবনের স্তর এ

www.pathagar.com

স্মৃতির দিকে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে বলে উঠ্‌লেন, "হে মক্কা। হে আমার জন্মভূমি। তুমি কতই না পবিত্র? দুনিয়ার সব বস্তুর চেয়েই তোমাকে আমি বেশি ভালবাসি। এরা যদি আমাকে না তাড়াতো তা হলে আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" (হাদিস)

দুনিয়ার মানুষ একবার দেখে নাও। স্বদেশের মায়া কেমন। হযরতের স্বদেশ প্রেম কেমন। নিজের দেশকে যারা ভালবাসে–নিজকে তারা ভালবাসে। নিজকে যারা ভালবাসে–পরকেও তারা চেনে। স্বদেশের মাটি সবচেয়ে খাঁটি–এ জ্ঞান যাদের নেই তারা নরাধম, নিকৃষ্ট। নিজের দেশের বিরুদ্ধে যারা মুনাফেকী করে, স্বদেশকে যারা জালিম ও অত্যাচারীর হাতে তুলে দিয়ে খেলা দেখতে চায়, তারা ধর্মের শত্রু, রসুলের (দঃ) শত্রু ও আল্লাহর শত্রু।

হযরত মক্কা হ'তে বেরিয়ে গেছেন এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোরেশ সর্দারগণ ঘোষণা করল–'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ এবং আবুবকরকে জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় এনে দিতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।'লোভী আরব দস্যুগণ এ ঘোষণা শুনবার পরমুহূর্তেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কে কার আগে মুহাম্মদ (দঃ) ও আবুবকরকে ধরিয়ে দিয়ে বিজয়ের মালা নেবে এবং একশত উট উপহার পেয়ে ধন্য হবে চল্‌ল এর প্রতিযোগিতা। প্রথমেই বলেছি, লোভ-লালসা, নারী হত্যা, লুণ্ঠন, খুন-খারাবীকে এ পশুর দল গৌরবের কাজ বলে মনে করত। তাই মুহাম্মদকে খুন করা বা ধরিয়ে দেওয়া তাদের কাছে মানবতার অবমাননা নয়, কৃতিত্ব ও স্বার্থ। এই স্বার্থের লোভে সুরাকা নামে এক দস্যু অশ্বারোহী হযরতের পিছনে পিছনে ছুট্‌ল। অশ্বের গতি উটের গতির চেয়ে শতগুণ বেশি। তাই মুহাম্মদকে (দঃ) ধরতে দেরি হলো না। মুহাম্মদ দেখলেন বিপদ মহা-বিপদ। এ ক্ষুদ্র দল কোনক্রমেই সুরাকার দলকে পরাস্ত করতে পারবে না। মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে হযরত যখন উর্ধ্বদিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বললেন **'ইয়া রহমান'**–তখন আকাশ -বাতাস কম্পিত হয়ে উঠল। এর পরই হযরত সূরা রহমান পাঠ করতে শুরু করলেন। এ অমিয় বাণী সুরাকার কর্ণকুহুরে প্রবেশ করা মাত্রই তার দেহ অবশ হয়ে গেল। এ সময় এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। সুরাকার অশ্বের দুটি পা চোরা বালুকাস্তুপের মধ্যে পড়ে গেল। সুরাকা তখন প্রাণপন চেষ্টা করল–অশ্বকে তুল্‌তে পারল না। অশ্বটি ভয়ে ভীষণভাবে চিৎকার শুরু করল। মরুভূমির চোরা বালির পাহাড় শুধু অশ্বকেই গ্রাস করবে না–সুরাকাকেও টেনে নেবে, এই ভয়ে সে চিৎকার দিয়ে বল্‌তে লাগল–'হে উট যাত্রীদল দাঁড়াও। আমাকে সাহায্য কর। আমি কসম করে বলছি–আমি তোমাদের শত্রু নই। আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাও।'

হযরত দাঁড়ালেন। পিছনে অগ্রসর হতেই সুরাকা মুহাম্মদের (দঃ) পবিত্র মুখপানে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর।' মুহাম্মদ (দঃ) হাসি মুখে তাকে ক্ষমা করলেন। অশ্বটিকে উদ্ধার করলেন।

যে পাষাণ দস্যু হযরতকে মারতে যাচ্ছে, তাঁর শির নিতে পারলে একশত উট পুরস্কার পাবে সেই দস্যুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে কে ক্ষমা করে? শত্রু নিপাত করতে পারলেই ত মুক্ত–এটাই ত বীরত্ব, এটাই ধর্ম। কিন্তু কি আশ্চর্য! একবার নয় দুবার নয়–একটি নয়, দু'টি নয় শত শত বেঈমান বিধর্মী জালেমকে এইভাবে ক্ষমা করে চলেছেন আল্লাহর নবী। তবু যারা বলে মুহাম্মদ (দঃ) যুদ্ধমনা ছিলেন–তরবারীর মাধমে ইসলাম প্রচার করেছেন তারা আরও দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করুন চোখ খুলবে অন্তরের কাঠিন্য দূর হবে।

মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর সঙ্গীদল প্রায় মদিনার নিকটবর্তী হয়েছেন, ঠিক এমন সময় আর একটি বিপদ উপস্থিত হলো। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। পুরস্কারের লোভে আসলাম গোত্রের এক দস্যু ৭০ জন যোদ্ধা নিয়ে হযরতকে মারবার আশায় আগে থেকেই

www.pathagar.com

ঐ পথে অপেক্ষা করছিল। মুহাম্মদকে কাছে পেয়েই চিৎকার দিয়ে সবাই অগ্রসর হলো। চতুর্দিক থেকে যখন তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হলো তখন হযরত কোন উপায় না দেখে উপর দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে **'সূরা রহমান'** পাঠ করতে লাগলেন। অপূর্ব সুর লহরীতে আকাশ-বাতাস মুগ্ধ হলো। আর শুক্রর বল-ভরসা, লোভ-লালসা এক মিনিষেই অন্তর্হিত হলো। হযরত যতই সূরা রহমান পাঠ করতে লাগলেন বারিদার হৃদয় ততই কোমল হতে লাগল। এরপর হযরতের চোখে চোখ পড়তেই বারিদা জ্ঞান শক্তি হারিয়ে ফেলল। সম্মুখে যেন অন্ধকারের এক বিভীষিকা মূর্তি ভেসে উঠল। সঙ্গীরা সবাই হতভম্ব। সবার হাত অবশ। হাতের তীর মাটিতে পড়ে গেল। অশ্বগুলিও নিস্তেজ। মনে হলো, কে কোথা থেকে এসে এদের বন্দী করেছে। হাতের অস্ত্র দেহের বল কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যদের যে দশা হয় এ পাষাণ বারিদার সঙ্গীদেরও ঠিক তাই হয়েছে। পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। এখন উপায় কি? কোনদিকে যাবে? মদিনার দিকে? প্রাণ কাঁপে, ধরা পড়বে, মার খাবে আরবের দিকে? শক্তি নেই, অশ্ব অচল। কোরেশগণ বল্‌বে লাঞ্ছিত পরাজিত, কাপুরুষ বেদুইন। কি বিপদ? কার বিপদ কার মাথায় চাপে! বারিদা অবশেষে অশ্ব হতে নামল–মুহাম্মদের (দঃ) দিকে অগ্রসর হয়ে হাত জোড় করে বলল—"মুহাম্মদ (দঃ) ক্ষমা করুন। চরম অপরাধ করেছি। জীবনে এরূপ জঘণ্য কাজে আর লিপ্ত হব না। বিশ্বাস করুন।"

মুহাম্মদ (দঃ) বারিদার এ মিনতী ও আবেগপূর্ণ কথা শুনে স্মিত হাস্যে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এমন গুরুতর অপরাধ করে বারিদা ও তার সঙ্গীদল ক্ষমা পাবে একথা তারা ভাবতেও পারে নি। তাই আনন্দের অশ্রুতে ভরে গেল এদের মন। হযরত যখন ওদের দেশে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন তখন আরও আশ্চর্য হয়ে বারিদা বলল–'না হযরত, দেশে আর ফিরব না। সারা জীবন আপনারই পাশে থাকব। আপনারই খেদমতে জীবন ধন্য করব।' এই বলে আনন্দের সঙ্গে উচ্চারণ করল–'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' বারিদার সঙ্গে বাকি সৈন্যদলও ইসলাম গ্রহণ করল –আর হযরতের সঙ্গেই মদিনার দিকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে দিতে অগ্রসর হলো, কি আনন্দ কি বিজয়।

তরবারী নয়, হযরতের মুখ নিঃসৃত মন্ত্রমুগ্ধ বাণীই ইসলামের প্রাণ, ইসলামের তেজ, ইসলামের শক্তি। এ মহাবাণী আকাশে বাতাসে ঢেউ খেলে। এ বাণী প্রাণের সঞ্চার করে–এ বাণী ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক, বেদুইন, কোরেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। এর প্রমাণ মদিনার অধিবাসী। আকাবার উপদেশ (Lesson) পেয়ে মদিনার কয়েকজন ভক্ত ভিতরে ভিতরে যখন ইসলাম প্রচার শুরু করে তখন থেকেই মদিনাবাসীদের বিশ্বাস একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। নব দীক্ষিত মুসলমানদের মুখ থেকে তাঁর বাণী শ্রবণে এ বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়। তাই মদিনাবাসীরা মুহাম্মদকে (দঃ) কাছে পেতে ছিল উদ্‌গ্রীব। মুহাম্মদের (দঃ) শির নেবার জন্য কোরেশ নেতৃবৃন্দের যে ঘোষণা, মুহাম্মদের (দঃ) বাসগৃহ হ'তে অন্তর্ধান, শেষে পর্বতে বন্দী জীবন, তায়েফবাসীদের নির্মম অত্যাচার সবকিছুই তারা শুনে ছিল পেয়েছিল মুহাম্মদের (দঃ) মদিনা আগমনের আভাস। তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাঁর আগমন প্রতীক্ষায়। আজ হযরত মদিনায় আসছেন। আজ যেন মদিনার আকাশ-বাতাস হাঁসছে। হযরতকে কোলে তুলে নেবার জন্য মদিনা নগরী দুহাত বাড়িয়ে স্নেহের ডাক দিচ্ছে। ইহুদী, খ্রীষ্টান, নও মুসলিম, নারী, পুরুষ ও বালক -বালিকারা রাস্তায় সারিবদ্ধ হ'য়ে স্বাগত জানাতে ব্যাকুল হয়ে আছে। আনন্দের ধ্বনিতে মদিনা যেমন মুখরিত, 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে কাফেলার মনও তেমনি উচ্ছ্বসিত। মহা উল্লাসের এ মহাবিজয়ে হযরতের প্রান আজ নাচ্‌ছে, দুল্‌ছে, খেল্‌ছে, চোখ থেকে আনন্দের ঝরণা ঝরছে। অতীতের স্মৃতি সব তখন মুছে

www.pathagar.com

গেছে। কে কার আগে অভিবাদন জানাবে, কে কার চেয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে মুহাম্মদকে আলিঙ্গন করবে, কে কোন উপহার মুহাম্মদের গলায় পরিয়ে ধন্য হ'বে চল্‌ছে তার প্রতিযোগিতা।

মুহাম্মদ (দঃ) বিনা বাধায়, বিনা দ্বিধায়, বিনা রক্তপাতে মদিনা শহরে প্রবেশ করলেন। ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিকরাও নবীজীকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর সান্নিধ্য আসলেন। হযরত সবাইকে পরম আদরে বুকে স্থান দিলেন। ইহুদীর প্রতি হিংসা নেই, অমুসলমান বলে ঘৃণা নেই, মূর্তিপূজক বলেও কোন বিদ্বেষ নেই, সবারই আপন মুহাম্মদ (দঃ), সবারই প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ), সবারই শ্রদ্ধার পাত্র মুহাম্মদ (দঃ) সবচেয়ে বেশি প্রিয় মদিনার কিশোর-কিশোরী, উদার প্রাণের বালক-বালিকারা। তারা যখন হযরতকে (দঃ) ঘিরে দপ্ বাজিয়ে এবং হযরতের প্রশংসা গীতি গেয়ে সবার প্রাণ হরণ করল তখন মুহাম্মদ (দঃ) আদর করে এদের চুমো দিলেন এবং আলিঙ্গন করলেন। ছেলে-মেয়েদের হৃদয় খুশিতে তখন ভরপুর হলো। কচি শিশুদের ভালবাসা, তাদের হৃদয় জয় করা একমাত্র মহৎ ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।

কে হযরতকে কাছে পাবে–কে তাঁকে আশ্রয় দেবে, এ নিয়ে সবার মধ্যেই চলল এক প্রতিযোগিতা। দূরদর্শী হযরত দেখলেন-বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন সমাজের অধিবাসী নিয়েই এ মদিনা। যদি নওমুসলিম কোন ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নেন তা হলে মুসলিমদের মধ্যেই হবে রেষারেষি। খ্রীষ্টানদের ঘরে গেলে–ইহুদীরা হবে শত্রু। আর ইহুদীদের অনুরোধ রক্ষা করলে, পৌত্তলিক, খ্রীষ্টান ওরা হবে বৈরী। তাই সব দলের অনুরোধ উপেক্ষা করে ঘোষণা করলেন, তাঁর উট যেখানে গিয়ে থামবে যার ঘরের কোণে আশ্রয় নেবে হযরত তার আতিথ্যই গ্রহণ করবেন। এ ঘোষণায় প্রতিটি গোত্রই খুশি হলো। ভক্তিতেও হৃদয় আপ্লুত হলো। একবাক্যে সবাই বলল, **'ইনিই আল্লাহর নবী।'** উৎসুক দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে রইল ঐ উটের উপর। দেখা গেল মদিনা শহরের দক্ষিণ পাশে এক সুন্দর ময়দানে উট হাঁটু গেড়ে বসল। সবাই হৈ-চৈ করে উঠল। রসুল (দঃ) সবাইকে নিয়ে সেখানে নামলেন। এর পাশেই ছিল আবু আয়ুব নামে এক ব্যক্তির দোতলা বাড়ি। এ বাড়ির নিচ তলায় হযরত আশ্রয় নিলেন।

যে স্থানে হযরতের উট আল-কাসওয়া বসে পড়েছিল ঐ স্থানটি ছিল দুটি এতিম বালকের। স্থানটি হযরতের পছন্দ হলো। ইচ্ছা করলেন ঐ স্থানে একটি স্মৃতি গড়ে তুলতে। সে স্মৃতি হবে আল্লাহর নামে স্মৃতি যেখানে সারাদিন ভক্ত মুসলমানেরা তাঁর নাম জপ করতে পারে–সারিবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করতে পারে। এ প্রস্তাবে সবাই খুশি হলো। এ ছাড়া কত দিনই বা মুহাম্মদ (দঃ) অন্যের বাড়িতে থাকবেন। নিজস্ব একটি বাসস্থান তো প্রয়োজন। হযরত ঐ বালক দুটিকে ডাক্‌লেন–স্থানটি কিনে নেবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বালক দুটি স্ব-ইচ্ছায় বিনা মূল্যে ঐ জায়গা হযরতের নিকট হস্তান্তর করবার অভিপ্রায় জানালে–হযরত খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন–মূল্য নিতেই হবে। তাই দশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এ স্থানটি ক্রয় করলেন। সেখানেই গড়ে উঠল পুণ্য স্মৃতি মদিনার প্রথম মসজিদ। আকৃতিতে প্রায় ১০০ হাত প্রস্থ আর ১০০ হাত দৈর্ঘ। এ মসজিদের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐতিহাসিকরা লিখে চলেছেন বহু কথা। এই মসজিদেই হ'তো সাহাবা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বৈঠক। এখানে হতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এখান থেকেই হতো ইসলামের অমিয় বাণী প্রচার। এ মসজিদের মিনার থেকেই উঠ্‌ত বেলালের সুললিত আজান ধ্বনি–যা শুনে হতো সবাই মুগ্ধ। আর হিংসুক ও পাষাণদের হৃদয় উঠ্‌ত কেঁপে। এখানে বসত ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলিম, পৌত্তলিক, স্বজাতি-বিজাতির বৈঠক। এটাই ছিল কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী, দেশী-বিদেশী, অতিথি ও রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলন স্থান। এখান থেকেই হতো পরিকল্পনা।

www.pathagar.com

এখানে হতো জটিল সব সমস্যার সমাধান। এ মসজিদই হলো ইসলামের পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র, বিশ্ব মসজিদ সমূহের আদি মডেল। আর এ মডেল দিয়েছিলেন ইসলাম প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র যে একই সূত্রে গ্রথিত এ মন্ত্র সর্বপ্রথম উত্থিত হয় এই শান্তিনিকেতন মদিনার মসজিদে। এই মসজিদই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম প্রচার করেন–

"প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তারা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিবে না। পরস্পর সাহায্য করিতে বিরত থাকিবে না এবং পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখিবে না। অন্তঃকরনই পুণ্যকাজের বাসস্থান। অতএব সেই ব্যক্তিই পুণ্যশীল যে অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করে না। এক মুসলমানের জিনিস অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।' (মুসলিম)

সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, সভ্যতা-ভদ্রতা, কঠোরতা কোমলতা ও মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ লাভ করল এ মসজিদের আঙ্গিনা হতেই। এখানেই হতো বিচার। এ মসজিদে লেখা হতো সন্ধিপত্র। এখান থেকেই কঠোর হুশিয়ারী পাঠান হতো রাজা, মহারাজা ও সম্রাটদের কর্ণকুহরে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিও রচিত হলো–মদিনার এ মসজিদ থেকেই। বিশ্বের কাছে পরিচিত হলো যে মসজিদ তাঁর ভিত্তিমূল স্থাপন করলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

শান্তির বাণী ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক সবাই আকৃষ্ট হচ্ছে হযরতের দিকে। মদিনা শহরের গৌরব, মদিনার প্রতিপত্তি,মদিনার মান সম্ভ্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে হযরতের আগমনে। মদিনার মুসলমান সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলল। এদের অন্তরে আশা আলোকের এক নবীন কিরণচ্ছটা দোল খেলতে লাগল। অত্যাচারের ভয় নেই, জীবন নাশেরও কোন আশঙ্কা নেই। তায়েফবাসীর মত, কোরেশদের মত বেঈমানী ও অত্যাচারী স্বভাব মদীনাবাসীদের হৃদয়কে দগ্ধীভূত করল না। প্রেম-প্রীতি,দয়া-মায়া ও সহানুভূতিতে আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক গড়ে উঠল। হযরত তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে কোন জুলুম বা অত্যাচার করলেন না। বরং সবার ধর্মকেই সুষ্ঠু ভাবে পালন করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর উদারতা ও মহানুভবতায় এমনি দলে দলে বিজাতীয়রা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল।

হযরতের সম্মান ও আধিপত্যের কথা আরবের কোরেশ ও বেদুইনদের কানে পৌঁছিল। হিংসায় এদের দেহ মন পুড়ে ছাই হতে লাগল। সহ্য করেত পারল না। সুযোগ খুঁজতে লাগল কিভাবে নব্য মুসলমান ও মুহাম্মদ (দঃ)কে চিরতরে এ ধরা হতে বিদায় করা যায়। মদিনায় গিয়ে যুদ্ধ করবে? না মদিনার ইহুদী, পৌত্তলিক ও খ্রীষ্টানদের উত্তেজিত ক'রে মুহাম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে? নানা চিন্তা নানা পরিকল্পনা এদের মস্তিষ্কে আলোড়ন এনে দিল। এছাড়া রয়েছে মুহাম্মদের উপর রোষ, চরম রোষ। মুহাম্মদ এক রাষ্ট্র গড়ে তুলছেন, মদিনায় অধিপত্য বিস্তার করছেন, মদিনার বুক থেকে সেই বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মুহাম্মদকে মারতে গিয়ে পারল না, ধরতে গিয়ে অন্ধ হয়ে রইল, খুঁজতে গিয়ে পথ হারাল, অশ্ব সহ চোরাবালিতে নিমজ্জিত হল, নব মুসলিমদের আবিসিনিয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে পারল না, এদের বংশ নিপাত করে ইসলামের কবর দিতে পারল না বরং দিন দিন শত্রু তাদের বেড়েই চলল। পরাজয়, ব্যর্থতা ও গ্লানিতে হৃদয় যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল। মুহাম্মদের উপর অত্যাচার কম করে নি। উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রহার, পাথর মারা কাঁটা বিছিয়ে রাখা, সামাজিক বয়কট ক'রে খাদ্যাভাবে কষ্ট দেওয়া, করে নি কি? তবুও পারল না মুহাম্মদকে (দঃ) ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে, তাঁর আদর্শ থেকে সরিয়ে আনতে। সব

www.pathagar.com

চেষ্টা, সব কল্পনাই তাদের ব্যর্থ। মুহাম্মদ সব বাধা অতিক্রম করে বিজয়ীর বেশে মদিনায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মহান গৌরবের তাজ পরে সেখানে অধিষ্ঠিত। তাই আবু জেহেল আবু সুফিয়ান হিংসায় পুড়তে লাগল। মুহাম্মদকে অপমান করতে গিয়ে আজ নিজেরাই অপমানিত দেশের কাছে, সমাজের কাছে, আরবের যুবকদের কাছে উঠতে বসতে তারা উপহাসের পাত্র। নিজ পরিবার-পরিজন স্ত্রী-পুত্রের কাছেও তারা মুখ দেখাতে পারে না। কি জ্বালা, সম্মুখেও যেতে পারে না পিছনেও হঠতে পারে না। রসিক কই এর কাঁটা গলায় ফুট্‌লে বেরসিকের যে অবস্থা হয়, আবু সুফিয়ান ও আবু জেহেলেরও ঠিক তাই হয়েছে। কই এর কাঁটা গলায়। তাই হাসি নেই, শান্তি নেই, ইজ্জত নেই। শুধু ছট্‌ফটানীর জ্বালা দেহ ও মনে।

মক্কা হতে যে সব নব্য মুসলমান হযরতের সঙ্গে মদিনায় প্রস্থান করেছে, কোরেশ দলপতিদের দৃষ্টিতে তারাই চরম শত্রু। এরা যদি ইসলাম গ্রহণ না করত, হযরতকে সাহায্য না করত এং মদিনায় গমন না করত তা হলে তো মুহাম্মদের শক্তি বৃদ্ধি হতো না। এদের ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। ছলে-বলে কৌশলে এদের বিরুদ্ধে মদিনায় অপপ্রচার চালাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? মদিনার ইহুদী, পৌত্তলিক ও খ্রীষ্টানগণ মুহাম্মদের গুণে আকৃষ্ট, বাণীতে মুগ্ধ, ব্যবহারে সন্তুষ্ট। নব্য মুসলিমরাও কারো স্বার্থে আঘাত করে না। জুলুম অত্যাচার করেও কারো সম্পত্তি দখল করে না। পেটে খাবার না দিলেও হাসে, আশ্রয় না পেলেও খোলা আকাশের নিচে শান্তিতে ঘুমায়। হযরত তাদের সহায়, মদিনাবাসীরা আপন ভাই। তবুও এদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। এদের মক্কায় ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা সেখানেই নির্বংশ করতে হবে। মদিনায় গুপ্তচর পাঠালো। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রক্তে উত্তেজনার বীজ মিশিয়ে দিল। চিন্তাধারা এদের ব্যর্থ হলো না।

গুপ্তচরগণ জানতে পরল, মদিনার প্রতিপত্তিশালী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবদুল্লাহ-বিন-উবাই হযরত মুহাম্মদের উপর সন্তুষ্ট নয়। কেননা এই খাজরাজ বংশীয় যুবক হযরতের মদিনা আগমনের পূর্বে মদিনাবাসীদের উপর প্রভুত্ব করত। সবাই তাকে প্রচুর সম্মান দিত। মদিনাবাসীদের ইচ্ছে ছিল তাকেই নেতারূপে বরণ করবে এবং মদিনার শাসনভার তারই হাতে নস্ত করবে। কিন্তু মুহাম্মদের (দঃ) আগমনে তার প্রভাব অল্প দিনের মধ্যেই লোপ পেল। স্বাভাবতই তার মনে হিংসার আগুন জ্বল্‌তে লাগল আর মনের যত রোষ সব পড়ল নিরাপরাধ হযরতের ওপর। মুহাম্মদের আগমন না ঘটলে সে একদিন মদিনার রাজমুকুট পরিধান করত। দেশ বিদেশে তার প্রভাব বিস্তার করত। এসব চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল। তবুও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা করার সাহস পেল না। গুপ্তচরদের উসকানিমূলক কথা শুধু তার প্রাণকে বারবার নাড়া দিতে শুরু করল।

এদিকে ইহুদীরা যখন দেখল দলে দলে মদিনাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে–হযরতকে নিয়ে তারা যে আশা করেছিল তা পূর্ণ হলো না, তখন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করল। চির অভিশপ্ত এ মুনাফেক ইহুদী কোন নবী পয়গম্বরকেই রেহাই দেয় নি। নিজেদের নবী মুসাকে (আঃ) কম জ্বালাতন করে নি, হযরত ঈসাকে পদে পদে অপমান করেছে। তাই হযরত মুহাম্মদকেই (দঃ) বা ছাড়বে কেন। এ শয়তানের দল ভিতরে ভিতরে কোরেশদের সঙ্গে হাত মেলাল। গুপ্তচরদের নিকট মদিনার গোপনতত্ত্ব প্রকাশ করে দিল। সঙ্গে যোগ দিল মদিনার খ্রীষ্টান। তাই মদিনা শান্তিক্ষেত্রের পরিবর্তে অশান্তির লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। মুসলমানগণ পরিষ্কার বুঝতে পারল–ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি হয় না, পৌত্তলিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, মানব অধিকারের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও যে জাতি হিংসার মনোবৃত্তি পোষণ করতে পারে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে উঠে পড়ে লাগতে পারে তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করা সম্ভব নয়। কোথায় যাবে, কোথায় বা তারা আশ্রয় নেবে? নিজ

www.pathagar.com

মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগকরেছে তায়েফবাসীদের দ্বারা নির্মমভাবে আঘাত পেয়েছে এবার যদি মদিনা হতে বিতাড়িত হয় তবে কে তাদের আশ্রয় দেবে?

"এদিকে আবু জেহেলের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় মক্কার কোরেশগণ খেপে উঠল। মদিনা আক্রমণ করতে হবে, মুহাম্মদকে মারতে হবে। নব দীক্ষিত মুসলামানদের চরম শাস্তি দিতে হবে। মদিনার আনসারদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। বাপ-দাদার ধর্ম রক্ষা করতে হলে প্রতিটি কোরেশকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সবাই তার এ আহ্বানে সাড়া দিল। অজস্র ধন ও রসদপত্র সংগ্রহ হলো। আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একহাজার উট নিয়ে সিরিয়া গমন করলো। সেখান থেকে যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয় করে মদিনার পথ দিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। হযরত, আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের সব দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন। এদিকে গুপ্তচর সংবাদ দিল আবু জেহেল এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন উপায় কি? হযরত মহাচিন্তায় পড়লেন। বাড়ি-ঘর, ধন-মান, আত্মীয়-স্বজন, সুখ-শান্তি ত্যাগ করেছেন, তবুও অত্যাচারী কোরেশদের উপর কোন প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করেন নি। অনাহারে শেব পর্বতে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন–স্ত্রী-কন্যার প্রেম-প্রীতি ও মায়া ত্যাগ করেছেন–স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় এসেছেন তবু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। এখন কি তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন? যে মুমেন বান্দাদের দিয়ে ইসলাম জাগরুক তাদের কি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে না? সত্যের বাণী প্রচার করতে চির অসত্যের মাথায় কি কুঠারাঘাত করতে হবে না? শত্রু বেষ্টিত হয়ে কি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হতে হবেই? নির্ভীক বীর সেনানী, মানবকুল শিরোমণি, সত্যের সাধক, চিরসত্যের পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ (দঃ) কি আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের সমরাস্ত্রের ভয়ে মাথা নত করবেন? না, এর প্রতিকার ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে ইসলামকে টিকিয়ে রাখবেন–পাঠকবৃন্দ বিচার করুন। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, রাজা, মহারাজা, সমর কুশলী পণ্ডিতরা এবার চিন্তা করুন–নবী হয়েও, বিশ্বের সেরা সৃষ্টি হ'য়েও কেন ভয়াবহ যুদ্ধের কথা তাকে চিন্তা করতে হলো। প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্টিত হয়ে কেন যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হতে হলো। নবী জীবনের সামান্য ঘটনাটুকু যা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি তা পাঠ করে আজ খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক, ইহুদী ও অন্যান্য জাতির মনীষীরাই বলুন, রাজ্যের লোভে কি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নাম্‌তে হয়েছিল? না কুচক্রী কোরেশদের অত্যাচার তাঁকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল সংগ্রামের পথ বেছে নিতে।

(২) যুদ্ধ কি প্রয়োজন?

"যদি আল্লাহ এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রশমিত না করতেন তবে নিশ্চয় এ পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হতো কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহকারী"–(আল কুরআন–সূরা বাকারা, আঃ ২১৫)

মদিনা শহর শত্রু বেষ্টিত। মদিনার মুসলমানরা দিশেহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে। কি করে বাঁচবে, কি তাদের কর্তব্য কিছুই বুঝছে না। তাকিয়ে আছে মুহাম্মদের (দঃ) দিকে। মুহাম্মদ (দঃ) দেখলেন তাঁকে বাঁচতে হলে, মদিনার মুসলমানদের মান-ইজ্জত রক্ষা করতে হলে দুটি পথ তার রয়েছে। একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ যুদ্ধ। অপরটি আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ। কোনটি শ্রেয়?

আল্লাহর নবী, সমগ্র মানব জাতির নবী কি আত্মসমর্পণ করবেন? পৌত্তলিক ধর্মকে স্বীকার করে অশরীরী মূর্তিকে পূজা করবেন? এদের কাছেই কি জীবন মন সঁপে দিয়ে পরিত্রানের জন্য হাত জোড় করে মিনতি জানাবেন? সনাতন ধর্ম ইসলামকে জলাঞ্জলি দিয়ে

www.pathagar.com

বাপ-দাদার অসত্য ধর্মকেই খাঁটি বলে মেনে নেবেন? অত্যাচার, অবিচার, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণকে সমর্থন দেবেন? আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহর বাণীকে অশ্রদ্ধা করে আবু জেহেলের তর্জন-গর্জনকে ভয় করে নতি স্বীকার করবেন? মৃত্যুর ভয়ে মদিনা শহরে লুকিয়ে থাকবেন? এতকাল ইসলামের বাণী প্রচার করে যুদ্ধের ভয়ে নিজকে অপরাধী বলে আজ ধরা দেবেন? কোন্ নবী পূর্বে তাই করেছেন? হযরত ইব্রাহিম, হযরত লুত, হযরত ইউনুস, হযরত ইউসুফ—কেউ কি আগুনের ভয়ে, শত্রুর অত্যাচারে, সাগরের গভীর চাপে, কূপের অন্ধকারে থেকেও নিজদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন? যদি তাই না হয়ে থাকে তবে মুহাম্মদই (দঃ) বা কেন শত্রুর সাথে মিতালি করবেন? সত্যের সঙ্গে তো মিথ্যার আপোষ নেই।

হযরত তাঁর সহচর, ভক্ত, জ্ঞানী-গুণী মুসলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন বেইমান কোরেশদের প্রতিহত করতে হবে, মুসলমানদের টিকে থাকতে হবে, তাদের আবাসভূমির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজন। কোরেশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ একান্ত জরুরী।

কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি অর্জিত হয় সে শক্তিবলে নগর উদ্ভাসিত হয়, ইনজিন চলে, রেলগাড়ি, ট্রাক, বাস প্রভৃতি ঘণ্টায় দূর দূরান্ত পাড়ি দেয়। এই কয়লা থেকেই হীরকখণ্ডের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের হৃদয় বছরের পর বছর কয়লার মত পুড়ে হীরকখণ্ডের মতই জ্বলছে। এর আলো উদ্ভাসিত করবে সারা বিশ্ব। এর শক্তিতে কম্পিত হবে অবিশ্বাসীদের প্রাণ।

শক্তি গতিশীল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হয়। শান্ত জল মেঘের কোলে অশান্ত হ'য়ে কি ত্রাসের সৃষ্টি করে। অথচ বিদ্যুৎ চমকানির মত ভয়ঙ্কর ত্রাসেরও প্রয়োজন রয়েছে। ক্রোধ আছে বলেই ক্ষমা আছে। আর ক্ষমা আছে বলেই শান্তি আছে। ক্রোধের প্রয়োজন নেই একথা তো বলা চলে না। ক্রোধ কামকে জয় করে প্রেম শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এ প্রেমই আনে আকর্ষণ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রীতি। তাই একে অপরের টানে শান্তিতে বেঁচে থাকে।

যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পাখা চলে–ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত দেহ সুশীতল হয়, সেই বিদ্যুতের ক্রিয়ায় দেহ জ্বলে -পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মুসলিমদের প্রাণে আঘাতে আঘাতে যে বিদ্যুৎ শক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা হয়ত বজ্রের আকারে নিপতিত হবে কোরেশদের উপর। এর আলোকচ্ছটায় মূর্চ্ছা যাবে বেইমান কাফের ও শয়তান। মুসলমানেরা আজ সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর, ব্যাঘ্রের চেয়েও শক্তিশালী। কেউ আজ মানতে চায় না, বুঝতে চয় না কোরেশদের প্রতিপত্তি, ওদের আস্ফালন। প্রেম-শক্তিকে আজ তারা সমর শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চায়। কাফেরদের বাহুকে নিস্তেজ করতে চায়। ওদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে চায়। বাঁচতে হলে মানুষের মত, আর মরতে হলে বীরের মত–এটাই তাদের প্রতিজ্ঞা।

হযরত মদিনার আনসার ও মুজাহেরদের মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই স্থির করলেন, 'পর্বতের বাধা অতিক্রম করতে হবে। কাঁটা বিছানো পথকে পরিষ্কার করতে হবে। সংগ্রামকে ভয় কি? জীবনটাই তো সংগ্রামের। জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত চলে বিরামহীন সংগ্রাম। সংগ্রামকে ভয় করে কেউ কি ফুলশয্যা রচনা করতে পারে? যারা সংগ্রামকে আশীর্বাদ মনে করে পথ চলে তারাই তো ধন্য, খেতাবধারী, রাজসিংহাসন দখলকারী। উপার্জনের জন্য সংগ্রাম; জ্ঞানের সংগ্রাম, ধনের সংগ্রাম, মানের সংগ্রাম সবইত এ জীবনে করতে হয়। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের কঠোর সংগ্রামই তো আজ আমার হৃদয় এত আলোকিত। তাই এত শক্তি, এত বল, এত জ্ঞান, এত সাহস। পাহাড়ের গায়ে বসে বসে শুধু ছাগল চরালে আর সারারাত নিদ্রায় কাটালে তো আজ বিশ্বের নবী হতে পারতাম না।

www.pathagar.com

মান-অভিমান তুচ্ছ মনে করতে পারি, নীরবে অত্যাচার সহ্য করতে পারি কিন্তু শত্রু বেষ্টিত হয়ে কাফেরদের কাছে নিজ স্বত্বাকে বিকিয়ে দিতে পারি না। সংগ্রাম আরও করতে হবে। বেইমানদের এ ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তাই যুদ্ধ প্রয়োজন, যুদ্ধ অপরিহার্য।'

(৩) যুদ্ধ কি শান্তি আনে?

হযরতের (দঃ) মনের কোণে তবু আবার ভেসে উঠল যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা। যুদ্ধ অর্থ প্রতারণা! যুদ্ধ অর্থ নৃসংশতা। যুদ্ধ বর্বরতা। কে কাকে মারে, কে কার প্রাণনাশ করবে, চল্‌বে তার প্রতিযোগিতা। কত ঘর-বাড়ি জ্বলবে, কত বংশ নির্বংশ হবে। আকাশে বাতাসে উঠ্‌বে কান্নার রোল। স্ত্রী-স্বামী হারাবে–স্বামী স্ত্রী হারাবে। মা হারাবে আদরের ছেলে। আর ছেলে হারাবে তার স্নেহদায়িনী মাকে। মায়া, মমতা, সহানুভূতি, আদর, স্নেহ সব নিমিষে ধূলিসাৎ হবে। আশ্রয়ের অভাবে, ক্ষুধার জঠর জ্বালায়,–কামান, বন্দুক ও বুলেটের নির্মম আঘাতে জীব-জন্তু ও নর-নারী যখন ছটফট্ করতে থাকেব তখন সে দৃশ্যই বা তিনি দেখবেন কেমন করে। মন তাঁর তোলপাড় করতে লাগল।

কোন্ অলক্ষ্যে থেকে কে যেন তাঁকে বলে দিল–'যুদ্ধ শান্তি আনে। যুদ্ধই অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বর্বরতাকে ধ্বংস করে। অহংকারী, ব্যভিচারী, দুষ্কৃতিকারী, অবিশ্বাসকারীদের শায়েস্তা করার এটাই একমাত্র পন্থা। বেহেশত তরবারীর ছায়ার নিচে।'

হযরতের (দঃ) আর দ্বিধা রইল না। তিনি স্থির করলেন, কোটি কোটি মানব সন্তানকে শান্তির নীড়ে আনতে হলে তলোয়ার ধরতে হবে। জালিম ও মুনাফেককে খতম করতে হবে। বিষধর সর্প ঘরে রেখে শান্তিতে ঘুমান যায় না। বাঘের সঙ্গে মিতালী চলে না। কুমীরের সঙ্গে আপোষ হয় না। বিছার কামড় খেয়ে ছেড়ে দেব, বোলতা ভীমরুলকে নিয়ে প্রেমের লীলা করব, সিংহের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে পূজা করব, এ তো আমার নীতি নয়। আমি শান্তির প্রতিষ্ঠাতা, আমি জালিমের জুলুমকারী, আমি নকল পূজারীর বিলীনকারী। আমি শান্তির ধারক। আমি শান্তির বাহক। ধরণীর নির্যাতিত নিপীড়িত নর-নারী আমার আশাতেই দিন গুণছে। যুদ্ধের মাধ্যমেই ত্রাণ-যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদের শান্তি।

(৪) যুদ্ধ কি আল্লাহর নির্দেশ?

বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী সবজান্তা। তিনি মানুষের মনের মাঝেই বিরাজ করেন। আকাশে-বাতাসে, সাগর-সলিলে যা কিছু ঘটছে সবই তো তিনি জানেন। হযরতের (দঃ) মনের কথা, যা কিছু তিনি এতদিন ভাবছিলেন–আল্লাহ্ বুঝলেন। নব্য-মুসলমানদের করুণ অবস্থা, আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের সশস্ত্র আক্রমণ তিনি অলক্ষ্যে থেকে দেখলেন। কোন্ পরিবেশে হযরত (দঃ) আজ বিব্রত, দিশেহারা এ কথা জানবার তাঁর বাকি রইল না। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন। জিব্রাইল এ নির্দেশ একের পর এক বয়ে নিয়ে এলেন–মুক্তির দিশারী মুহাম্মদের (দঃ) কাছে।

"ওয়া কাতেলু ফি ছাবিলিল্লাহে-ল্লাজিনা ইউকাতেলু নাকুম ওলা তা'-তাদু। ইন্নাল্লাহা লা ইউহেব্বুল মুত্তাদিন। ওয়াকতুলুহুম হায়ছো ছাকিফতুমুহুম ওয়াখরিজুহুম মিন হায়ছো আখ্‌রাজুকুম; **ওয়াল ফিৎনাতো আশাদ্দু মিনাল কাতলে।**

(সূরা বাকারা। আয়াত ১৯০-১৯১)

অর্থাৎ 'এবং যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও তাহাদের সহিত আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না। যেখানেই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হও—সংহার কর এবং তাহারা তোমাদিগকে যেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরাও তাহাদিগকে সেখান হইতে বহির্গত কর; এবং **হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর।**' (২ : ১৯০-১৯১)

www.pathagar.com

(২) কুতেবা আলায়কুমুল কেতালো ওয়া হুয়া কাবতুল্লাকুম ওয়া আ-সা আন তাকবাহু শাইয়াঁও ওয়া হুয়া খায়রুল্লাকুম। ওয়া আ-সা আন্-তুহেব্বু শাইয়াঁও ওয়া হুয়া শারুল্লাকুম। ওয়াল্লাহা ইয়ালামু ওয়া আনতুম লা তায়ালা-মুন। (কুরআন–সূরা বাকারা–২১৬ আয়াত)

অর্থাৎ "তোমাদের উপর সংগ্রাম বিধিবদ্ধ হইল এবং ইহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; এবং সম্ভবতঃ তোমরা যে বিষয়ে অপ্রীতিকর মনে কর বস্তুতঃ তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং তোমরা যে বিষয়ে প্রীতিকর মনে কর সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নহ।"

(২ ঃ ২১৬)

(৩) "ওয়ামা লাকুম লা তুকাতেলুনা ফি ছাবিলিল্লাহে।"

অর্থাৎ "তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতেছ না?—(কুরআন)

(৪) "তোমরা কেন ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে না–যাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং তাহারাই প্রথমবারে তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল? তোমরা কি তাহাদের ভয় কর? বস্তুতঃ আল্লাহকেই ভয় করা উচিত যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর। আল্লাহ তোমাদের হস্তসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাদের উপর তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অন্তর আশ্বস্ত করিবেন। এবং তিনি তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ নিবারণ করিবেন। এবং আল্লাহ্ যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। এবং আল্লাহই মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।"(কোরআন সূরা তওবা। আয়াত ২-১৫)

(৫) "এবং আমি তাহাদের নিমিত্ত উহার মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়া দিলাম যে জীবনের জন্য জীবন ও চক্ষুর জন্য চক্ষু ও নাসিকার জন্য নাসিকা ও কর্ণের জন্য কর্ণ ও দন্তের জন্য দন্ত এবং সকল আঘাতের বিনিময় আছে।" (কোরআন –সূরা মায়েদা। আয়াত ৪৫)

(৬) "যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের সহিত সংগ্রাম করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করিয়া বেড়ায়, নিশ্চয়ই তাহাদের শাস্তি এই যে তাহাদিগকে হত্যা কর কিংবা তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ কর অথবা তাহাদের হস্তসমূহ ও তাহাদের পদসমূহ বিপরীত দিক হইতে কর্তন কর। কিংবা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত কর।" শান্তির জন্য,–অত্যাচারী, অবিশ্বাসী, হিংসা-পরায়ণ, দেশদ্রোহী ও স্বার্থবাদী দুষ্কৃতিকারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যুদ্ধ যে একান্তই প্রয়োজন এ কথা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে। অথচ একথা জেনেও এবং ধর্মগ্রন্থ সমূহ থাকা স্বত্ত্বেও তাঁরা হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) দোষারোপ করেন। তাঁর মহান চরিত্রে কোন ত্রুটি না পেয়ে বহু বিবাহ ও যুদ্ধ প্রথাকে সম্বল করেন। দেখুন তাঁদের ধর্মগ্রন্থ সমূহে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যুদ্ধের নির্দেশ কি ভাবে দিয়েছেন।

(কুরআন—সূরা মায়েদা। আঃ –৩৩)

বাইবেল

(৭) "তুমি তোমার শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি আপনার অপেক্ষা অধিক অশ্ব রথ ও লোক দেখ, তবে সেই সকল হইতে ভীত হইও না, কেননা তোমার ঈশ্বর

www.pathagar.com

সদাপ্রভু যিনি মিশর হইতে তোমাকে উঠাইয়া আনিয়াছেন তিনিই তোমার সহবর্তী। আর তোমরা যুদ্ধার্থে নিকটবর্তী হইলে যাজক আসিয়া লোকদের কাছে কথা কহিবে, তাহাদিগকে বলিবে–হে ইস্রাইল শুন–তোমরা সদ্য তোমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটে যাইতেছে তোমাদের হৃদয় দুর্বল না হউক; ভয় করিও না কম্পমানও হইও না, বা উহাদের হইতে মহাভয়ে ভীতও হইও না। কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই তোমাদের নিস্তারার্থে তোমাদের সঙ্গে যাইতেছেন।" [তৌরাত। ২০/১-৪]

(৮) সদাপ্রভু যিহোশূয়াকে কহিলেন, তুমি ভীত কি নিরাশ হইও না; সমস্ত সৈন্যকে সঙ্গে করিয়া লও, উঠ, অয়ে যাত্রা কর; দেখ আমি অয়ের রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে এবং তাহার নগর ও তাহার দেশ তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। তুমি যিরীহোর ও তথাকার রাজার প্রতি যেরূপ করিলে, অয়ের ও তথাকার রাজার প্রতিও তদ্রুপ করিবে, **কিন্তু তাহার লুট দ্রব্য ও পশু তোমরা আপনাদের জন্য লইবে।**[১] তুমি নগরের বিরুদ্ধে পশ্চাৎদিক আপনার একদল সৈন্য গোপন রাখ।" (বাইবেল-যিয়োশূয়ের পুস্তক পরিচ্ছেদ ৮/১-২)

(৯) "তিনি আমার হস্তসমূহকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন। তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দেয়। (বাইবেল–জবুর –শমূয়েল–৩৫)

(১০) "আর তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে স্বর্গ হইতে তাহাদিগকে ভক্ষ (আহার) দিলে ও তাহাদের পিপাসা নিবারণার্থে শৈল হইতে জল বাহির করিলে; আর তুমি তাহাদিগকে যে দেশ দিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলে তাহা অধিকার করণার্থে তথায় প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলে।" (বাইলেব–জবুর–নহিমিয়–১৬)

(৫) পূর্বের নবীরা কি যুদ্ধ করেছেন?

একটির পর একটি চিন্তা হযরতের মস্তিষ্কে দোল দিতে লাগল। যুদ্ধ প্রয়োজন, তলোয়ার শান্তি আনে একথা সত্য। কিন্তু এটা কি নবীদের জন্য প্রযোজ্য? পূর্বের নবী হযরত ঈসা (আঃ) তো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েও নীরবে সহ্য করেছেন। 'এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দাও'–নীতিতেই সারাজীবন কাটিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে নামেন নি। হযরত ইব্রাহিমকে (আঃ) নমরুদ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। তিনি কি নমরুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছেন? হযরত ইউনুসকে (আঃ) সাগর সলিলে নিক্ষেপ করা হলো। হযরত মুসাকে (আঃ) দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলো। হযরত লুতের (আঃ) পরিবারকে অপমান করা হলো–তারা কি শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরেছেন–এসব চিন্তা হযরতের মাথায় জটলা পাকাতে থাকে। ইতিহাসের পাতা একটির পর একটিকে যেন তাঁর চোখের সম্মুখে খুলে দিল। তিনি দেখলেন যুদ্ধ ছাড়া কোন পথ তাঁদের ছিল না। যুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং অলক্ষ্যে থেকে পরিচালনা করেছেন। ফেরেস্তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পরাক্রমশালী নৃপতিদের সংহার করেছেন। নমরুদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহিমের যুদ্ধের কথা মনে পড়ল। বিষাক্ত কীটের দংশনে নমরুদের সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব-হস্তী ধূলিস্যাৎ হলো। মুসার (আঃ) আসা বাড়ির শক্তিতে ফেরাউন দলবলসহ নীল নদে শয্যা রচনা করল। হযরত ইউশা, হযরত সোলায়মান, হযরত জুলকারনাইন পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত দাউদকে (আঃ) বহুবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

টীকা ঃ ১ –যুদ্ধে প্রাপ্ত মাল হালাল। জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকে উল্লেখ আছে। এখানে অনেকের মনে দ্বন্দ্ব আসতে পারে এজন্য এ কথাটির ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এর সাক্ষ্য দান করে।

(১) পলিষ্টীয়দের সহিত ইস্রাইলের আবার যুদ্ধ বাধিল। তাহাতে দাউদ আপন দাসগণদের নিয়া পলিষ্টিয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন। আর দাউদ ক্লান্ত হইলেন। (বাইবেল, জবুর, ২য় শমূয়েল)

(২) "ঐ সময়ে অমালেক আসিয়া রফীদীমে ইস্রাইলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে মোশী (মুসা আঃ)– যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আমাদের জন্য লোক মনোনীত করিয়া লও, যাও, অমালোকের সহিত যুদ্ধকর, কল্য আমি ইশ্বরের যষ্টি হস্ত লইয়া পর্বতের শিখরে গিয়া দাঁড়াইব। পরে যিহোশূয় মোশির আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন, আমালোকের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং মোশি, হারোন ও হূর পর্বতের শৃঙ্গে উঠিলেন। আর এইরূপ হইল; মোশি যখন আপন হস্ত তুলিয়া ধরেন তখন ইস্রাইল জয়ী হয়, কিন্তু আপন হস্ত নামাইলে অমালেক জয়ী হয়। আর মোশির হস্ত ভারি হইতে লাগিল, তখন উহারা একখানি প্রস্তর আনিয়া তাঁহার নিচে রাখিলেন আর তিনি তাহার উপরে বসিলেন; এবং হারোন ও হূর এক এক জন অন্যদিকে তাহার হস্ত ধরিয়া রাখিলেন তাহাতে সূর্য অস্তমিত না হওয়াতে তাহার হস্ত স্থির থাকিল। আর যিহোশূয় অমালেকা ও তাহার লোকদিগকে খড়গাধারে পরাজিত করিলেন।"

[বাইবেল -তৌরাত যাত্রাপুস্তক পরিচ্ছেদ ১৭-৯-১৩]

(৩) সদাপ্রভু কহেন...."তুমি গিয়া অমালোককে আঘাত কর ও তাহার যাহা কিছু আছে নিঃশেষে বিনিষ্ট কর; তাহার প্রতি দয়া করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ বালক-বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু গরু ও মেষ উষ্ট্র ও গর্দভ সকলকেই বধ কর। (বাইবেল–১ শমুয়েল। ১৫/৩]

এবারে দেখি শান্তির জন্য ও শত্রু নিপাতের জন্য প্রচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে এরূপ বাণী মেলে কিনা।

ঋগ্বেদ–সংহিতা

(৪) "হে ইন্দ্র! আমাকে এরূপ কর যাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদের পরাভব করি, বিপক্ষদের নিধন করি এবং সর্বোপরবর্তী হয়ে অশেষ গোধনের অধিকারী হই। আমি শত্রু নিধনকারী হলাম, আমাকে কেউ হিংসা বা আঘাত করতে পারে না। এ সকল শত্রু আমার দু চরণের নিচে অবস্থিতি করছে। হে শত্রুগন যেমন ধনুকের দু-প্রান্তভাগ ধনুর্গুনের দ্বারা বন্ধন করে সেরূপ তোমাদের এ স্থানেই বন্ধন করছি।

[দশম-মণ্ডল। ১৬৬/১-৩]

(৫) "যারা বিপক্ষ যারা আমাদের হিংসাকারী শত্রু যে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে যে আমাদের দ্বেষ করে-হে রাজন! এরূপ সকল ব্যক্তির সম্মুখীন হও।"

উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতি হতে দেখা যায় যে শান্তির জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন। যুদ্ধ অপরিহার্য।

হযরতকে দৃঢ়ভাবে একথা বুঝাতেই আল্লাহ বলেন, "এবং এমন নবীগণ ছিল যাহাদের সহযোগে প্রভু ভক্ত লোকরা যুদ্ধ করিয়াছিল"। (সূরা আল এমরান। আয়াত ১৪৬ এর অংশ)

হযরতের জীবনে প্রধান যুদ্ধের ফলাফল কি?

www.pathagar.com

পূর্বেই লিখেছি হযরত জীবনে ছোট বড় তেরাশিটি যুদ্ধে যোগদান করেছেন। এর মধ্যে ২৭টি যুদ্ধে কারো মতে ৯টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সবগুলো যুদ্ধের বর্ণনা ও ফলাফল উল্লেখ করা সম্ভব নয়। প্রধান প্রধান যুদ্ধের মধ্যে (১) বদর যুদ্ধ, (২) ওহদের যুদ্ধ, (৩) খন্দকের যুদ্ধ (৪) খয়বরের যুদ্ধ, (৫) মুতার যুদ্ধ (৬) আন্তাকিয়ার যুদ্ধ, (৭) হোনায়েনের যুদ্ধ, (৮) তায়েফের যুদ্ধ (৯) উসাইয়ার যুদ্ধ (১০) বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, (১১) যাতুর বিকার যুদ্ধ, (১২) আনমারের যুদ্ধ, (১৩) যুকরাদের যুদ্ধ, (১৪) মক্কা বিজয়, (১৫) আউতাসের যুদ্ধ, (১৬) তাইফের যুদ্ধ, (১৭) যুলখালাসার যুদ্ধ, (১৮) সিফুল বহরের যুদ্ধ, (১৯) তাবুকের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে শুধু দুটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং এর ফলাফল দেখব।

বদর যুদ্ধ

(১) বদর যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করেছি। সবারই মনে আছে যে হযরত মদিনায় প্রস্থান ক'রেও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। আবু সুফিয়ান সিরিয়া হ'তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। বদর মক্কা, মদিনা ও সিরিয়ার সন্ধিস্থল হলেও মদিনারই অন্তর্ভুক্ত। যে মদিনায় হযরত আশ্রয় নিয়েছেন সেই মদিনার বুকের উপর দিয়ে আবু সুফিয়ান হযরতকে নিধন করতে যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে চলছে। উদ্দেশ্য বুঝতে কারোরই বাকি রইল না। সভাসদ্‌বর্গের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হযরত স্থির করলেন–আবু সুফিয়ানকে এ পথে অগ্রসর হতেই বাধা দেবেন। মুসলিম নওজোয়ানগণ হযরতের প্রস্তাব শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তাঁদের সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়ে দিলেন। কেউ ঘরে বসে থাকতে চায় না। স্বৈরাচারী, নিষ্ঠুর ও পাষাণ আবু সুফিয়ানকে এবার শিক্ষা দিতে হবে। তার সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হলো–সংখ্যা মাত্র ৩১৩। বন্দুক নেই, কামান নেই, জেট বিমান নেই, অশ্ব নেই, হস্তি নেই, রণসম্ভার নেই। আছে মনোবল, আছে দুর্জয় সাহস, আর বাধা দেবার নিমিত্ত যুদ্ধযান দুইটি অশ্ব ৭০টি উষ্ট্র।

কে এই স্বেচ্ছাবাহিনীর নেতা? কে এই দুঃসাহসিক যুদ্ধ যাত্রীর দলপতি? কার হাতে আজ নাঙ্গা তলোয়ার? কে চলেছে সি এন্ড সি হয়ে বদর প্রান্তরে অভিযান করতে? কার বজ্রকণ্ঠের আহ্বান শিরায় উপশিরায় এ মুসলিম সেনাদের রক্ত টগ্ বগ্ ক'রে ফুট্‌ছে? এ বীর সেনানী, সত্যের বাহক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। চোখে তাঁর আলোর দীপ্তি, দেহে বীর মূর্তি, সাহসে নির্বিকার, গতিতে দুর্বার। বিশ্ব আজ টল্‌টলায়মান, এ ধরা আজ কম্পমান।

ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে হযরতের যে চুক্তি হয়েছিল–সে চুক্তি গোপনে তারা ভঙ্গ করেছে জেনেও মুহাম্মদ (দঃ) বিব্রত হলেন না। প্রকাশ্যে তাদের কিছু না বলে এদের গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হযরত কিছুসংখ্যক মুসলিমকে মদিনায় রেখে গেলেন। তাঁর এ দূরদৃষ্টি যে কত বাস্তব ও নিখুঁত ছিল ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ পণ্ডিতরা আজ তা বুঝতে পারছেন। হযরত চলেছেন বদর প্রান্তরে ইসলামের চিরশত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। কোন শঙ্কা নেই, উদ্বিগ্নতা নেই। মিলিটারী বেশে চলছেন সম্মুখের পানে। দুদিন দু-রাত্রি পথ অতিক্রম করে তিনি পৌঁছিলেন বদরের গিরি উপত্যকায়। এ প্রান্তরটি ছিল সুরক্ষিত, তিনদিকে পাহাড়ে ঘেরা। একদিকে ঢালু প্রান্তর যেখান দিয়ে প্রবাহিত হতো ঝরনার জলধারা। ঠিক এখানেই করলেন শিবির স্থাপন। পাশে একটি উঁচু টিলার উপর খর্জুর পত্রে তৈরি হলো হযরতের আশ্রয়স্থল। সজাগ দৃষ্টিতে সবাই তৈরি থাকল। ছদ্মবেশী সৈনিকরা আবু সুফিয়ানের গতিবিধি লক্ষ্য করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হযরতকে জানালেন। এদিকে

www.pathagar.com

ধুরন্ধর আবু সুফিয়ান মনে করল, মদিনার নবদীক্ষিত মুসলিমরা তার গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে তাকে খতম করতে পারে এবং তার সব যুদ্ধসামগ্রী কেড়ে নিতে পারে। এই ভয়ে সে নিজেই গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করল। উটের মল থেকে একটি খেজুরের আঁটি কুড়িয়ে বুঝতে পারল যে সে খেজুর মক্কায় জন্মে না, মদিনায় জন্মে।

মদিনার খেজুর মক্কার খেজুরের চেয়ে ছোট। তাই এর আঁটিও ছোট। তখন তার বুঝতে বাকি রইল না যে মদিনাবাসীরা তার পথ রুদ্ধ করতে বদরে উপস্থিত। যে কোন মুহূর্তেই আক্রমণ করবে। একথা চিন্তা করে অনতিবিলম্বে একজন দূতকে উট সহ মক্কায় পাঠিয়ে দিল এবং আবু জেহেলের সাহায্য প্রত্যাশা করল। দূত আবু জেহেলকে এ সংবাদ দেবা মাত্র কোরেশগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তারা ভাবল আবু সুফিয়ান আর ফিরতে পারবে না। আবু জেহেলের আহ্বানে ওৎবা, শায়বা, অলিদ প্রভৃতি বীর পুরুষরা এগিয়ে এলো। যুদ্ধের জন্য সবাই তৈরি। এক হাজার সৈন্যর এক বিরাট বাহিনী আবু সুফিয়ানকে রক্ষা করতে বদরের দিকে ছুটল। মুসলমানদের ধ্বংস করতে হবে, মুহাম্মদকে হত্যা করতে হবে এ নেশায় সবাই উন্মাদ। মদিনায় পৌছার পূর্বেই দূত আবু জেহেলকে সংবাদ দিল যে আবু সুফিয়ান জীবিত, অন্য পথে মক্কায় চলে গেছে। আবু জেহেল প্রথমতঃ কিছুটা বিব্রত হলো। কেননা সে ভেবেছিল আবু সুফিয়ানের সঙ্গে ভারি যুদ্ধাস্ত্র সমূহ রয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করে বীর বিক্রমে মুসলমানদের আক্রমণ করে শায়েস্তা করবে। কিন্তু তা হলো না। তবুও মক্কার দিকে ফিরে যেতে পারছে না। সদর্পে যেখান থেকে মদিনার পথে ১ হাজার যোদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে সেখানে একটা কিছু না করে মক্কায় কি করে ফিরে যাবে? মক্কাবাসীরা এবার তাকে আর ক্ষমা করবে না। লজ্জা অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ সব একসঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ল। কোরেশ বীরদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'মুহাম্মদের কি বা শক্তি আছে? না আছে সৈন্য সামন্ত, না আছে ভারি অস্ত্র। কি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধের কৌশলই বা কয়জন জানে? আমাদের তো সবাই আছে। চল বদর প্রান্তরে আমরা ওদের শিখিয়ে দেই যুদ্ধ কাকে বলে?'

একে তো প্রখর সূর্যের কিরণে তপ্ত মরুভূমি পার হয়ে চলছে, তদুপরি রমজান মাস। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। বদরে এসে সবাই অস্থির হয়ে পড়ল পানির জন্য। পানির খোঁজে অনেকেই ছুট্‌ল পাহাড়ের পদপ্রান্তে ঝরনার আশায়। ঝরনাধারা বইছে দেখে আনন্দে যেই অগ্রসর হচ্ছে অমনি আঘাত, চরম আঘাত। মুসলিম সৈন্যরা ওদের ঘিরে ধরল। বীর হামজা এক আঘাতেই কোরেশ দলপতিকে হত্যা করল। যে কয়জন কোরেশ সৈন্য পানির আশায় এসেছিল চিরজীবনের জন্য তারা পানি পান না করেই বিদায় নিল। হায়রে কপাল। কে কাকে মারে, কার হাতে কে নিহত হয়। মুসলিমদের যারা উৎখাত করবে তারা নিজেরাই আজ উৎখাত হলো। আবু জেহেলের নিকট এ সংবাদ পৌছিলে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন্ নেশায় তাকে পাগল করেছে তা বুঝতে পারল না। তবু উপায় কি? মার খেতে হবে, মারতে হবে তবু পালাতে পারবে না। সৈন্যদের নির্দেশ দিল। সৈন্যরা রণভেরী বাজিয়ে সুসজ্জিত বেশে এক কাতারে দাঁড়াল। নর্তকী গান গাইল অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক সৈন্য সব তৈরি হলো।

এদিকে মুসলমানরাও ক্ষিপ্র ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠল। 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলল আকাশ বাতাস। হযরত (দঃ) এতটুকু চিন্তা করেন নি যে আবু জেহেল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে বদর প্রান্তরে উপনীত হবে। ভেবেছিলেন আবু সুফিয়ানের গতিপথ রোধ করবেন— অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেবেন, তাকে বন্দী করবেন, কোরেশদের আস্ফালনের অবসান করবেন। কিন্তু হয়ে গেল বিপরীত। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তবু দমে গেলেন না। প্রভাত

www.pathagar.com

হলো–বেলালের সুমধুর আজান ধ্বনি মুসলিমদের তন্দ্রা ভাঙ্গাল আর কোরেশদের অন্তরে শেল বর্ষণ করল। এক কাতারে সবাই নামাজ পড়লেন। আল্লাহর কাছে তাঁরা নিজ নিজ আত্মা সমর্পণ করলেন। হযরত (দঃ) তাদের পরামর্শ দিলেন পানির ঝর্ণাটি অধিকারে রাখতে। যাকে যে নির্দেশ দিলেন সৈন্যরা সেই নির্দেশই পালন করল। হযরত (দঃ) নিবিষ্ট মনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

যুদ্ধ শুরু হলো। বদর প্রান্তর কেঁপে উঠল। একদিকে মুসলমান–অন্যদিকে বেইমান। একদিকে সত্যের সাধক–অন্যদিকে মূর্তির উপাসক, অসত্যের নায়ক। একদিকে ওৎবা, অলিদ, শায়েবা–অন্যদিকে হামজা, আলী, ওবায়দা। শেরে খুদা আলীর এক আঘাতেই অলিদ হলো ধরাশায়ী। বীরকেশরী হামজার তরবারী ওৎবাকে করল নিহত। শায়বা কি বাকি রইল? না, এক সাথেই ওবায়দা তাকে জাহান্নামে পাঠালো। দশ মিনিট আগে যারা আস্ফালন করে বলেছিল–

"ওরে মুর্দা মুসলমান!
আয় দেখি তোদের কত বল
কত জোরের ঈমান!"

ঠিক দশ মিনিট পর তারা আর নেই। কি খেলা? কি যুদ্ধ! এক সঙ্গে কোরেশ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমানদের উপর। যুদ্ধ চলছে–প্রচণ্ড যুদ্ধ। রণভেরীর নিনাদ ও সেনাদের রণ-হুঙ্কার বদর প্রান্তর মুখরিত।

শিকার হাতে পেলে শিকারী যেমন দিক -বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তেমনি আজ মুসলিম সেনারাই সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে–একটি নেশায় কোরেশদের আজ জাহান্নামে পাঠাবে। হলোও ঠিক তাই। এক একজন বীর পুরুষ চার পাঁচজন কোরেশকে হত্যা করে ছাড়ছে। হযরত (দঃ) দূর থেকে এ দৃশ্য দেখলেন, স্থির থাকতে পারলেন না। বিজয়ের আনন্দে নয়। ইসলাম টিকে আছে–এই আনন্দেই হৃদয় তাঁর ভরপুর হলো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শিবিরে ঢুকলেন। আল্লাহর কাছে হাত তুলে মুনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ্। তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজ পূর্ণ কর।"

ক্ষণিকের জন্য হযরতও নেই যুদ্ধের ময়দানে –আবু জেহেলও নেই সৈন্য পরিচালনে। হযরতেও শিবির অভ্যন্তরে–আবু জেহেলও পূজার মন্দিরে। একজন নিয়োজিত আল্লাহর মুনাজাতে–অন্যজন আতঙ্কিত যমদূতের তীব্র করাঘাতে। একজনের মুখে, 'হে প্রভু! হে আমার খোদা!'[১] অন্য জনের মুখে, 'হে প্রভু–হে লাত দেবতা।"

কার প্রভু সত্য, বিশ্বমানব আজ দেখে নাও। কাফেরগণ মুসলমানদের বিনাশ করবে। মুসলমানরা কাফেরদের ধ্বংস করবে। কে সত্যবাদী, কে অসত্যবাদী, কে সত্যের উপাসক–কে মিথ্যার উপাসক, আজ পরীক্ষার দিন। সত্য–আগুনেও সত্য, পানিতেও সত্য। সত্য লয় হয় না–ক্ষয় হয় না। অসত্য গ্যাসের মত বিরাজ করে, গ্যাসের মতই শূন্যমার্গে বিলীন হয়ে যায়। দেখি কোন্‌টি সত্য, কার প্রভু সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যকে রক্ষা করতে নিজে উপস্থিত থাকেন আর সত্যাশ্রয়ীদের সাহায্যার্থে অলক্ষ্যে থেকে সাহায্য পাঠান।

দুই তরুণ বীরকেশরী মু-আজ ও আবদুল্লাহ উন্মাদের মত ছুটছে আবু জেহেলের শিবিরের দিকে। কাউকে তারা ভয় করে না। কারো বাধাই মানে না। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চল্‌ল ব্যূহ ভেদ করতে। কি সাহস! কোরেশ নেতা আবু জেহেল–লাৎ দেবতার ভক্ত, তাঁকে

টীকা ঃ ১ –হযরতের (দঃ) প্রার্থনা–

"হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করেই আমি এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। কিন্তু যদি তোমার ইচ্ছা অন্যরূপ হয় তবে অদ্যকার পর হয়ত আর কেহই তোমার উপাসনা করবে না।" (হাদিস)

www.pathagar.com

আক্রমণ করছে দু'টি তরুণ বীর। মু-আজ শিকারী ব্যঘ্রের মত লাফিয়ে পড়ল আবু জেহেলের দিকে। তরবারীর এক আঘাতেই তার ভবলীলা শেষ করলো। পিতার এই হেন অবস্থা দেখে আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা মু-আজকে তরবারী দ্বারা আঘাত করলো। সে আঘাতে মু-আজের একটি বাহু প্রায় ছিন্ন হলো। মু-আজ দেখল ছিন্ন প্রায় বাহুটি তার বিপদ হয়ে দাড়িয়েছে তাই নিজ বাহু নিজেই পদতলে রেখে এমন জোরে এক টান দিল যে তা শরীর হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এমন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ সময় তার ভ্রাতা আবদুল্লাও যে বীরত্ব দেখিয়ে শত্রু সেনা ধ্বংস করেছে এবং তাদের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তারও তুলনা মেলে না।

শৌর্যে বীর্যে মুসলমান—বুক ভরা এদের ঈমান। মানুষকে এরা ভালবাসতে জানে, মানুষের সেবা করতে জানে। মানুষকে বুকে নিয়ে আপন করতেও জানে। শত্রুকে ক্ষমা করে আবার পাষাণ, নির্মম, অত্যাচারী শত্রুদের মুণ্ডু নিয়ে প্রতিশোধ নিতেও জানে। জালিমকে হত্যা না করে জুলুমের হাত থেকে নিপীড়িত মজলুম জনতাকে রক্ষা করা যায় না, এ শিক্ষা মুসলমানদের আজ হয়েছে।

কোরেশ সর্দার আবু জেহেলের মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের শক্তি শতগুণ বেড়ে গেল আর বিধর্মীদের শক্তি হাজার গুণ কমে গেল। আজ আর আস্ফালন নেই, যুদ্ধের সাধ নেই, মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার ইচ্ছাও নেই। যে ইচ্ছা এদের প্রাণে প্রবল হয়ে জাগল–তা হলো প্রাণ নিয়ে নিজ গৃহেফিরে যাওয়া। কিন্তু সে বাসনাও অনেকের পূরণ হলো না! ধরা পড়ল বীর মুজাহিদদের হাতে। যারা পালিয়ে গেল তারা অনেকেই কোরেশদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কেননা বদর যুদ্ধের অলৌকিক ঘটনা মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছিলে দূর থেকে অনেকেই মুহাম্মদকে (দঃ) আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করল। মুহাম্মদের পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব যেমন খুশি হলেন, আবু জেহেলের বন্ধু ও পরিবার পরিজন তেমনি রোষ, অভিমান ও দুঃখে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল, কিন্তু সাহস হলো না ছুটে চল্‌তে বদর প্রান্তরে। মনের যাতনায় শুধু অস্থির হয়ে নিজের দেহ নিজেই দংশন করতে শুর করল। আবু সুফিয়ানের উপর এবার সব ক্রোধ এদের জমাট হলো।

মুসলমানদের কি অবস্থা? আনন্দের আতিশয্যে এরাও কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? না, তা হয়নি। আনন্দে মুখরিত হয়েছে বদর প্রান্তর। আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে জয় জয় রব পড়েছে আকাশে বাতাসে। সত্যের ঝাণ্ডা পত্ পত্ করে উড়ছে ঐ বদরে। অসংখ্য কোরেশ নিহত হলো, বন্দী হলো মুসলিমদের হাতে।

হযরত শিবির থেকে বের হলেন। দেখলেন এ দৃশ্য। হৃদয় তাঁর কেঁপে উঠেলো। মায়ায় তাঁর ভরে উঠলো মন। বন্দীদের তিনি হত্যা করতে দিলেন না। বললেন, এরা ইচ্ছে করে যুদ্ধে আসে নি। এদের বাধ্য করা হয়েছে। তাই সসম্মানে বন্দীদের মদিনায় নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন।

যে অলৌকিক ঘটনা বদরে ঘটল, যে আশাতীত ফল বদরে লাভ হলো এর পিছনে কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল? কোরেশরা ছিল সংখ্যায় এক হাজার, মুসলমানগণ ছিল মাত্র ৩১৩। কোরেশদের ছিল একশতটি অশ্ব–মুসলমানদের ছিল মাত্র দুটি অশ্ব। কোরেশদের উষ্ট্রবাহক ছিল সাতশ আর মুসলমানদের ছিল সত্তর। কোরেশগণ ছিল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত আর মুসলমানেরা ছিল নাঙ্গা তলোয়ার ও বল্লম হাতে–অশিক্ষিত। কোরেশগণ বদর প্রান্তরে এসেছিল যুদ্ধের নেশায় –আর মুসলমানগণ এসেছিল আবু সুফিয়ানের পথ রোধ করার আশায়। কোরেশগণ করল হামলা অতর্কিতে–আর মুসলমানরা করল তা প্রতিহত সতর্কতাতে। অথচ মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে মার খেয়ে কোরেশরা চোখে সরষের ফুল

www.pathagar.com

দেখতে লাগল। আর মুসলমানরা বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। চলুন দেখি এই মুষ্টিমেয় যোদ্ধাদের পক্ষে কে অলক্ষ্যে থেকে সাহায্য করেছিল।

(১) রিফা-ইবন রাফি 'যুরাকী হইতে বর্ণিত আছে–এবং রাফি ছিলেন বদরী। জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাদের মধ্যে বদরীদের কিরূপ মনে করেন? তিনি বলিলেন 'শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে, জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, ঐরূপই যে সমস্ত ফেরেস্তা বদরে যোগ দিয়েছিল।"

(সহহি বুখারী, তজরীদ, হাঃ নং ৬/৪২৩)

(২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে: নবী (সঃ) বলিলেন, ইনিই জিবরাইল, নিজে নিজের ঘোড়ার মাথা ধরিয়া আছেন এবং যাহার গায়ে যুদ্ধের সাজ। (সহীহ বুখারী তজরীদ, হাঃ নং ৭/৪২৪)

(৩) হযরত বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন আমরা তাহার সত্যতা অবলোকন করিয়াছি। অনন্তর তোমাদের সম্বন্ধে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তোমরা তাহার সত্যতা অবলোকন করিয়াছ কি?" (ইবনে হিসাম)

হযরতের বাণী হতে দেখা যায় শুধু ৩১৩ জন যোদ্ধা বদরে যোগদান করে নি। তাদের সঙ্গে ছিল–জিব্রাইল (আঃ) ও তাঁর দলবল ফেরেস্তা যাঁরা আমাদের চক্ষুর অন্তরাল থেকে কোরেশ সেনাদের ধ্বংস করেছেন। যারা বিধর্মী, হযরতের বাণীর প্রতি আস্থাশীল নয়–তারা দেখুন আল্লাহ সবার সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দিয়েছেনঃ-

"এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর–যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। যখন তিনি বিশ্বাসিগণকে বলিতেছিলেন –ইহাকি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে যে তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন? বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং যদি তাহারা স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পঞ্চ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ইহাকে সুসংবাদ ব্যতীত করেন নাই এবং এতদ্বারা তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়; এবং পরাক্রান্ত বিজ্ঞময় আল্লাহর নিকট হইতে ব্যতীত সাহায্য নাই।" (সূরা আল এমরান। আয়াত ১২৩-১২৬)

"এবং আল্লাহ অবিশ্বাসকারীদিগকে তাহাদের ক্রোধসহ ফিরাইয়া দিবেন, তাহারা কোনই সুফল পাইবেন না; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদিগের সংগ্রাম সম্বন্ধে যথেষ্ট, এবং আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রান্ত। এবং গ্রন্থানুগামীদিগের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে অবতরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্তরসমূহে এরূপ আতঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে তোমরা তাহাদের একদলকে হত্যা করিয়াছিলে এবং অন্যদলকে বন্দী করিয়াছিলে। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূমি, তাহাদের বাসগৃহ ও তাহাদের ধনসম্পত্তির অধিকারী করিয়াছিলেন, এবং সে ভূমিতে তোমরা কখনও পদার্পন কর নাই, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।"

(১) বিজয়ের ভবিষ্যৎ বাণী– (সূরা আজহাব, আয়াত ২৫-২৭)

"সাইউহ্‌জানুল জাময়া ওয়া ইউয়াল্লুনাদ্দুবুর" (সূরা জমর, আঃ ৪৫)

অর্থাৎ "অচিরেই ঐ দল পরাভূত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে।"

উপরে বর্ণিত কোরআনের বাণী হতে যে কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য যে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ স্বয়ং হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) অলৌকিক ভাবে সু-সজ্জিত সমর নায়ক হযরত জিব্রাইলকে দিয়ে অবিশ্বাসী কোরেশদের নিহত করে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন আর

www.pathagar.com

মুসলিমদের প্রাণে আশ্বাস ও শান্তি দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে আল্লাহর আর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

"অতএব তোমরা তাহাদিগকে সংহার কর নাই, বরং আল্লাহই তাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন; **এবং যখন তুমি ধুলি নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই বরং** আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে আল্লাহ বিশ্বাসীদিগকে স্বীয় সন্নিধান হইতে উত্তম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিতে পারেন; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।" (৮ঃ ১৭)

উপরে বর্ণিত মহাবাণী যখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই. ..... আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ঃ-এর মধ্যে গূঢ় রহস্য রয়েছে যা পাঠকবৃন্দের জানা একান্ত প্রয়োজন।

যখন সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র এক হাজার কোরেশ সৈন্য অশিক্ষিত অস্ত্রবিহীন তিনশ তের জন মুসলিম সৈন্যকে অতর্কিতে ঘিরে ধরল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) এক মুঠো বালি ও পাথর কণা হাতে নিয়ে কোরেশ সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করলেন। ফলে শত্রুসৈন্যের চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। ব্যথা-বেদনা ও অস্থিরতায় ভরে উঠল মন। দুর্বল হলো হৃদয়। শক্তিহীন হলো বাহু। নিষ্ক্রীয় হলো হাতের নাঙ্গা তলোয়ার। ঠিক এ সুবর্ণ সুযোগেই মুসলিম বীর সেনারা তাদের প্রহার করে, হত্যা করে দলে দলে নিপাত করল। এ অলৌকিক বিজয়ে বীর যোদ্ধা মুসলিমের প্রাণে এক আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল। অনেকের হৃদয় আত্মঅহঙ্কার ও গর্বে ফুলে উঠল। তারা জানত না কোন শক্তি অলক্ষ্যে থেকে তাদের এ শক্তি জুগিয়েছে। বদর যুদ্ধে মহাবিজয় এনে দিয়েছে। হযরতের বালুকা ও পাথর নিক্ষেপের কৌশল আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে দিয়েছেন। তুমি নিক্ষেপ কর নাই বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন-এ কথা ব্যক্ত করে রসুলকে (দঃ) যেমন কৃতজ্ঞ করেছেন-বিশ্বাসী যোদ্ধা সৈন্যদের অহঙ্কারকে দূরীভূতি করেছেন। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে বিজয়ের সফলতা আকাশ কুসুম চিন্তাধারার মতই ব্যর্থ একথা চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়েছে। চলুন আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি –হে আল্লাহ! সর্বসময়ে সর্বকালে আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

(২) বিজয়ের ভবিষ্যত বাণী–

"এবং যখন আল্লাহ উভয় দলের এক দল সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে–নিশ্চয় ইহা তোমাদের জন্য এবং তোমরা অস্ত্রহীনদিগকে নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন এবং **'আল্লাহ স্বীয় বাক্য'**–দ্বারা সত্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে এবং অবিশ্বাসীদের **'মূল কর্তন'**–করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।" [(৮ ঃ ৭)-সূরা আনফাল-আয়াত -৭]

পাঠকবৃন্দকে গভীরভাবে উপরে বর্ণিত বাণীসমূহ চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবার বহু পুর্বে হযরত যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন এ প্রতিশ্রুতির বাণী তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। **আল্লাহ স্বীয় বাক্য দ্বারা'**–কথাটির তাৎপর্য অনেক বেশি। কোরেশদিগের উপর মুসলমানদের মহা বিজয়েরই এ ভবিষ্যৎ বাণী আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি। যখন মক্কায় এ বাণী অবতীর্ণ হয় তখন কোরেশ নেতৃবৃন্দের পরাজয়–অসম্ভব মনে করে এ বাণীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল মনে করে এবং রসুলুল্লার (দঃ) প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও উপহাস করে। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানেই কোরেশদের শোচনীয় পরাজয়–নেতাদের নির্মমভাবে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ আর বিশ্বাসী মুসলিমের বিজয় এ বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে।

অলৌকিক সফলতার এ প্রতিশ্রুতি শুধু এক বছর পূর্বেই নয় হজরত মুহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বের বাইবেলে–এ ভবিষ্যতবাণী ব্যক্ত হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক। পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন এবং গভীর আগ্রহ সহকারে এ

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতির বাক্য দেখতে ইচ্ছা পোষণ করছেন। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন না, হযরতের প্রতি উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আনন্দ উপভোগ করেন তারাও দেখুন। চোখ-মুখ খুলতে পারে, অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হতে পারে। বাঁকা পথ সহজ হতে পারে। ঈর্ষা ও হিংসার মন পালিয়ে জঙ্গলে লুকাতে পারে। দেখুন বাণীটি কি?

(৩) "হে দদানীয় পথিক দল সমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমা দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও **ভারি যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল**। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর **এক বৎসরকাল মধ্যে কেদরের (কোরেশের) সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে। আর কেদর বংশীয় (কোরেশ বংশীয়) বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু ইসরাইলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন।"**

উপরে বর্ণিত ভবিষ্যৎ বাণী সমূহ হযরতের দেশত্যাগ অতি কষ্টে রাত্রি যাপন, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, পানীয় জলের অভাব প্রভৃতি অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। এছাড়া অত্যাচারী কোরেশ সেনাদের ভারী অস্ত্র যুদ্ধ সরঞ্জাম যে নব মুসলিমদের ভীতি সঞ্চার করেছিল এবং রসুলের জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করেছিল সেটাও ব্যক্ত হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে এ দাম্ভিক নেতাদের পতন, কোরেশ সেনাদলের লজ্জাকর পরাজয় এবং হযরতের মহাবিজয়ের কথা–সৃষ্টিকর্তা যা এ বাণীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তা কোরআনে বর্ণিত 'অবিশ্বাসীদের মূল কর্তন কথাটির সঙ্গে সম্পূর্ণই মিল রয়েছে। বদর যুদ্ধে শীর্ষস্থানীয় সাতজন প্রধান মূল নেতা নিহত হয়েছিল।

উপরে উদ্ধৃত কোরআন ও বাইবেলের বাণীসমূহ বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম যে সত্যের জন্য যে সংগ্রাম যুগে যুগে হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদের (দঃ) সময় হয়েছিল তা আল্লাহরই নির্দেশে এবং তাঁর ইচ্ছা ও সাহায্যেই। অন্য কারো ইচ্ছা ও শক্তিতে নয়।

বদর যুদ্ধের ফলাফল

বদর যুদ্ধ ঐতিহাসিকদের স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে, আজও দিচ্ছে এবং চিরদিনই দেবে। কেননা এর ঐতিহাসিক পটভূমি যেমন সুন্দর তেমনি চমকপ্রদ অলক্ষ্যে থেকে কোন মহাশক্তি যেন এ দুর্বল দলকে দুর্বার শক্তি জুগিয়ে দিল। রণকৌশল শিখিয়ে অশান্ত হৃদয়ে এক অমৃত সুধা ঢেলে দিল এই বলে:

"আল্লাহর আদেশে অনেক সময় ক্ষুদ্রদল বৃহৎ দলের উপরে পরাক্রান্ত হইয়াছে। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।" (কোরআন–সূরা বাকারা। আয়াত-২৪৯)

অধ্যাপক নিকলসন্, বদর যুদ্ধের গুরুত্ব লক্ষ্য করে তাই লিখেছেন "মুহাম্মদের (দঃ) বিজয়ের গুরুত্ব তাঁর পার্থিব ক্ষতি সাধনের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। যে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি এতে সংশ্লিষ্ট ছিল সে বিষয় চিন্তা করলে আমরা অবশ্য স্বীকার করব যে বদর যুদ্ধ মারাথানের মতই ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় যুদ্ধ।" (Literary History of the Arabs-page 174, By Prof Nihcolson)

বদর যুদ্ধের বিজয় ইসলামের বিজয়। অসত্যের উপর সত্যের বিজয়। বেইমান ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিজয়। এ যুদ্ধে হযরত (দঃ) পরাজিত হলে ইসলাম

www.pathagar.com

চিরতরে দুনিয়া হতে মুছে যেত। তাঁর অমূল্য জীবন রক্ষা পেত কিনা কে জানে? এ বিজয়ের ফলে শুধু কাফেরদের মনে ভীতিই আসল না, সমগ্র জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এ মহাবিজয়ী, রণকুশলী বীর সেনানীর উপর। ভয় ও ভক্তিতে সবার হৃদয় আপ্লুত হলো। দলে দলে যেমন বিজাতিয়রা ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল তেমনি হযরতকে (দঃ) অন্তরে অন্তরে আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করতে শুরু করল। অবিশ্বাসীদের মন জয় করা–তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা–বদর যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। দিকে দিকে যখন এ বিজয় বার্তা ছড়িয়ে পড়ল, অন্তর -বাইরে এ বিজয় ঘোষণায় যখন সবার হৃদয় আনন্দে উথলিয়ে উঠল জ্বিন-ইনসানের হৃদয় পুলকিত হলো, তখন অবিশ্বাসীর ঠাঁই কোথায়? তাই কোরেশ বীর সেনানীরা নির্মমভাবে নিহত হলো, পঙ্গু হলো, অকর্মণ্য হয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত দিতে শুরু করল। যে দ্বন্দ্ব এতদিন হযরতের (দঃ) উপর ও মদিনার নব মুসলিমদের উপর ছিল সে দ্বন্দ্ব এখন শুরু হলো নিজেদের মধ্যেই। আবু লাহাব আতঙ্কিত হলো, অবশেষে মৃত্যু বরণ করল। আবু সুফিয়ান নিজের অহঙ্কার টিকিয়ে রাখার জন্য হযরতের বশ্যতা স্বীকার না করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে কোরেশরাই খেপে উঠল। যারা এতদিন হযরতের (দঃ) বিরুদ্ধাচরণ করছিল তাদের অনেকেই প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করল। অনেকেই মুখে স্বীকার না করলেও হযরতের (দঃ) প্রতি আর বিদ্বেষ আচরণ করবার ইচ্ছা পোষণ করল না। বরং ভিতরে ভিতরে ইসলামের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হলো। কোরেশ বন্দীদের প্রতি মুসলমানদের সদয় ব্যবহার, মধুর আপ্যায়নের কথা ছড়িয়ে পড়লে শুধু মদিনায় নয়, মক্কার কোরেশ, পৌত্তলিক প্রভৃতি গোত্রের লোকেরাও মুগ্ধ হলো। বিশেষ করে বন্দীদের আত্মীয় -স্বজন হযরতের (দঃ) প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হলো! তারা প্রকাশ্যভাবে আবু সুফিয়ানের দলকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। মোটকথা মক্কার ঘরে বাইরে ঐ একটি নাম রাত-দিন নর-নারীর মুখে শুনতে পাওয়া গেল–'মুহাম্মদ'। শত্রুর মুখেও মুহাম্মদ (দঃ) –মিত্রের মুখেও মুহাম্মদ (দঃ)।

এবারে আসুন মদিনার পানে। মদিনার ইহুদীরা যারা হযরতের (দঃ) বিরুদ্ধে গোপনে শত্রুতা করেছে, আবু জেহেলের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে মুসলমানদের মদিনা হতে বিতাড়নের চেষ্টা করেছে তারা ধরা পড়ল। হযরতের (দঃ) শত্রু বলে চিহ্নিত হলো। নিজেদের আত্মপরিচয় গোপন রাখতে পারল না। ফলে চোরের ন্যায় জড়সড় হয়ে মুসলমানদের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকরা বদর যুদ্ধের বিজয় কাহিনী শুনে হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষিত হলো।

অন্যদিকে বিজয়ী মুসলমানেরা শৌর্যে বীর্যে বলিয়ান হয়ে মদিনায় আত্মপ্রকাশ করল, মদিনার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করল। আর এ রাষ্ট্রের নায়ক হলেন বীর সেনানী হযরত মুহাম্মদ। তাঁর একাধারে কঠোর আদেশ অন্যধারে অমিয় মধুর বাণী মদিনাবাসীদের অন্তরে যেমন ভয়-ভীতির সঞ্চার করল (ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসীদের) তেমনি আশা-উদ্দীপনা ও আনন্দের স্রোতধারা বইয়ে দিল সাধারণ নর-নারীর প্রাণে। মদিনাবাসীদের আজ এক প্রাণ এক হৃদয় এক জাতি, এক রাষ্ট্রপতি।

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক নব অধ্যায় রচনা করল। ইসলামের যুগান্তকারী ইতিহাসেরও সূচনা হলো। মুসলিমদের বীরত্ব, গৌরবকাহিনী পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা, মহারাজা ও নৃপতিদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো। ইসলামের বীর মুজাহিদরা যে শুধু শান্ত, ভদ্র ও নিরীহ মুমেন তাই নয়-এরা শক্তিশালী যোদ্ধা, পরাক্রমশালী জাতি ও সত্যের দিশারী বলে সবার ধারণা হলো। ধারণা হলো হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সত্যি আল্লাহর নবী–আল্লাহরই প্রেরিত রসুল। মুসলমান এ যুদ্ধ থেকেই পেল নতুন প্রাণ। শিরায়, উপশিরায় ও ধমনীতে শক্তির বন্যা বইতে রাগল, যার ফলে পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে আধিপত্য স্থাপন করল। বদর যুদ্ধ বিজয়ের যুদ্ধ। বদর যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ। বদর যুদ্ধ শক্তি আহরণের যুদ্ধ। বদর যুদ্ধ আত্মগৌরব ও আত্মচেতনার যুদ্ধ। এ যুদ্ধেই মুসলিম পেল প্রাণ, পেল আশা, পেল ভবিষ্যতের ভরসা। তাই মক্কা বিজয় করে নিজ আবাসভূমিতে ফিরে গেল। ইসলামের জয় পতাকা উড়াল, উল্লাসে মক্কা নগরী মুখরিত করল। কাবাকে করল বিশ্বের তীর্থস্থান। দেব-দেবীর দিল কবর। সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। ইসলামের অমিয়বাণী বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিল।

ওহোদের যুদ্ধ

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমাদের উপর সৈন্যদল আগমন করিয়াছিল, তখন আমিও তাদের প্রতি ঝটিকা ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে তোমরা দর্শন কর নাই, এবং তোমরা যাহা করিতেছিলে আল্লাহ তাহার পরিদর্শক ছিলেন। যখন তাহারা তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিম্ন হইতে তোমাদের প্রতি আগমণ করিয়াছিল এবং যখন দৃষ্টিসমূহ বিকৃত হইয়াছিল এবং প্রাণসমূহ কণ্ঠ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপ অনুমান করিতেছিলে। তদবস্থায় বিশ্বাসীগণকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কঠিন আন্দোলনে আন্দোলিত করা হইয়াছিল। এবং যখন কপট-বিশ্বাসিরাও যাহাদের অন্তরসমূহে ব্যধি আছে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে আল্লাহ ও তদীয় রসুল প্রবঞ্চনা ব্যতীত আমাদিগকে কোনই অঙ্গীকার প্রদান করে নাই। এবং যখন তাহাদের অন্তর্গত একদল বলিয়াছিল, হে মদিনাবাসিগণ, তোমাদের জন্য দাঁড়াইবার স্থান নাই, অতএব ফিরিয়া চল, এবং তাহাদের অন্তর্গত একদল নবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল, আমাদের গৃহসমূহ শূন্য রহিয়াছে, এবং উহা শূন্য ছিল না, তাহারা কেবল পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এবং যদি কোন পার্শ্ব হইতে কেহ তাহাদের উপর প্রবিষ্ট হইত, তৎপর তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিত তবে নিশ্চয় তাহারা অগ্রগামী হইত, এবং অত্যল্প ব্যতীত স্থির থাকিত না। এবং নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না এবং আল্লাহর সেই প্রতিজ্ঞা জিজ্ঞাসিত হইবে।" [কুরআন। সূরা আজহাব, আয়াত–৯–১৪]

উপরে বর্ণিত কথাগুলো কারো নিজস্ব নয়, তৈরি নয়। মনগড়া কেচ্ছা বা কাহিনী নয়। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মুসলমান ও কোরেশ পৌত্তলিকদের সম্বন্ধে যারা ওহদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ যুদ্ধের প্রসঙ্গ, ইতিহাস ফলাফল জানবার আগ্রহ পাঠক মাত্রেরই আছে। সবাই জানেন, তবু অতি সংক্ষেপে এর বর্ণনা দিতে হচ্ছে। নইলে আগ্রহশীল পাঠকদের নিকট অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধ যেমন বিশ্ব ইতিহাসকে অলংকৃত করেছে ওহদ যুদ্ধও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কোরেশ দলপতিদের হিংসানল যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তেমনি নির্বাপিত হয়ে এই ওহদ যুদ্ধে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। যদি এ অনল নির্বাপিত না হতো তবে বিশ্বের সুন্দর রূপ আজ চোখে পড়ত না। কে নির্বাপিত করেছে কে এ বহ্নিশিখার উপর মুষলধারায় বারিবর্ষণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, কার অলৌকিক শক্তি বলে পরম প্রতাপশালী কোরেশ বাহিনী ধ্বংস হয়েছে, পাঠকবৃন্দ চলুন গভীরভাবে আমরা তা পর্যবেক্ষণ করে যাই।

আবু জেহেল জাহান্নামে গিয়েছে। আবু লাহাবও তার অনুসারী হয়েছে। বদর যুদ্ধ তাদের এ সহজ ও সোজা পথ নির্দেশ করেছে। কোরেশ দলপতিদের মধ্যে বাকি আছে আবু-সুফিয়ান। হিংসায় তার মন জ্বলে উঠল। বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় সে সহ্য করতে পারল না। প্রতিহিংসায় হৃদয় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। কোরেশ যুবকদের ডেকে অগ্নিবর্ষণ করল।

"হে মক্কার কোরেশগণ! তোমরা কি এতই ভীরু যে বসে বসে কাঁদবে আর হা-হুতাশ করবে? নও মুসলমানরা কি তোমাদের দুর্বলতা দেখে হাসবে না? তোমাদের শরীরে কি রক্ত নেই? এত লাঞ্ছিত হবার পরেও কি প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে না? ধিক্ তোমাদের এ জীবন। ওঠ্ কলঙ্কের এ কালিমা আমাদের মুছতেই হবে। মুহাম্মদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিহত করে বাপ-দাদার ঐতিহ্য রাখতেই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন পর্যন্ত এর প্রতিশোধ নিতে না পারব ততদিন পর্যন্ত স্ত্রীর মুখ দেখব না এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করব না।"

আবু সুফিয়ানের অগ্নিঝরা বক্তৃতায় কোরেশ যুবকগন উত্তেজিত হলো। বিশেষ করে আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা পিতার শোচনীয় পরাজয় ও নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য বাঘের মত লাফিয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল ও বর্বর যুবক। এই দিকে বদরে নিহত আস্ফালনকারী বীর ওতবার কন্যা হিন্দা, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের কাপুরুষ বলে গালি দিলে তাঁরাও ক্ষেপে কুকুরের রূপ ধারন করল। এক জোটে সবাই প্রস্তুতি নিল। তিন হাজার সৈন্যের এক নুতন বাহিনী গঠিত হলো। এর মধ্যে ৭ শত বর্মধারী ও ২ শত অশ্বারোহী। বাকি সব পদাতিক ও উষ্ট্র-আরোহণকারী। সিরিয়া হতে ক্রীত বিপুল রণসম্ভার ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তারা চলল মদিনার দিকে। মদিনাকে গ্রাস করবে। নও মুসলিমদের নিহত করবে আর মুহাম্মদকে (দঃ) ধরে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। আশার শেষ নেই। হিংসার নিবৃত্তি নেই। মার্চ করে চলছে সেনাদল। হিন্দা ও রূপসী যুবতীরা যুদ্ধের গান গেয়ে নাচ্ছে আর যুবকদের মাতাল করে তুলছে। জয়পতাকা হাতে–হোবল দেবতাও সাথে। চমৎকার অভিযান! চমৎকার দৃশ্য!

হযরত কি এ সংবাদ জানেন? তিনি কি প্রস্তুত? তাঁর বীর মুজাহিদরা কি এ সংবাদ শুনে ভয়ে কাঁপছেন? হযরতের চাচা আব্বাস তখনও জীবিত। মুখে ইসলাম গ্রহণ না করলেও অন্তর তাঁর ইসলামের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। মুহাম্মদকে (দঃ) কেউ অপমান করুক, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করুক এটা তিনি কখনই চান নি। বরং মুহাম্মদের (দঃ) শত্রুদের তিনি ঘৃণা করতেন। তাদের উচ্ছেদ হোক—এটাই কামনা করতেন। আবু সুফিয়ানের দূরভিসন্ধি–তাঁর অভিযান, সেনাদলের অভিযান সব উল্লেখ করে–এক চিঠিতে হযরতকে দূত মারফত জানিয়ে দিলেন।

হযরত চাচার নিকট হতে এ চিঠি পেয়ে মুসলিম প্রধান ও অন্যান্য গোত্রের প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এরপর ১৪ই শওয়াল শুক্রবার (তৃতীয় হিজরী) জুম্মার নামাজের পর তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করলেন। মদিনা শহরকে শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে তৈরি হতে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন,

www.pathagar.com

"মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করা ঠিক হবে না। কেননা এতে বিপদ আসবার সম্ভাবনা। তাই আমার মতে শহরের অভ্যন্তর হতেই যুদ্ধ পরিচালনা করা উচিত। আপনাদের মতামত কি?"

আনসার, মোহাজের ও হযরতের সাহাবাবৃন্দ সবাই হযরতের মতেই রাজি হলেন। পৌত্তলিক প্রধান আবদুল্লাহ-বিন্-উবাইও এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। কিন্তু মুসলিম যুবকদল এ প্রস্তাবে রাজি হলো না। তারা বলল, "আমরা মদিনা শহরের অভ্যন্তরে চুপ করে বসে থাকলে শত্রুরা আমাদের কাপুরুষ বলবে। এতে বরং দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। তারা যখন আক্রমণের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেছে তখন মদিনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। তাই আমরা কেন বসে থাকব? বীরের মত ঘর থেকে বাহিরে যাওয়াই উচিত।"

উপস্থিত জনতার মধ্যে অধিকাংশই আবার যুবকদের এহেন উক্তিতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। হযরত বাধ্য হয়ে তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সবাইকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বললেন। মুসলিম নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, কিশোর-তরুণ সবাই প্রস্তুত। কে কার আগে যুদ্ধের সাজ নেবে, কে বীর বিক্রমে শত্রুর মুণ্ড ছিন্ন করবে, কে জয়ের নিশান হাতে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেবে–চলল এর প্রতিযোগিতা। দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, ভয় নেই, ভীতি নেই, সবার মনেই আজ আনন্দ, সবাই উৎফুল্ল। শুধু একজন নিরানন্দ—সে হলো আবদুল্লাহ-বিন-উবাই। প্রকাশ্যে সাহস পেল না স্রোতের মুখে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একাত্মতা প্রকাশ করল।

আছরের নামাজের পূর্বেই সবাই যুদ্ধ সাজে তৈরি হলো এবং মসজিদে সমবেত হলো। নামাজ অন্তে হযরত (দঃ) সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রধান সেনাপতির বেশে বাইরে আসলেন। অপূর্ব এ বেশ! অপূর্ব এ সমর সজ্জা! কোমরে বাঁধা 'জুলফিকার'–দেহে বর্ম, হাতে ঢাল, মাথায় লোহার টুপি, চোখে যেন আলোর মশাল। নির্দেশ হলো, চল, তোমরা সমরক্ষেত্রে চল।

মুহাম্মদের (দঃ) এমন বেশ কেউ কোনদিন দেখে নি। সবাই দেখেছে সাম্য মূর্তি উদার ও স্মিতহাস্যে পবিত্র মুখ। আজ তিনি যোদ্ধা, বীর যোদ্ধা, সেনাদলের প্রধান সেনানী। তাই এ বীর মূর্তি। তরুণ ও যুবক ছেলেরা তাঁর এ বেশ দেখে ভয়ে শিউরে উঠল। মনে করল হযরত (দঃ) তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা হযরতের কাছে এ প্রস্তাবের জন্য ক্ষমা চাইল কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে স্বীকার করলেন না। বললেন, 'আল্লাহর নামে চল। জয় তোমাদের সুনিশ্চিত।'

কালবিলম্ব না করে সেনাদল গঠিত হলো। কুচকাওয়াজ শেষ করে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। এক হাজার সেনাবাহিনীর অগ্রে চললেন হযরত (দঃ) নিজে একটি অশ্ব পৃষ্ঠে। সঙ্গে বীর সেনানী অধ্যাপক মুসায়েব, আলী ও হামাজা প্রভৃতি। হযরত মদিনা হতে ওহুদ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন। সেখানে একটি উঁচু পাহাড়ের উপর ঘাঁটি স্থাপন করলেন। এই ঘাঁটির সম্মুখ ভাগ খোলা ময়দান আর অন্যান্য দিক পাহাড়ে ঘেরা। হযরত সেনাদল নিয়ে সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন।

প্রভাত হতেই বেলালের কণ্ঠে সুমধুর আজান ধ্বনি উঠল। হযরত (দঃ) সৈন্যদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় তিনি সবাইকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হবার নির্দেশ দিলেন। আদেশ করলেন পিছনে অবস্থিত ওহুদ পর্বতের সুড়ঙ্গ পথ রক্ষা করতে। এ পথ দিয়ে শত্রুরা যদি একবার ঢুক্‌বার সুযোগ পায় তবে মুসলমানদের রক্ষা নেই। সম্মুখ ও পিছন দিকে থেকে শত্রুরা আক্রমণ করবার সুযোগ পাবে। কি সুক্ষ্ম তার চিন্তা? কি দূরদর্শিতা! সমর নায়কের কি অদ্ভুত জ্ঞান! পঞ্চাশজন অভিজ্ঞ তীরন্দাজকে এ

www.pathagar.com

সুড়ঙ্গ পথকে রোধ করবার জন্য নির্বাচিত করলেন; হুকুম দিলেন–"সাবধান; তোমরা এখান থেকে কিছুতেই সরবে না। শত্রুরা আক্রমণ করলে–তাদের পাল্টা আক্রমণ করো। পরাজিত হয়ে ওরা পালাতে শুরু করলে–তাদের পিছনে ধাওয়া করো না। ওদের রণসম্ভার লুট করার কামনাও তোমরা করো না ওদের ফেলে যাওয়া খাদ্য সামগ্রীর লোভেও এ সুড়ঙ্গ ছেড়ে চলে যেয়ো না। আমার এ আদেশ তোমরা পালন করবে, নইলে বিপদ হবে।"

সহীহ বুখারী [তজরীদ]-এ হাদিসটির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছেন। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য এবং নেতার আদেশ অমান্য করার প্রতিফল কি হতে পারে এখানে তার ব্যাখ্যা মেলে। হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ

বরা-আ-ইবনে-আযিব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ-

"নবী (সঃ) ওহদের দিন আবদুল্লাহ বিন জুবাইরকে পঞ্চাশ পদাতিকের নেতা করিয়া তাহাদের বলিলেন, **যদিও তোমরা দেখ পাখিরা আমাদের গোশত খাইতেছে, তথাপি তোমরা নড়িবে না তোমাদের এই স্থান হইতে, যতক্ষণ না আমি ডাকিয়া পাঠাই তোমাদের। আর যদি তোমরা দেখ আমরা পরাভূত করিয়াছি শত্রুদের এবং পদদলিত করিয়াছি তাহাদের তথাপি নড়িবে না যতক্ষণ না আমি ডাকিয়া পাঠাই তোমাদের। অতঃপর তাহারা পরাভূত করিলেন শত্রুদের।"**

বরা-আ বলেন, খোদার কসম, আমি দেখিলাম স্ত্রীলোকেরা কাপড় তুলিয়া পালাইতেছে। তাহাদের পা ও জঙ্ঘা দেখা যাইতেছে। তখন জুবায়ের লোকেরা বলিল, 'লুণ্ঠন, হে ভাই সকল লুণ্ঠন।' জয়লাভ করিয়াছে তোমাদের বন্ধুরা। এখন কিসের প্রতিক্ষা করিতেছে তোমরা?'

আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর বলিলেন, ' তোমরা কি ভুলিয়া গেলে তোমদের কি বলিয়াছেন রসুলুল্লাহ (সঃ)? তাহারা বলিল, কসম খোদার, আমরা অবশ্যই উহাদের কাছে যাইব এবং লুণ্ঠন দ্রব্য লইব। **যখন তাহারা তাহাদের নিকট গেল ঘুরিয়া গেল তাহাদের মুখ। তাহারা সম্মুখীন হইল পলাতক শত্রুদের।** এইরূপ যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের পিছনের দিকে ডাকিতেছিলেন, কেহই রহিল না তাহার সঙ্গে **'বারজন লোক'** ছাড়া। শত্রুরা আমাদের সত্তরজনকে পাইল এবং নবী (সঃ) ও সাহাবীরা বদরের যুদ্ধে পাইয়াছিলেন মুশরিকদের একশত চল্লিশজন। সত্তরজন নিহত ও সত্তরজন বন্দী। তারপর আবু সুফিয়ান তিনবার চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঐ লোকদের মধ্যে মুহাম্মদ আছে কি? নবী (সঃ) তাহাদের জবাব দিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনবার জিজ্ঞাসা করিল–'ঐ লোকদের মধ্যে ইবনে আবু কুহাফা আছে কি? (আবু বকর)। তারপর তিনবার জিজ্ঞাসা করিল, ঐ লোকদের মধ্যে উমর ইবনে-খাত্তাব আছে কি? তারপর সে নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল–'সব নিহত হইয়াছে উহারা। ইহাতে উমর (রাঃ) সংযত রাখিতে পারিলেন না নিজকে, বলিলেন– মিথ্যা বলিতেছ তুমি, খোদার কসম, হে খোদার দুশমন, তুমি যাহাদের নাম করিয়াছ তাঁহারা সব জীবিত আছে। আর বাকি আছে যাহা কষ্ট দিবে তোমাকে।

আবু সুফিয়ান বলিল, আজ বদরের বিনিময়। আর যুদ্ধ ত ডোলের মত। তোমরা এই লোকদের মধ্যে অঙ্গচ্ছেদ পাইবে, কিন্তু আমি উহার হুকুমও দেই নাই, উহা না পছন্দও করিতেছি না। তারপর সে রজয পড়িতে লাগিল–"উন্নত হও হুবল, উন্নত হও হুবল।"

তখন নবী (দঃ) বলিলেন, 'তোমরা তাহার জবাব দিতেছ না কেন? সাহাবীরা বলিলেন,–কি জবাব দেব? তিনি বলিলেন বল–'খোদা সবচেয়ে উন্নত ও মহৎ।'

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান বলিল,–আমাদের আছে উয্যা কিন্তু তোমাদের নাই উয্যা। নবী (সঃ) বলিলেন, 'তোমরা জবাব দিতেছ না কেন তিনি বলিলেন বল,–'খোদা আমাদের মওলা, তোমাদের নাই কোন মওলা।" [সহীহ বুখারী তজরীদ) ২য় খণ্ড তর্জমা আল-হাজ্ব আব্দুর রহমান খাঁ জিহাদের মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা নং ১২৬-১৩০-৯৫/১২৪]

মুহাম্মদ (দঃ) এর আদেশ পেয়ে সৈন্যরা অগ্রসর হলো। বীর বিক্রমে অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ সেনাদল শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোরেশ বীর তালহা আস্ফালন করে অগ্রসর হতেই মহাবীর আলী তার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। তালহার ভ্রাতা ওসমান এ দৃশ্য দেখে উন্মাদ হয়ে বীর সেনা হামজার দিকে অগ্রসর হলো। কি অদ্ভুত! এক মিনিট পার হলো না। সিংহের মত গর্জন করে বীর হামজা ওসমানের শিরে আঘাত হান্‌ল। ওসমানের দর্প চূর্ণ হলো। দেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। দু'জন কোরেশ মহাবীর এভাবে যুদ্ধের সূচনাতেই জাহান্নামে যাবে আবু সুফিয়ান ভাবতে পারে নি। কোরেশগণ তখন উপায় না দেখে একজোটে মুসলমানদের আক্রমণ করল। দফ্ বেজে উঠল। যুবতীরা সঙ্গীত লহরীতে কোরেশদের ক্ষেপিয়ে তুলল। প্রচণ্ড যুদ্ধ। বীর হামজা, জিয়াদ, শেরে খুদা আলী, আবু খোজানা, জেবায়ের প্রমুখ মহাবীরগণ শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ বজ্রাঘাতে যেমন ত্রাসের সৃষ্টি করে পুড়ে ছারখার করে দেয়, তেমনি মুসলিম বীরদের বজ্রকঠিন আঘাতে কোরেশ সেনাদল ছিন্নভিন্ন হলো। ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে শুয়ে পড়ল। অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়ে কম্পিত হতে লাগল। কোরেশ বীর খালিদ শেষ চেষ্টা নিল, সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করতে পারল না। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় রণসম্ভার ও খাদ্য সামাগ্রী ফেলে পালাতে শুরু করল। মুসলিম সেনারা বিজয়ের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে উঠল। নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গেল। অনেকেই পলাতক সেনাদের রসদপত্র লুট করতে ব্যস্ত হলো। এদিকে সুড়ঙ্গে পাহারারত চল্লিশজন তীরন্দাজ জয় সুনিশ্চিত দেখে অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে লুটে সামিল হলো। ধুরন্ধর কোরেশ বীর খালিদ-বিন-অলিদ দূর থেকে মুসলিমদের এ দুর্বলতা দেখে পিছন দিক দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করল। মাত্র দশজন তীরন্দাজ তার গতিপথ রোধ করতে পারল না– বরং তার হাতে নিহত হলো। এ সময় বীর খালেদ উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'ও-লো ওজজা; ও-লো হোবল' ওরে কোরেশ সেনাদল! এদিকে ছুটে আয়। শত্রু মোদের হাতের মুঠায়।' খালিদের এ আহ্বানে পলায়নরত সৈন্যরা ফিরে এসে চতুর্দিক থেকে মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণ করল।

জগৎবিখ্যাত রণকুশলী, মহাবীর হামজা প্রবল স্রোতের ন্যায় মহাপরাক্রমে কোরেশ সেনাদলের গতিপথ রোধ করলেন এবং তাঁর দীপ্ত তরবারী সঞ্চালন করে অসংখ্য কোরেশ সেনা নিহত করলেন। কিন্তু শেষে হাবসী দাস ওক্কাসের বর্শাঘাতে অকস্মাৎ শাহাদত বরণ করলেন। হযরত হামাজার মৃত্যুতে মুসলিম সেনাদলে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা শুরু হলো। হযরত দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে সবাইকে পূর্বস্থানে একত্রিত হবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু এ আহ্বানে সবাই সাড়া দিতে পারল না। শত্রুরা সুযোগ পেল। মুহাম্মদকে (দঃ) মারবার নেশায় চতুর্দিক থেকে পাথর, বর্শা, তীর নিক্ষিপ্ত হলো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম সেনা তখন হযরতকে রক্ষার জন্য চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখল। আবদুল্লাহ-বিন উবাই হাবসী নামক অসমসাহসী যুবক তরবারী হস্তে তাঁকে হত্যা করার জন্য সবেগে ধাবিত হলো। এ সময় অধ্যাপক মোসায়েব বিদ্যুৎ গতিতে হযরতের (দঃ) নিকট উপস্থিত হলেন এবং আবদুল্লাহর তরবারী প্রতিহত করতে গিয়ে নিজে শহীদ হলেন। এ সময় দলে দলে মুসলিম সেনারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এলো। হাবসী আবদুল্লাহ -বিন-উবাই তখন চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, "আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি–আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি"। পাপিষ্ঠ শয়তানের এমন

www.pathagar.com

চিৎকারে মুসলমানরা যেমন আতঙ্কিত হলো–কোরেশরা তেমনি আনন্দিত হলো। কোরেশ সেনাদল মুসলিম সেনাদের নিহত করার পরিবর্তে বলতে লাগল–'মুহাম্মদ যদি সত্যই নবী হতেন তা হলে কিছুতেই নিহত হতেন না। অতএব তোমরা তার ধর্ম পরিতাগ কর এবং মক্কায় আপন পরিজনদের মধ্যে ফিরে চল। ক্ষীণ বিশ্বাসী অনেক মুসলিম সৈন্যই তাদের কথা বিশ্বাস করল, অনেকেই বলল–মুহাম্মদই যখন বেঁচে নেই তখন যুদ্ধ করে লাভ কি? কার জন্য যুদ্ধ করব? এ কথা শ্রবণে হযরত আনাস প্রভৃতি বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ মুসলিমগণ সেনাদলকে সম্বোধন করে বললেন, –'যদিই বা রসুলুল্লাহ নিহত হয়ে থাকেন–তবু আল্লাহ ত বেঁচে আছেন। যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাসী হয়ে থাক তবে যে সত্যের জন্য রসুলুল্লাহ প্রাণ দিয়েছেন সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরাও প্রাণ দেব। এ পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকে না। কোন নবীই জীবিত নেই। আমরাই বা বাঁচার আশা কবর কেন? যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই মৃত্যুর ভয় করে জীবিত থাকতে চায়। চলো, তলোয়ার ধর। পরকালের অনন্ত শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ কর।'

এমন বাস্তব ও জলন্ত বক্তৃতায় সেনাদল আবার অনুপ্রানিত হলো। পূর্ণ উদ্যমে শত্রু সেনা ধ্বংস করার নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠল। তাদের দেহে যেন হাজার গুণ শক্তি বৃদ্ধি পেল। এতক্ষণ যোদ্ধারা নিরুৎসাহ, ভগ্নোদ্যম ও ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছিল। এ সময় যদি কোরেশগণ এদের উপর পূর্বের ন্যায় আঘাত হানত তবে মুসলমানেরা রক্ষা পেত না। তারা বলতে লাগল, 'আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি? যে মুহম্মদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সেই ত নিহত। এরা তো যোদ্ধা মাত্র। মুহম্মদের নির্দেশ শুধু পালন করেছে। এদের নিহত করে লাভ কি? এসব কথা বলতে বলতে তলোয়ার গুটিয়ে কোটীবদ্ধ করল। শিবিরের দিকে ফিরে চলল। অনেকেই শিবির অভ্যন্তরে ঢুকে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠিক এ-সময় হযরত আবুবকর, হযরত আলী ও হযরত তালহা প্রমুখ জগৎবিখ্যাত সাহাবাবৃন্দ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে রসুলুল্লার (দঃ) সন্নিকটে এসে পৌছলেন। হযরতের দেহ হতে তখন রক্তধারা ছুটছে। তাঁকে দেখে সাহাবাবৃন্দ যেমন ব্যথিত হলেন তেমনি রসুলুল্লাহ (দঃ) বেঁচে আছেন দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়লেন। দুঃখে মুসলমানগণ জর্জরিত, তাঁর উপর হযরতের দুঃসংবাদে সবাই মুষড়ে পড়েছিল। এমন সময় বীর সাহাবাদের আবির্ভাব, শত্রুসেনা ধ্বংস, শত্রুকিল্লা ভস্মীভূত, শত্রুসৈন্য পরাজিত দেখে তাদের আত্মচেতনা হলো, জ্ঞান ফিরে এলো, তন্দ্রা ছেড়ে গেল। হযরত নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও, ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত হয়েও সাহাবাদের বুকে জড়িয়ে নিলেন। হযরতের ব্যথিত হৃদয়ের এ উদার আহ্বান সবার মনে মৃতসঞ্জীবনের ন্যায় কাজ করল। সবাই হযরতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নেতার প্রতি কি শ্রদ্ধা কি ভক্তি? দুঃখের মধ্যেও চরম এক শান্তি। আল্লাহ কি সুন্দর ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন ওহদের এ ঘটনা।

"অনন্তর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতারণ করিলেন, উহা তন্দ্রা (নুয়াস) যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আর একদল নিজের জীবনের জন্য চিন্তা করিতেছিল। উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যের বিনিময়ে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেছিল যে—এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নাই? তুমি বল;—সকল বিষয়ে আল্লাহরই অধিকার। তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা গোপন রাখে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিবে না; তাহারা বলে যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকিত তবে আমরা এখানে নিহত হইতাম না; তুমি বল, যদি তাহারা গৃহের মধ্যেও থাকিত তবু যাহাদের প্রতি হত্যা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই স্বীয় ব্যবধানে আসিয়া উপস্থিত হইত। এবং ইহা এইজন্য যে তোমাদের অন্তরের মধ্যে যাহা আছে আল্লাহ তাহা কর্ষিত করেন এবং এইরূপে তিনি

www.pathagar.com

তোমাদের হৃদয়ের কথা পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন।' (৩ ঃ ১৫৪)

[কোরআন–সূরা আর-এমরান আয়াত–১৫৪]

ওদিকে কোরেশ সেনারা যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে হযরতের মৃতদেহ খুজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কে কার আগে এ দেহ উদ্ধার করবে চলল তার প্রতিযোগিতা। একটির পর একটি মৃতদেহ তারা পরীক্ষা করছে কিন্তু হযরতের মৃতদেহ খুঁজে পাচ্ছে না। শহীদ বীর হামজার লাশ পেয়ে শত্রুরা আনন্দে চীৎকার দিয়ে উঠল। পিশাচ নারী আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এ লাশের উপর বসে তার বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করল এবং মুখে পুরে চিবাতে লাগল। হাত-পা, নাক-কান কেটে দেহ বিকৃত করল, আর ঐগুলো দিয়ে গলার হার তৈরি করে উল্লাসে নৃত্য শুরু করল। দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। কোরেশ দলপতিগণ হযরতের লাশ খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবল মুসলমানরা এ লাশ লুকিয়ে রেখেছে অথবা মুহাম্মদ জীবিত আছেন। আবু সুফিয়ান তখন পর্বতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল–"মুহাম্মদ জীবিত আছ? আবুবকর আছ? উমর আছ? যখন কেউ উত্তর দিল না তখন সে ভাবল সব শেষ হয়েছে। কেউ বেঁচে নেই। আবু সুফিয়ানের এ দম্ভোক্তি হযরত ওমর সহ্য করতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠে উত্তর দিলেন, "ওরে পিশাচ! ওরে মিথ্যাবাদী। আমরা কেউ মরি নি–এখনও জীবিত আছি। তোর মুণ্ডু না নিয়ে মরব না।" আবু সুফিয়ান হতবাক হয়ে গেল। সাহস হলো না আর অগ্রসর হবার। সাহস হলো না পুনঃ যুদ্ধ করার। সাহস হলো না সৈন্যদের ফিরিয়ে এনে মুহাম্মদের কাছে যাবার। ভীত-বিহ্বল হৃদয়ে শুধু শাসিয়ে গেল,–'আগামী বছর তোমাদের দেখে নেব।'

কি আর দেখবে। জীবন নিয়ে এই যে গেল আর ফিরল না।

ওহদ যুদ্ধ শেষ। শত্রুরা পলাতক। মুসলমানেরা বিব্রত, বিক্ষত ও হতাহত। হযরতের দেহ হতে রক্ত ঝরছে। সম্মুখভাগের কয়েকটি পবিত্র দন্তও শহীদ হয়েছে। কপালে ঢুকেছে শিরস্ত্রাণের একটি লৌহ। যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করছেন। বীর তালহা নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও হযরতের (দঃ) জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। হযরত আলী তাঁর ঢাল দিয়ে পানি বহন করছেন এবং হযরতের সর্বাঙ্গ মুছে দিচ্ছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই। শিবিরেও খাদ্য নেই। এক কথায় বলতে হয় 'দুখের উপর দুঃখ'–যা আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন, 'অনন্তর তিনি তোমাদিগকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করলেন।" (৩ঃ ১৫৩)

(কোরআন—সূরা আল এমরান। আয়াত—১৫৩)

ওহদ যুদ্ধের এ শোচনীয় পরিণতিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বিব্রত হয়ে বলেছেন, "ওহদের দিনে রসুলুল্লার (দঃ) যে বিপদ আসিয়াছিল এবং মুশরেকগণ যখন চলিয়া গেল তাঁহার ভয় হইল উহারা আবার আসিবে। তিনি বলিলেন, 'কে আছে যে উহাদের পিছনে যাইবে? তখন সাহাবীদের মধ্যে ৭০ ব্যক্তি প্রস্তুত হইল। উহাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর ও যুবাইর (রাঃ)।

(তজরীদুল বুখারী। হাঃ নং ২৭/৪৪৪)

উপরে বর্ণিত বাণী হতে দেখা যায় যে, মুসলমানদের উপর এসেছিল এক চরম বিপর্যয়। ঘুর্ণীঝড়ের মত তছনছ করেছিল সব সম্বল। বাকি ছিল শুধু মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর ভক্তবৃন্দ।

ওহদ যুদ্ধের এ ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে সবার মনেই প্রশ্ন জাগে 'ওহদ যুদ্ধে কি মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছিল?'

চলুন, আমরা এ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে একটু আলোচনা করি।

www.pathagar.com

ওহদ যুদ্ধের ফলাফল

"যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়কেও তদ্রূপ আঘাত লাগিয়াছে; এবং এই দিবস সমূহকে আমি মানবগনের মধ্যে পরিক্রম করাই।" [৩ ঃ ১৪০ (সূরা–আল এমরান। আয়াত-১৪০)]

উপরে বর্ণিত আল্লাহর বাণী হতে আমরা ওহদ যুদ্ধের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি।

যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলে আসছে। বিজাতিয়রা ওহদ যুদ্ধকে মুসলমানের চরম পরাজয় বলে মনে করে এবং ফলাও করে এ ঘটনা বিবৃত করে। কোরেশরা যেমন বলেছিল–'মুহাম্মদ যদি আল্লাহর নবী হতেন তবে নিহত হতেন না"। তেমনি হিংসাপরায়ণ ও নিন্দুক চিন্তাবিদদের ধারণা যে মুহাম্মদ যদি সত্য ধর্ম প্রচারের প্রয়াসেই যুদ্ধ করে থাকেন তবে ওহদ যুদ্ধে আহত হয়ে পরাজয় বরণ করতেন না। ধর্মপরায়ণ মুসলিম ও অন্যান্য নিরপেক্ষ বিজাতিয় লেখকগন এমন ধারণা পোষণ করেন না। তাদের মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, জয় পরাজয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী–[১] –যে কথা নিম্নে বর্ণিত বাণী হতে আমরা দেখতে পাই। মুসলিম সৈন্যরা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, আপন পরিবারকে হারিয়েছে, মৃত্যুর পরেও শত্রুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের নবীকেও আঘাত প্রাপ্ত দেখেছে সত্য কথা। এটা পরাজয় ও লাঞ্ছনারই কথা বটে। কিন্তু তারা কি শত্রুদের অক্ষত রেখেছে? সতেরজন কোরেশ বীর যোদ্ধাকে হারায় নি? বিশ্ববিখ্যাত বীর যোদ্ধা খালেদ-বিন-তালহা, হিশাম, জালাস, মাসায়া, আবু সৈয়দ বিন-আবু-তালহা, উবাইয়া-বিন খালাফ আবদুল্লাহ-বিন্ হামিদ, আবু উমাইয়া যারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর তারা কি ওহদ যুদ্ধে জয়লাভ করে সগৌরবে নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে মদিনায় ঢুকেছিল? মদিনার প্রাচীর ভেদ করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে মুহাম্মদের নাম চিরতরে মুছে দিয়েছিল? এক বীর হামজা ছাড়া–হযরত আলী, হযরত আবু বকর, হযরত ওসমান, বীর অলিদের কবর রচনা করেছিল? কি করেছিল? মুসলমানের ভুলে সুড়ঙ্গ পথ খালিদ অধিকার না করলে কয় ঘণ্টা যুদ্ধ চলত–সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছে? যে মার শুরু হয়েছিল তা যদি আর কিছুক্ষণ চলত তবে কোরেশগণ ধূলিরাশির কোন্ অতল তলে মিশে যেত সেটা কি কোন চিন্তাবিদ লেখক লিখে গেছেন?

হযরত দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, দন্ত শহীদ হয়েছে জেনেই বিদ্বেষী লেখকগণ লিখে থাকেন যে ওহদের যুদ্ধে মুহাম্মদ পরাজয় বরণ করেছেন–সুখ্যাতি নষ্ট হয়েছে, নবী নামের অপমান হয়েছে। যদি হযরত এ যুদ্ধে শহীদ হতেন তাহলেই বা পরাজয়ের কি ছিল? হযরত মুসা ফেরাউনের ভয়ে সাগর পাড়ি দিলেন, এটা কি তার পরাজয়? হযরত ঈসা শত্রুর হাতে ক্রুশ বিদ্ধ হলেন, তাই বলে কি বলব তাঁর বিরাট পরাজয়? হযরত ইব্রাহিম নমরুদ কর্তৃক ধৃত হয়ে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলেন। বলবেন কেউ যে তিনি নমরুদের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন? কয়টি ইতিহাস শুনবেন? বিশ্ব-সৃষ্টির পর থেকেই চলছে যে ইতিহাস। জয় এবং পরাজয় পাশাপাশি বিরাজ করে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই কি জয় হয়? কোন অবস্থাতেই কি দুঃখ কষ্ট অশান্তি উৎপীড়ন আসে না? কেউ কি হলপ করে তা বলতে পারে?

টীকা ঃ ১ –"এবং দুই দলের সম্মুখীন হবার দিবস তোমাদের উপর যাহা উপনীত হইয়াছিল–তাহা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে।" সূরা –আল এমরান। আয়াত–১৬৬।

www.pathagar.com

ওহদের যুদ্ধে কোরেশ সৈন্য ছিল ৩ হাজার আর মুসলমান ছিল মাত ৭০০। (তিনশত সৈন্য নিয়ে আবদুল্লাহ-বিন-উবাই পলায়ন করেছিল। এ তিনশত নিয়ে ১ হাজার বলে সবাই জানে)। ৩ হাজার সৈন্যের বিপুল বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মক্কার দিকে পালিয়ে গেল, মদিনা আক্রমণ করল না,–মুহাম্মদকে মারল না–বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়ল না–এর মূলে কোন রহস্য নিহিত ছিল? আবু সুফিয়ান কি জয়লাভ করে পালিয়ে গেল, না মুসলিমদের অসহ্য মারে প্রান নিয়ে স্বদেশের দিকে দৌড়ল, কোনটি?—ঐতিহাসিকদের নিশ্চয়ই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। মুসলিমগণ যদি পরাজিতই হয়ে থাকে তবে কেন তাদের পরাজিত করার জন্য খয়বর, মুতা, হুনায়েন ও তাবুক অভিযান? পরাজিত যোদ্ধার সঙ্গে আবার জয়ের যুদ্ধ কেন?

নিরপেক্ষভাবে যারা একটু চিন্তা করেন তাঁরা একবাক্যেই বলবেন, **হযরতের পরাজয় নয়—চরম বিজয়**। ঘাত-প্রতিঘাতের এ বিজয় তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল সফলতা। বিশ্ববিজয়ী রণবীর হিসাবে পেয়েছিলেন খেতাব। এ রণবীরের রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠেছিল আকাশ-বাতাস, প্লাবিত হয়েছিল কলুষ কালিমা, ভেসে গিয়েছিল বিশ্বের যত মুনাফেক। ওহদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান তথা মক্কার কোরেশদের অন্তরে হয়েছিল ভীতির সঞ্চার [১]—যে ভীতি পরবর্তীকালে তাকে বাধ্য করেছিল মুহাম্মদের (দঃ) নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ'**–কলেমা পাঠ করতে। শুধু আবু সুফিয়ান নয় তার প্রধান সেনাপতি বিশ্ববিজয়ী বীর খালেদকেও বাধ্য করেছিল মুহাম্মদের (দঃ) পদতলে আশ্রয় নিতে। মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বীর সিপাহী হযরত আলী ও হযরত ওমরের নাম শুনে বহু রাজা-মহারাজা বিনা যুদ্ধে কুপোকাৎ হলো, ইসলামের পদতলে আশ্রয় নিল। সাধক মুহাম্মদ (দঃ), ধর্ম প্রচারক মুহাম্মদ, নবী মুহাম্মদ, আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ তরবারী হাতে নিয়ে, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ওহদ প্রান্তরে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলাফল আমরা দেখতে পাই পরবর্তী সময়ে। মুহাম্মদের নামে ভীতি, ওমরের নামে ভীতি, আলীর নামে ভীতি ওহদ যুদ্ধেরই ফল। মুসলমানের নাম শুনে এ ভীতি বিজাতিয়র প্রাণে বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে এবং চলবে। তৈমুর, নাদির, কোন্ বলে, কোন্ রণচাতুর্যে বিজাতীয়র প্রাণে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল? বেশি দিনের কথা নয় মাত্র সতেরজন অশ্বারোহীর আগমন বার্তা শ্রবণে বাংলার প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ লক্ষণ সেন ধন-দৌলত, রাজ-ঐশ্বর্য ও সৈন্য-সামন্ত পরিত্যাগ করে শুধু নিজ পরিবার নিয়ে কাপুরুষের মত পলায়ন করেন। এটাই ইসলামের জোস। এটাই ওহদ যুদ্ধের ফলাফল।

আল্লাহর যে বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে 'ওহদ যুদ্ধের ফলাফল' আরম্ভ করেছি, সেটার গূঢ় অর্থ কি এটার সামান্য বিশ্লেষণ দিয়ে এ পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

ওহদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের উপর নেমে এলো ভীতি, নিরাশা, অবসাদ ও ঘনীভূত তমসা তখন আল্লাহ পাক উপর্যুক্ত বাণীতে তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মুসলমানদের উপর শুধু যে এরূপ দুঃখ এসেছে তা নয়, কোরেশদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা যেমন আঘাত দিয়েছে তেমনি আঘাত পেয়েছে। হারিয়েছে রণসম্ভার, বল, বীর্য, খাদ্য সামগ্রী, আশা ও জয়ের নেশা। লাভবান মোটেই হয় নি। উপরন্তু শুনেছে স্বজাতির কাছে উপর্যুপরি গালিগালাজ। হারিয়েছে মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জত। আল্লাহর বাণী থেকেই বুঝা যায় যে মুসলমানরা নিঃস্ব হয়

টীকা ঃ ১ –"যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে আমি সত্বর তাহাদের অন্তরসমূহে ভীতি সঞ্চার করিব।" (কোরআন–সূরা আল এমরান। আয়াত ১৫১ এর অংশ)

www.pathagar.com

নি, পরাজিত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ এ যুদ্ধ থেকে কোরেশ ও মুসলমান দু-দলেরই হয়েছিল এক শিক্ষা-চরম শিক্ষা। কোরেশদের আস্ফালন, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ স্তিমিত হলো –সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও সংখ্যা লঘিষ্ঠের হাতে চরমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যে পরাজয় বরণ করতে হয়—বদরে এ শিক্ষা না হলেও ওহদে হয়েছে। সত্যের পক্ষে অলৌকিক শক্তি থাকে—প্রেরণা থাকে, সত্যের দিশারী প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে–এ কথা আবু সুফিয়ান ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিল। এটা বুঝা যায় তার একটা বাণী থেকে–**'যে মুসলমান স্বদেশ ত্যাগ করে পরিবার পরিজনের মায়া ভুলে হাসি মুখে প্রাণ দিতে পারে তাদের সঙ্গে লড়তে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'** বল থাকলেও সব সময় সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না—ন্যায়ের পথে না থাকলে অচল হয়ে যায়। এ শিক্ষা কোরেশদের ভালভাবেই হয়েছিল।

মুসলমানদের শিক্ষা হলো—নেতার আদেশ অমান্য করা পাপ ও বিপদ, যে বিপদ তারা ইচ্ছা করে ডেকে এনেছিল। তরুণদের উত্তেজনাপূর্ণ কথার স্থির মস্তিষ্ক বয়স্ক ব্যক্তিদের সমর্থন দেওয়া উচিত নয়। তরুণ মুসলমানগণ হযরতের সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে করেছিল এক চরম অপরাধ –যার মাশুল যোগাতে হলো খ্যাতনামা বীরদের। এ উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে তারা পেল রেহাই–ওহদ যুদ্ধের পরিণামে। যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে দুটি দল হয়েছিল—এক দলের ছিল দুর্বল ঈমান—যারা কোরেশদের সেনাদল দেখে ও যুদ্ধের পরিনাম চিন্তা করে পালাতে চেষ্টা করেছিল–আর একদল ছিল সত্যের সাধক, চরম বিশ্বাসী—যারা মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে যুদ্ধ করেছিল–উভয় দলই পেয়েছিল শিক্ষা। ফলে পরবর্তীকালে একতা, শৃঙ্খলা, বিশ্বাস ও নেতার আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করে সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করেছিল। এ মহান শিক্ষা দিয়েছিল ওহদের প্রান্তর।

ওহদের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা বেঁচে থাকা অবস্থাতে যেমন সম্মান পেয়েছিলেন, মৃত্যুর পরেও তেমনি সম্মান পাবেন। এ অঙ্গীকার আল্লাহ নিজেই করেছেন এই বলে ঃ

"অতএব যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়াছে ও স্বীয় গৃহসমূহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ও আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং সংগ্রাম করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে–নিশ্চয় তাহাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গল সমূহ আবৃত করিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করিব, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। ইহা আমার নিকট হইতে প্রতিদান এবং আল্লাহর সান্নিধ্যেই শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান। (সূরা আল-এমরান, আয়াত ১৯৫ এর অংশ)

যে সব বীর মুজাহিদগণ সত্যের জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তাঁরা চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রাখবেন। মৃত্যু আজ না হোক কাল হবেই। কুকুর শৃগালের মত মৃত্যু বরণ না করে, পশু ও অথর্ব হয়ে নিজ গৃহে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করে যারা শত্রুর মুকাবিলা করে ও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ ত্যাগ করে তারা অমর, তারা মরে নি। কবরেও তাদের মর্যাদা–কবরের মাঝেও তাদের পরিবেশন করা হয় সুখাদ্য। আল্লাহ নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন তাঁর মহাবাণীতে ঃ-

"এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত ধারণা করিও না; বরং তাহারা জীবিত। তাহাদের প্রতিপালক হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হইয়াছে।" সূরা-আল-এমরান। আয়াত -১৬৯)

ওহদের যুদ্ধে ঐতিহাসিকদের মতে ৭০ জন মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল আর কোরেশদের মধ্যে ২৩ জন। মুসলমানের প্রাণ হারানোর সংখ্যাটা হয়ত কাছাকাছি থাকলেও কোরেশদের মৃত্যু সংখ্যা যে নেহায়েত একটা গোঁজামিল সেটাতে কোনই সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

কেননা একমাত্র বীর হামজার হাতে মৃত্যু বরণ করেছে ৩১ জন, আলীর হাতে ৮ জন। দু'জনের মিলে ৪৯ জন। রসুলুল্লাহ যে মহাবীরের হাতে তরবারী তুলে দিয়েছেন সে আবু দোজানা কতগুলো বেইমান ধ্বংস করেছিল এ সংখ্যা কোন ঐতিহাসিকই লেখেন নি—কেন? এ প্রশ্ন কারো মাথায়ই জাগে নি? যে ৭০ জন মুসলমান প্রাণ হারালো –তারা কি কুকুর শৃগালের মত গুলি খেয়ে মরেছে না বীর যোদ্ধার ন্যায় মৃত্যুর পূর্বে দু'চার জনকে নরকে নিক্ষেপ করে মরেছে? মাত্র তেইশজন কোরেশ যোদ্ধা নিহত হলে বাকি ২৯৭৭ জন যোদ্ধাই জীবিত থাকার কথা। এত যোদ্ধা বেঁচে থাকতে আবু সুফিয়ান প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়–একটি মুসলিম যোদ্ধাকেও বন্দী করতে পারলো না কেন? সেটা কি চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিকদের রহস্যের জালে ধরা পড়ে না? বলতে হবে যুদ্ধের প্রথমাংশে মুসলিম সৈন্যরা অসংখ্য কোরেশকে নিহত করে শত্রু সেনাদের দুর্বল করেছিল, ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। এ সময় মুসলমানগণ আনন্দের আতিশয্যে ও লোভে লুটপাট শুরু করে, ফলে আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হয় কিন্তু শেষাংশে যখন তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে তখন এক একজন বীর মুজাহিদের হাতে কত কোরেশ যে নিহত হয় তার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় নি। তবে এটা নিশ্চিত যে যতগুলো মুসলিম সেনা নিহত হয়েছিল, কোরেশগণ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি নিহত হয়েছিল। তাই আবু সুফিয়ান চোখের সম্মুখে নিশ্চিত পরাজয় আসন্ন দেখে মদিনা আক্রমণের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। **কোরেশ সেনারা যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে যদি পালিয়ে স্বদেশের দিকে গমন করে থাকে তব সেটা তাদের জয় না পরাজয়?**

কোরআনের উদ্ধৃত বাণীর ২য় লাইনে বলা হয়েছে "এবং **এই দিবস সমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রম করাই।**"

জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-দুরাশা, সফলতা-ব্যর্থতা, এসব মানব জীবনে পর্যায়ক্রমে ঘটে থাকে। এসব নতুন কিছু নয়, অর্থহীন নয়; অবাস্তবও নয়। প্রতিদিন, প্রতি যুগ, প্রতি শতাব্দীর মাঝেই এগুলো রাষ্ট্রজীবন, সমাজ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে আসছে এবং আসবে। এসব বিপরীত অবস্থা আল্লাহ মানব জীবনে ঘটিয়ে শিক্ষা দেন, সতর্ক করেন ও জ্ঞান দান করেন। শুধু দিন থাকলে যেমন এ বিশ্ব অচল হতো, পুড়ে ছারখার হতো—তেমনি শুধু রাত্রি থাকলে—সৃষ্টি হত প্রাণহীন, সুপ্ত, লুপ্ত, হেমন্ত ও ঘুমন্ত। সৃষ্টির সুন্দর রূপ ধরা পড়ত না। বদর যুদ্ধের মাঝে এ ভয়াবহ রূপ ও সাময়িক ব্যর্থতার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষকের হাতে শৈশবে মার খেয়ে পরবর্তী জীবনে যদি কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা ডক্টরেট হতে পারে তবে সে মার খাওয়া তার কাছে লাঞ্ছনা নয়, অপমান নয়, **জীবনের পরাজয়ও নয়; বিজয়–মহাবিজয়।**

হুদায়বিয়ার সন্ধি

জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। চিন্তাশীল পণ্ডিত জ্ঞানী-গুণী, ওলি, গাউস কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের জন্য রয়েছে বিরাট চিন্তার খোরাক উপকরণ। মেষপালক বালকের ধ্যান ধারণা, বক্ষঃচ্ছেদ, জিব্রাইল (আঃ)-মারফৎ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জ্ঞানভাণ্ডারে হৃদয় ভর্তি, মাতৃভূমি মক্কা হতে প্রস্থান, মদিনায় অবস্থান, তায়েফবাসী ও কোরেশদের পৈশাচিক আচরণ, জীবনভর যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার; রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব, বিশ্বমানবের মুক্তির পথ রচনা প্রভৃতি স্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে চলবে এর উপর গবেষণা। চলবে স্বার্ণাক্ষরে লেখা ইতিহাস

www.pathagar.com

রচনা। এই রচনার মাঝে স্থান পাবে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার এক জলন্ত ইতিহাস। চলুন, এ ইতিহাস নিয়ে স্বল্প পরিসর জ্ঞানে আমরা একটু আলোচনা করি।

সোমবার, যীল-কাদ মাস, ৬ষ্ঠ হিজরী। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন তিনি তাঁর সহযোগী বিশ্বাসীবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ চিত্তে আল্লাহর পবিত্র ভূমি মক্কায় উপস্থিত হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করছেন। ভবিষ্যতে অনুচরবৃন্দ সহ হজ্ব করার সৌভাগ্য পাবেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন সাহাবীদের মাঝে। আনন্দে উথলিয়ে পড়ল সবার মন। 'আল্লাহু আবকর'–ধ্বনিতে আকাশ বাতাস হলো মুখোরিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও আল্লাহর কৃপা অনুধাবন করে খুশি মনে সবাইকে কাবা তওয়াফ করবার প্রস্তুতি নিতে আদেশ করলেন। শুধু তাদেরই নয় মদিনার নিকটবর্তী বিভিন্ন গোত্রের লোকজনদেরও আহ্বান জানালেন সঙ্গী হতে। সবাই প্রস্তুত হলো। প্রায় ১৫০০ শ ভক্তবৃন্দের একটি দল হজ্বের উদ্দেশে মদিনা হতে মক্কার দিকে রওনা হলো। রসুলুল্লাহর সঙ্গে তাঁর পত্নী উম্মে সালমাও সঙ্গী হলেন। আরব দেশের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বছরের এ যীলকাদ মাসটিতে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ জন্য সবাই যুদ্ধের সাজে কোন অস্ত্রসস্ত্র বহন করে নি। তবে প্রথা অনুযায়ী সবাই খাপবদ্ধ একটি তরবারী সঙ্গে নেবার সুযোগ পেত। হজ্বের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন বলে সঙ্গে কিছু কোরবাণীর পশু ছিল।

হজ্বযাত্রীগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়েছিল। একটি অগ্রবর্তীদল আর একটি পশ্চাদবর্তী দল। যুল হুজায়ফা পৌঁছিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) সবাইকে এহরাম বাধার নির্দেশ দিলেন। কেননা তখন পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে তিনি হজ্বব্রত পালন করতেই মক্কার দিকে রওনা হয়েছেন। কিন্তু অগ্রবর্তী দল যারা ইতিমধ্যে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা দেখতে পেলেন যে কোরেশরা হযরতের দলবল সহ মক্কায় প্রবেশের সংবাদ পেয়ে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে কোনক্রমেই তারা এ অভিযানকে সফল হতে দেবে না। তাদের বাধা দিতে দু'শ জনের একটি সশস্ত্র দল গঠন করেছে। এ দলের নেতৃত্বে আছে খালেদ-বিন-ওয়ালিদ ও ইকরাম। যখন অগ্রবর্তী দলের নেতা কোরেশদের এ পৈশাচিক দূরভিসন্ধির কথা রসুলুল্লাহকে (দঃ) অবহিত করলেন তখন তিনি সোজা পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর না হয়ে অতি দীর্ঘ দূর্গম পথে সমুদ্রের উপকূল দিয়ে রওনা হলেন। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি অবশেষে মক্কা হতে ৯ মাইল দূরে 'হুদায়বিয়া'–নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এখানে একটি আশ্চর্য–ঘটনা ঘটে গেল। হযরতের উট **'কাসওয়া'** হঠাৎ করে ঐ স্থানে বসে পড়ল। কিছুতেই আর উঠল না। সবাই চেষ্টা করল তুলতে পারল না। অনেকে মনে করল অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করার ফলে হয়ত উট দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই অবসর প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর নবী ঠিকই বুঝলেন এ আল্ কাসওয়া–বসে পড়ার পিছনে এক গভীর রহস্য নিহিত। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে না। মনে পড়ল তাঁর মদিনার কথা। হযরতের মদিনা আগমনে প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি গোত্র এমনকি ইহুদী, খ্রীষ্টান পর্যন্ত চেষ্টা করেছে রসুলকে (দঃ) স্থান দিতে। মনোরম পরিবেশের মাঝে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আপন করে রাখতে। কিন্তু কেউ পারে নি। হযরত (দঃ) এ আল-কাসওয়ার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে ঘোষণা করলেন–"তাঁর উট যেখানে গিয়ে থামবে, যার ঘরের কোনে আশ্রয় নেবে তার আতিথ্যই গ্রহণ করবেন।" এ ঘোষণায় সবাই খুশি হলো। দেখা গেল এ 'আল কাসওয়া' –দুটি এতিম বালকের এক দোতালা বাড়ির সম্মুখে থামল।

www.pathagar.com

হযরত আনন্দ-চিত্তে ঐ বাড়ির নিচ তলায় আশ্রয় নিলেন। সেখানেই গড়ে উঠেছিল মসজিদে নববী মদিনার প্রথম মসজিদ। এখান থেকে হয়েছে ইসলাম প্রচার। আল্লাহ নামের ধ্বনি যে ধ্বনি আকাশ বাতাসকে প্রকম্পিত করেছে। স্বৈরাচারী ও বেইমানদের পতন ঘটিয়েছে। আল-কাসওয়ার বসে যাবার পিছনে কি সুন্দর রহস্যই না ছিল।

ইতিহাস এরূপ আর একটি আশ্চার্য ঘটনারও সাক্ষি দেয়। আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান সম্রাট এর অধীন এয়মন প্রদেশের শাসনকর্তা ' আবরাহা'–কাবা ধ্বংস করার উদ্দেশে সুবৃহৎ, শক্তিশালী মহাপরাক্রান্ত 'মুহমুদ' -নামক বিরাট আকারের হাতী সহ আরও তেরটি হাতী ও সৈন্য নিয়ে যাত্রা করল। সফলকাম হলো না। আল্লাহর নির্দেশ ও অনন্ত মহিমায় অকস্মাৎ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রতম আকৃতির আবাবীল পাখির কঙ্কর নিক্ষেপে শক্তিশালী হাতীর দল ও সৈন্য সামন্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কথাগুলো রসুলের (দঃ) প্রাণে দোলা দিল। বুঝতে পারলেন 'আল-কাসওয়ার মাটিতে বসে পড়ার পিছনেও ঐ মহান সত্ত্বারই নির্দেশ। তাই তিনি আর অগ্রসর হলেন না। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়ই রইলেন।

কোরেশদের মধ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হলো ভয়-ভীতি, ঈর্ষা-হিংসা ও মনের দহন জ্বালায়। যে মুহাম্মদকে (দঃ) তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছে সেই আসবেন আবার মক্কার বুকে? না, তা হতে পারে না। সিদ্ধান্ত হলো কাফের সর্দার বালেদ -বিন-ওয়ারকা খুযাইকে মুহাম্মদ (দঃ) এর নিকট পাঠাবে এবং জানিয়ে দেবে যে তাঁকে তারা কাবা তওয়াফ করতে দেবে না। সর্দার বালেদ এ সংবাদ রসুলকে (দঃ) দিলে তিনি বললেন–'আমি যুদ্ধ করতে আসি নি। প্রয়োজন হলে সন্ধি করতে রাজি আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এ বিষয়ের উপর কিছু শর্তাবলী আরোপ করে তাকে জানালেন।

বালিদ-বিন-ওয়ারকা মক্কা ফিরে গেল। রসুলের (দঃ) মক্কা আগমনের অভিপ্রায় কোরেশদের জানলো কিন্তু কোরেশরা এতে একমত হতে পারল না। এরপর তারা স্থির করল সাকীক গোত্রের সর্দার উরওয়া বিন মাসুদকে পুনরায় হযরতের (দঃ) নিকট পাঠাবেন। তিনি হুদায়বিয়ায় গমন করে রসুলুল্লাহর সঙ্গে ভদ্রোচিত ভাবে আলাপ করলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সুমধুর ব্যবহার, আচার আচরণ পবিত্র উদ্দেশ্যে, মানব প্রেম ও দেশবাসীর প্রতি অকৃত্তিম ভালবাসা ও মায়া দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। শত্রু হয়েও, কাফেরদের সর্দার হয়েও মাথা নত করে তিনি তাঁর মিত্র হলেন। ফিরে এলেন মক্কায়। ডাকলেন সবাইকে। প্রতাপশালী কোরেশ ব্যক্তিদেরকে। রসুল সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করলেন এই বলেঃ- "হে আমার ভাই সকল, কসম খোদার।"

"আমি অনেক রাজা-বাদশা দেখেছি। রোমের সিজার পারস্যের কিসরা আর হাবশার নাজ্জাসির শাহী দরবারে গিয়েছি। কিন্তু কোন প্রজাকে তাদের রাজার প্রতি এমন বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসতে কোনদিন দেখি নি যেমন দেখেছি মুহাম্মদের অনুসারীদের।" [সহীহ বুখারী তজরীদ। শর্তকাণ্ড পরিচ্ছেদ হাঃ নং –৪]

উরাইয়ার নিকট হতে এরূপ মন্তব্য শুনবার পরেও তাদের মনের কলুষতার অবসান হলো না। শুকনো রুটির মত শক্ত হয়েই থাকল। তাই পুনরায় প্রেরণ করল হুলেইস -বিন-আলকামাকে। সে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সঙ্গে দেখা করল। হযরত তাকে কোরবাণীর পশু সমূহ দেখিয়ে তাঁর মহান উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলেন। সে বুঝতে পারল রসুলের (দঃ) অন্তরে কোন দুরভিসন্ধি নেই। হজ্ব পালন অর্থই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যে। সে সন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরে গেল। কোরেশ দলপতিদের জানালো–"মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের কাবা তওয়াফ থেকে বাধা দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত হবে না।"

www.pathagar.com

শত্রুদের মুখ হতে রসুলের প্রতি এরূপ মন্তব্য বিরল। সত্য আপনা আপনি বের হয়ে আসে। অসত্য জোর গলায় প্রচার করলেও তা মুহূর্তেই বিস্তৃতি লাভ করে এটা ঠিক কিন্তু সত্যের দ্বার রুদ্ধ করতে পারে না। এটা সবার জন্যই খোলা থাকে। অবিশ্বাসীও এ সত্যকে দেখে ভয় পায়। তার জলন্ত প্রমাণ আবু জেহেল, ও আবু সুফিয়ান এবং আরবে আস্ফালনকারী, হিংসুক ও গর্বিত কাফের গোত্র দলপতি।

দু-জন সুবিজ্ঞ দূত প্রেরণ করেও তাদেরই বিশ্বস্ত দলপতিদের মন্তব্য শুনেও এ নির্বোধ ও হিংসুক কোরেশগণ খুশি হতে পারল না। তাদের শত্রু বলে ও রসুলুল্লাহর (দঃ) সমর্থক বলে ধারণা করল। তাই পুনরায় সিদ্ধান্ত নিল সোহেল-বিন -আযরকে পাঠাতে। হৃদয় যাদের পাষাণ, মন যাদের শ্মশান তাদের কি হয় হিংসার অবসান? আল্লাহ-পাক ঠিকই বলেছেনঃ- "সুম্মুন, বুকমুন, উমইয়ুন ফাহুম লা ইয়ারজেউন"। অর্থাৎ -বধির, মূক অন্ধ-অতএব তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে না।" [সূরা বাকারাহ। আয়াত-১৮]

সোহেল-বিন-আমর হুদায়বিয়া এসে রসুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে দেখা করেন এবং কোরেশ নেতাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর একজন বিশ্বস্থ সাহাবীকে তাঁর সৎ উদ্দেশ্যের কথা জানাতে মক্কায় প্রেরণ করেন। ঐ সাহাবীকে আবুজেহেলের পুত্র ইকরামা চরমভাবে অপমানিত করেন ও তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে। পরে প্রবীণ কোরেশ দলপতি এ হীন চক্রান্ত হতে বিরত করে।

যখন এ সাহাবী হুদায়বিয়ায় ফিরে এসে রসুলুল্লাহকে (দঃ) এ ঘটনা ব্যক্ত করেন তখন এ সংবাদে তিনি মর্মাহত হন। পরে সিদ্ধান্ত নিলেন হযরত ওসমানকে (রাঃ) তাঁর বিশিষ্ট দূত হিসাবে মক্কায় প্রেরণ করবেন। কেননা মক্কায় হযরত ওসমানের বিশেষ একটা আধিপত্য ছিল। আবু সুফিয়ান যিনি হযরতের অন্যতম শত্রু ছিলেন তিনিও হযরত ওসমানের নিকট আত্মীয়। এছাড়া আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর সুহৃদ ও সহায়ক ছিল। হযরত ওসমান মক্কায় গিয়ে কোরেশ সর্দারদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং রসুলের (দঃ) —পবিত্র প্রস্তাবটি তাদের পড়ে শুনান। কিন্তু এ পাষাণের দল এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারল না। হযরত ওসমানও (রাঃ) তাঁর সিদ্ধান্তে পাহাড়ের মতই অটল। তাদের বার বার একই কথা বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে–"রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শুধু হজ্বব্রত পালন করবেন-কাবা -শরীফ তওয়াফ করবেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে নেই।' কাফেরদের উদ্দেশ্যে চরিতার্থ না হওয়ায় তাঁরা হযরত ওসমানের উপর বিরূপ হলো। তাঁকে হুদায়বিয়ায় ফিরে যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দিন কেটে গেছে। হুদায়বিয়ায় অবস্থানরত আগমনকারীরা স্বাভাবিক ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল হযরতের নীরবতায়। ইতিমধ্যে এক গুজব ছাড়িয়ে পড়ল যে হযরত ওসমানকে কাফেররা হত্যা করেছে। তিনি শহীদ হয়েছেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর মুসলমানগণ আর সহ্য করতে পারলেন না। সাহাবাবৃন্দ সহ সবাই রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট সমবেত হলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত লোককে 'বয়াত'-করালেন ঐ প্রান্তরে এক বাবলা গাছের নিচে কূপের পাশে। এ 'বয়াত'-কে বলা হয় **'বয়াতে রিজওয়ান'**। রসুলুল্লাহর (দঃ) হাতে হাত রেখে তাঁরা প্রাণের গভীর হতে এ অঙ্গীকার করলেন "হযরত ওসমান যদি সত্যই কোরেশদের হাতে শহীদ হয়ে থাকেন তাহলে আমরা এর প্রতিশোধ নেবই নেব। একটি জীবন বেঁচে থাকতেও এর ব্যতিক্রম হবে না।" জীবনের বিনিময়ে এ বয়াত গ্রহন করা হয়েছে বলে একে 'বয়াতে মউত'–বলা হয়। সত্যের পথে এ প্রতিজ্ঞা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। তিনি তাঁর মহাবাণীতেও একথা বলেছেনঃ-

www.pathagar.com

"আনাল্লাহা মওলাকুম। নিয়ামাল মাওলা ওয়া নিয়ামাল নাছির"।

অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক যিনি সর্বোত্তম সহায় এবং শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।" [সূরা আন-ফাল। আয়াত-৪০]

বয়াতের সময় রসুলুল্লাহ (দঃ)-বলেনঃ-

"এই হাত ওসমানের পক্ষ থেকে বয়াতের অংশ নিচ্ছে।"

হযরত ওসমানের প্রতি অসম্মান ও নিহত হবার সংবাদ হযরতের কোমল হৃদয়ে আঘাত হান্‌ল। দূতের প্রতি অসম্মানে এর অর্থ রাষ্ট্রপতি বা সম্মানিত শাসক বা নেতার প্রতি অসম্মান, এক কথায় বলতে হয় সমগ্র দেশ ও জাতিকে অবমাননা করা। কোরেশগণ রসুলের (দঃ) নিকট দূত প্রেরণ করেছে অনেক। বহুবার বহু প্রস্তাব নিয়ে। পূর্বে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু কোন দূতকে, আটকে রাখা, কষ্ট দেওয়া, অসম্মান করা বা নিহত করা হয় নি। হযরত দূতের সম্মান দিয়ে, তাঁর সঙ্গে মনোরম আচরণ করে, সুমধুর ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জটিল সমস্যার সমাধানের পথ সুগম করেছেন। সারা বিশ্বের জন্য এটা স্বর্ণাক্ষরেই লিখিত থাকবে। দূতের সম্মান প্রেরকের সম্মান। দূতের সম্মান রাষ্ট্রনায়কের সম্মান দূতের সম্মান তার দেশবাসী ও জাতির সম্মান একথা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বুঝিয়ে দিলেন সমগ্র দেশের শাসকবৃন্দকে।

হযরতের দৃঢ় আস্থা ছিল হযরত ওসমানকে (রাঃ) তারা অসম্মান করবে না কেননা তিনি তাদের অতি পরিচিত একজন প্রভাবশালী, ও নিকট আত্মীয়। তবু এ সাহাবাদের নিয়ে এ কঠিন বায়াত করতে বাধ্য হয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে হযরত ওসমান শুধু নিরাপদে ফিরে আসেন নি মক্কার বিধর্মী জালিমগণ সন্ত্রস্ত হয়েছিল। বিচলিত হয়ে সর্দারগণ প্রমাদ গুণছিল। তাই তারা সোহেদ বিন-আমরকে হযরতের কাছে পাঠিয়ে দেন-একটি শান্তির চুক্তি সম্পাদন করতে। এ চুক্তির প্রথম শর্ত হবে–'হযরত মুহাম্মদ যেন এ বছর হজ্বব্রত হতে বিরত থাকেন। মক্কায় প্রবেশ না করেন।'

সোহেল-বিন-আমর হুদায়বিয়ায় পৌছিলেন। রসুল (দঃ) তাকে দূতের সম্মান দিয়ে তার প্রস্তাবের কথাগুলো ধীর স্থির ভাবে শুনালেন। এর দু-পক্ষ মিলে এ সন্ধিপ্রস্তাব লিখতে বসলেন। হযরত আলীকে (রাঃ)-লেখকের মর্যাদা দেওয়া হলো।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বল্‌লেন লেখ– 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সোহেল আপত্তি জানালো রহমান ও রহিম শব্দ দুটি লিখতে। বলল–'রহমান-রহিম আবার কি?' এ দুটো শব্দ মানলেতো বহুদিন আগেই সমস্যার মীমাংসা হতো।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আবার লিখতে বললেনঃ- "এই চুক্তি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ'–কর্তৃক সম্পাদিত। সোহেল এ কথাতেও আপত্তি করে বলল–আমরা আপনাকে আল্লাহর রসুল বলে মানি না। যদি এটাই মানতাম তাহলে এতদিন ধরে এ বিরোধ চলত না এবং এ চুক্তির প্রশ্ন উঠত না। লিখুন-**"বিছমিকাল্লাহুম** -যেমন আপনি পূর্বে লিখতেন।"

ইতিমধ্যে হযরত আলী–**'মুহাম্মদ-রসুলুল্লাহ'** শব্দ দুটি লিখে ফেলেছেন। হুজুর (দঃ) হযরত আলীকে 'রসুলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিতে বললেন। হযরত আলী বললেন-"যে হাত 'মুহাম্মদ-রসুলুল্লাহ'–লিখেছে সে হাত এ শব্দটি কেটে দিতে পারে না।"

তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হাতে 'মুহাম্মদ-রসুলুল্লাহ'–**'রসুলুল্লাহ'** শব্দটি কেটে **'ইবনে-আবদুল্লাহ'** লিখে দিলেন। অর্থ-দাড়ালো-**'মুহাম্মদ ইবনে-আবদুল্লাহ'**।

www.pathagar.com

সহনশীলতা, ধৈর্য, উদারতা, ও মানবতার এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বে আর আছে কিনা জানি না। তিনিই সর্বপ্রথম শিখিয়ে দিলেন চুক্তি-পত্রে দু-পক্ষেরই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। নিজ স্বার্থে অটল থাকলে চুক্তিপত্র হয় না। এতে শান্তি আসে না। আক্রোশ বেড়ে যায়। সদিচ্ছায় বাধা পড়ে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনায়কগণ রসুলের (দঃ) এ শান্তি চুক্তি গভীরভাবে অনুধাবন ও অনুশীলন করুন। আল্লাহর বাণীকে স্মরণ করুনঃ-

"ইন্নামা ইউওয়াফফা সাবেরুণা আজবাহুম বে-গায়েরে হিসাব।" [কোরআন]

অর্থাৎ ঃ-

"ধৈর্যশীল এবং কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদের আল্লাহ অগণিত পুরস্কার দিয়ে থাকেন।"

বিশ্ববাসী দেখুন, কাফেরদের কোন সব প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছেন এবং আল্লাহর উপর অশেষ বিশ্বাস রেখে সত্যের জন্য এ শান্তি প্রস্তাবে নিজ হাতে সই করেছেন, অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে।

সন্ধিপত্র

(১) এ বছর মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা তওয়াফ বা হজ্ব না করেই মদিনায় ফিরে যাবে।

(২) আগামী বছর মুসলমানগণ ইচ্ছা করলে ওমরা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসতে পারবে। তবে খাপে বদ্ধ তরবারী ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না। তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। এ সময় কোরেশরা নগর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবে।

(৩) আগামী দশ বছরের জন্য কোরেশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি মক্কা ছেড়ে মদিনায় যেতে চায় তা হলে সে মুসলমান হলেও মুহাম্মদ (সঃ)–তাকে মদিনায় আশ্রয় দিতে পারবেন না। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যায় তবে মুসলমানরা বাধা দেবে না। আর মক্কাবাসীরাও তাকে মদিনায় ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য থাকবে না।

(৫) আরবের যে কোন গোত্র নবী (সঃ) এর সঙ্গে অথবা কোরেশদর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। এতে কোন প্রকার বাধা বা বিঘ্নের সৃষ্টি করা যাবে না।

(৬) চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত একদল অন্যদলের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(৭) হজ্বের সময় মুসলমানদের জানমালের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে এবং মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথে শাম, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

(৮) মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান আছে মুহাম্মদ (দঃ) তাদেরকে মদিনায় নিয়ে যেতে পারবে না।

www.pathagar.com

চুক্তির প্রতিক্রিয়া

হুদায়বিয়ার এ সন্ধি চুক্তিতে মুসলমানদের মাঝে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। তঁরা মনে করলেন এ চুক্তি মুসলমানদের জন্য পরাজয়, অবমাননাকর ও লাঞ্ছনাকর। মনের ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে ও জ্বালায় তারা উন্মাদ হয়ে উঠল। তাই, চুক্তির শর্তাবলী কেউ মেনে নিতে পারল না এমনকি হযরত ওমর (রাঃ) রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে রসুলুল্লাহকে (দঃ) বললে–"আপনি কি আল্লাহর সত্য রসুল নন? তবে কেন রসুল শব্দটি কেটে দিলেন?" হযরত উত্তর দিলেনঃ- "আমি সত্যই আল্লাহর রসুল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি চল্‌তে পারি না। তিনিই আমার রক্ষক ও সাহায্যকারী।"

হযরত ওমর (রাঃ) তবুও রাগ সংবরণ করতে পারলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন–"আপনি কি আল্লাহর ওহি অনুসারে আমাদিগকে বলেন নি যে,–"নিশ্চয়ই আমরা মক্কা প্রবেশ করব এবং কাবা তওয়াফ করব?" রসুলুল্লাহ (দঃ) ধীরচিত্তে বলেন–"বলেছিলাম ঠিকই। কিন্তু ওহীতে আল্লাহ এ কথা ত বলেন নি যে,–এ বছরই এটা সম্পন্ন হবে?" হযরত ওমর তখনও অস্থির। দৌড়ে গিয়ে সাহাবা শ্রেষ্ঠ, হযরতের প্রিয় আবুবকরের নিকট এ অপমানজনক শর্তের কথা ব্যক্ত করলেন। তখন হযরত আবু-বকর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–"রসুলুল্লাহর হাতে একবার যে হাত অর্পন করেছ–সে বাঁধন যেন আবেগের স্রোতে ঢিলা না হয়।

হযরত ওমর, সাহাবাবৃন্দ এবং অন্যান্য অনুসারীদের এ শর্তাবলী মেনে না নেবার পিছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যে ঘটনা রাজনীতিবিদ, সমাজপতি, ধর্মনীতি বিশারদ ও বিশ্বের প্রতিটি মানুষকেই স্তম্ভিত না করে পারে না। হযরতের পূত-পবিত্র চরিত্র, প্রতিশ্রুতি পালনকারী, ন্যায় নিষ্ঠাবান ও সুবিচারক হিসাবে এ ঘটনা তাঁকে অমর করে রাখবে। শিক্ষা দেবে অঙ্গীকার পালন করতে বিশ্বের শাসকগোষ্ঠীকে। শুনুন, এ ঘটনাঃ-

সোহেল এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন একত্রিত ভাবে চুক্তিপত্র লিখে শেষ করেছেন শুধু স্বাক্ষর বাকি রয়েছে ঠিক এই সময় ঐ কাফের দূত সোহেলের পুত্র আবু জান্দাল মক্কা থেকে পালিয়ে করুণ অবস্থায় এ সভায় উপস্থিত হলো। হাত-পায়ে ভাঙ্গা শিকলের বেড়ী। দেহ ক্ষত-বিক্ষত। আবেগে ও ক্রন্দনে সে সবাইকে জানায় যে–সে মুসলমান হবার অপরাধে তার ঐ পিতা অত্যাচারী সোহেল তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। আর অকথ্য নির্যাতন চালায় তার দেহ ও মনে। সমবেত জনতার কাছে অত্যাচারের চিহ্নাবলী দেখিয়ে সে আশ্রয় প্রার্থনা করে। মুসলিম জনতার মাঝে চাঞ্চল্যের ঝড় উঠে। রাগে শরীর জ্বলতে থাকে। তরবারী হাতে সবাই প্রস্তুত হয় চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ পাষাণ সোহেলকে চিরতরে খতম করতে। কিন্তু পারে নি রসুলের (দঃ) জন্য। তিনি এ অবস্থা দেখেও এবং মনে চরম ব্যথা অনুভব করেও উত্তেজিত হন নি। সোহেলকে বন্দী করার নির্দেশ দেন নি। আঘাতের বিনিময়ে প্রতিঘাত করার কল্পনাও করেন নি। তিনি ধীরচিত্ত, অটল ও অবিচল। এটাই ছিল হযরত ওমর, সাহাবা ও সমবেত মুসলিমদের মনের পঞ্জীভূত ব্যথা। সোহেলের প্রতি আক্রোশ ও চুক্তিনামা মেনে না নেবার কারণ।

এ অবস্থা দেখে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করলেন। এরপর আবু জান্দালকে বললেঃ- "ধৈর্য ধারণ কর আর সব কষ্টকে পুণ্য বলে সহ্য কর। নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রতিপালক তোমার জন্য ও তোমার সঙ্গী মুসলমানদের জন্য অবস্থার উন্নতি ঘটাবেন। আমরা যেহেতু ঐ চুক্তি করে ফেলেছি তাই চুক্তি ভঙ্গ করা কোনমতেই আমাদের জন্য সম্ভব নয়।"

www.pathagar.com

চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হলো দু-পক্ষে মুসলিম জনতার অসন্তোষ, রাগ অভিমান ও অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ সত্ত্বেও। হজ্ব সম্পন্ন করতে না পারলেও কোরআনের বিধান অনুযায়ী কোরবাণী দিতে হবে। সাহাবাদের প্রতি রসুলুল্লাহর (দঃ) কোরবাণীর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেউ মনপ্রাণ দিয়ে এ আদেশ মান্য করতে পারলেন না। সবাই যেন হতবাক, নীরব, নিশ্চুপ, আনন্দহীন ও প্রাণহীন। রসুলুল্লাহ (দঃ)–তাঁদের এ হেন অবস্থা দেখে বিমর্ষচিত্তে তাবুতে প্রবেশ করলেন। হযরতের এ অবস্থা দেখে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী উম্মুল মুমেনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রসুলুল্লাহকে (দঃ) বললেন ঃ- "হে আল্লাহর রসুল! আমার জাতি অবাধ্য নয়। তাঁরা বিদ্রোহও করে নি। তারা শোকে বিহ্বল ও দুঃখে মুহ্যমান। এবারও এ পরীক্ষায় আপনাকেই হাল ধরতে হবে। আপনি প্রথমে নিজের পশুটি কোরবাণী করুন। আপনার জাতি আপনাকে অনুসরণ করবে।"

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর এ পরামর্শ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন এবং নিজের উটটি কোরবাণী করলেন। এটা দেখে সাহাবী ও অন্যান্য অনুসারীগণ কিছুটা লজ্জিত হলেন এবং নিজ নিজ পশুদের আল্লাহর নামে কোরবাণী করলেন। এরপর ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটল। আল্লাহ পাক-তাঁদের সৎ উদ্দেশ্য ও কোরবাণীকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলেন। এ সন্ধিপত্র পরাজয় নয় মহাবিজয় বলেই ঘোষণা দিলেন তাঁর মহাবাণীতে এই বলে ঃ—

"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাৎহাম্-মুবিন।"[১] (৪৮ ঃ ১)

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রাকশ্যে বিজয়ে বিজয় দান করিয়াছি।"

সন্ধির রহস্য ও তাৎপর্য

হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে কোন্ গোপন রহস্য নিহিত ছিল সাধারণ মানুষ এমনকি হযরত ওমর এবং বিশিষ্ট সাহাবাবৃন্দ পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি। এ জন্য তাঁরা শান্তি চুক্তিতে রসুলের (দঃ) স্বাক্ষরদানকে মুসলমানদের স্বপক্ষে বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য এর কারণ ছিল ১ নং ও ৪ নং চুক্তি। ১ নং চুক্তিতে তাদের মদিনায় ফিরে যেতে হবে তওয়াফ বা হজ্ব না করে। মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। হজ্ব না করেই মদিনায় ফিরে যেতে হবে এটা কি কম অপমানের কথা? সমস্ত দুনিয়ার মানুষ জানবে মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করে পালিয়েছে। কোরেশদের আক্রমণ ও অত্যাচারের ভয়ে মুহাম্মদ (দঃ) নতি স্বীকার করে চুক্তিপত্রে সই করেছে। যদি সাহস থাকত, কোরেশদের মোকাবিলা করার শক্তি থাকত তাহলে কিছুতেই মুহাম্মদ (দঃ) এ চুক্তিতে সই করতেন না। এরূপ ধারণা করা ও রসুলুল্লাহকে (দঃ) অপমানের চোখে দেখা বিজাতীর পক্ষে অতি স্বাভাবিক। বিশেষ করে অজ্ঞ, অন্ধ ও মূর্খ আরবের কোরেশ ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের পক্ষে। এ চুক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) ও সাহাবীদের অবমূল্যায়ন করারও উপযুক্ত যুক্তি পেয়েছেও এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীরা এত ক্ষুব্ধ। এত রাগান্বিত। যার ফলে ওমর (রাঃ) -রসুলুল্লাহকে বার বার প্রশ্ন করেছেন এবং জবাব চেয়েছেন। শেষে হযরত আবু বকরের পরামর্শে আপাততঃ শান্ত হয়েছেন।

৪ নং চুক্তি মুসলমানদের জন্য সহনীয় নয়। কেননা আরবের অবিশ্বাসী কাফেরদের নিকট আত্মসমর্পণের সামিল। মক্কা হতেকোন ব্যক্তি যদি মদিনায় আশ্রয় নিতে গমন করে সে মুসলমান হলেও তাকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না রসুলুল্লাহ (দঃ) তাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মদিনা ত্যাগ করে মক্কা চলে যেতে ইচ্ছা করে তাহলে

টীকা ঃ ১ –কোরআন। সূরা ফাৎহ। আয়াত–১ 'ফাৎহ'–অর্থ বিজয়। 'ফাৎহাম-মুবিন' অর্থ-প্রকাশ্যে অথবা মহাবিজয়।

www.pathagar.com

বাধা দেওয়া চলবে না উপরন্তু মক্কাবাসী তাকে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। এ চুক্তি কি মদিনার মুসলমান মেনে নিতে পারে? এ চুক্তি তাঁদের নিকট অমানবিক, ঔদ্ধত্যিক, স্বৈরতান্ত্রিক ও নীতি বিবর্জিত। তবু মহাজ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)–এ সন্ধির প্রস্তাবগুলো স্বাক্ষর করে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। এর কারণ কি তা সবার বোধগম্য হবে? আল্লাহর ইশারা ও তাঁর ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে তিনি কোন কাজ করেন নি। ওহির মাধ্যমে তাঁকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যপদ্ধতি ও নিয়ম কানুন জ্ঞাত করানো হতো। তাই দৃঢ় বিশ্বাস, অসাধারণ ভক্তি ও সুদৃঢ় আস্থা নিয়েই পথ ধরতেন। মক্কা হতে মদিনায় প্রস্থান,–মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে হোদায়বিয়ার প্রান্তরে অবস্থান, –সেখান থেকে হজ্ব পালনে বাধা পেয়ে পুনরায় সাহাবীদের অসন্তোষ স্বত্ত্বেও মদিনা ফিরে যাওয়া –প্রতিটি কাজের মধ্যেই ছিল গূঢ় রহস্য। গূঢ় তাৎপর্য।

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি ও সমাজহিতৈষীদের পরামর্শ দিয়েছেন–জটিল সমস্যার সমাধান করতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য নিতে। তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন অথচ হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করার পূর্বের সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শও করেছেন কিন্তু কি তাঁদের মতামতের সঙ্গে এক হতে না পেরে নিজের সিদ্ধান্তই বলবৎ রেখেছেন। কারণ আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন এরূপ জটিল সমস্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিম্নোক্ত বাণীতেঃ-

"তোমরা জানিয়া রাখ যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল রহিয়াছে। **যদি সে অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের মতানুসারে করে তবে অবশ্যই তোমরা বিপদগ্রস্থ হবে।**" কোরআন। সূর হোজ্জরাত। আঃ-৭]

এবারে আমরা দেখব রসুলুল্লাহ (দঃ) যদি একক সিদ্ধান্ত না নিয়ে, সাহাবাদের মতানুযায়ী চুক্তিপত্র সই করতেন, সোহেলকে বন্দী করে তার ভাইকে ক্ষত-বিক্ষত করার প্রতিশোধ নিতেন, অথবা বন্দী করে অমানবিক নির্যাতন করতেন তা হলে কি হতো? হযরত ওসমান (রাঃ) -যাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) দূত হিসাবে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন তিনি কি ফিরে আসতে পারতেন? রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বংশধর ও নিজ আত্মীয় স্বজন যারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন তাঁরা কি নিরাপদ থাকতেন? যারা অন্তরে রসুলুল্লাকে (দঃ) ভক্তি করতেন, আল্লাহর নবী বলে প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে স্বীকার করতেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরই অনুসারী হবার আকাঙ্খা পোষণ করতেন -৪ নং শর্তের ব্যতিক্রম হলে তাঁরা কি কোরেশ কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে হোদায়বিয়ায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতো না? দু-শ বীর কোরেশ যোদ্ধা যারা হোদায়বিয়া আক্রমণ করে মুসলমানদের নিপাত করার জন্য তৈরি ছিল এ সন্ধিপ্রস্তাব না মানলে তারা কি ঘুমিয়ে থাকত? রসুলের (দঃ) নির্দেশ না মেনে ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদের যে অবস্থা প্রথমে হয়েছিল তার চেয়ে কি ভয়ানক রূপ ধারণ করত না? বিনা-বাধায়, নির্বিঘ্নে মান-সম্মান নিয়ে কি রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনায় ফিরে যেতে পারতেন এবং পরের বছর কি মক্কা বিজয় করে সগৌরবে, আনন্দের আতিশয্যে কাবা তওয়াফ করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হতেন? হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের চুক্তি মেনে নেবার কারণেই কি তাঁরা নিরাপদ ছিলেন না? আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে বেহেশতের অঙ্গীকার কি লাভ করেন নি? এ বিষয়ে হয়তো কেউ চিন্তা করতে পারেন নি। দেখুন, কি নিভৃত রহস্য ছিল এ চুক্তির মাঝে। রসুলকে (দঃ) শ্রদ্ধা করার অর্থই আল্লাহকে শ্রদ্ধা করা। রসুলকে (দঃ) মানার অর্থই আল্লাহকে মানা। তাঁকে বিশ্বাস করার অর্থই আল্লাহকে বিশ্বাস করা দেখুন, এ বিশ্বাসে রসুল (দঃ) এর অনুসারীদের কি লাভ হয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ-

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা সেই **'তরুতলে'**[১] -তোমার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল; ফলতঃ তাহাদের অন্তর সমূহে যাহা ছিল তাহা তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন; অতঃপর তিনি তাহাদের উপর সান্তনা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। এবং তাহাদিগকে **'অদূরবর্তী বিজয়'**[২] -দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এবং তাহার বহু যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যাদি পরিগ্রহণ করিবে এবং **আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়**। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইবে; অনন্তর তিনি তোমাদের জন্য ইহা অতি শীঘ্র করিয়াছেন এবং তোমাদিগ হইতে মানবদিগের হস্ত প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং যেন উহা বিশ্বাসীগণের জন্য নিদর্শন স্বরূপ হয় এবং যেন তিনি তোমাদিগকে সরল সুপথে পথ প্রদর্শন করেন।' [৪৮ : ১৮-২০]

উপরে বর্ণিত কোরআনের বাণী আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর হোদায়বিয়ার সন্ধি উপলক্ষে। সন্ধিটি হয়েছিল–'তরুতলে' অর্থাৎ হোদায়বিয়া প্রান্তরের এক বৃহৎ ও সুশীতল বাবলা গাছের নিচে–এক 'কূপের'[১] পাশে। এখানে রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং অন্যান্য অনুসারীদের কোন কষ্টই হয় নি। প্রথমতঃ পানির অভাব ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি তীর বের করে 'বিসমিল্লাহ'-বলে ঐ কূপে নিক্ষেপ করেন। এর পর হতে অজস্রধারায় পানি উঠ্‌তে থাকে–জমজম কূপের মত। কি অপূর্ব নিদর্শন! কোন্ অদৃশ্য ও অলৌকিক শক্তি আল্লাহপাক তাঁকে দিয়েছিলেন! তাঁর চুক্তিনামা বিফল হতে পারে? ঐ কূপের নাম অনুযায়ী হোদায়বিয়ার সন্ধি নামকরণ হয়েছে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'হোদায়বিয়ার সন্ধি'–বিশ্ব ইতিহাসকে অলংকৃত করেছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসাবে স্থান লাভ করেছে। বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য হিসাবে স্বজাতি-বিজাতীদের দ্বারা আলোচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে এবং রসুলের (দঃ)-অসাধারণ দূরদর্শিতার প্রমাণ করবে। কেন করবে না? এ চুক্তিকে **'বাইয়াতে-রিজওয়ান'**–বলা হয়। এর অর্থ **'সন্তুষ্টির অঙ্গীকার'**। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে উপরে বর্ণিত বাণী অবতীর্ণ করেছেন। সূরা-ফাৎহ এর প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে–**"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মহাবিজয়ে বিজয়দান করেছি।"**

১ নং -**'হোদায়বিয়ার সন্ধি'**–প্রকাশ্যে বা প্রত্যক্ষভাবেই মহাবিজয়। শান্তি ও সান্ত্বনারই সন্ধি–এ কথাই আল্লাহ বলেছেন। এরপর **'অদূরবর্তী বিজয়'**–এর কথা ঘোষণা করেছেন। এই অদূরবর্তী বিজয়ের আরবী শব্দ 'ফাৎহা কারিবা'–অর্থ যে বিজয় দূরে নয়–অতি নিকটে। এ বাণী ব্যর্থ হয় নি। এই শব্দটির ব্যখ্যায়ও কোন অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে নি। বরং নিখুঁত সত্য হিসাবেই প্রমাণিত হয়েছে। মদিনায় ফিরে যাবার এক বছর পরই রসুল (দঃ) দশ হাজার সহচর নিয়ে বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় মক্কা জয় করেন। কাবা তওয়াফ করে মনের বাসনা পূর্ণ করেন। ইসলামের জয়ডঙ্কা এখান থেকেই সারাবিশ্বে অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই 'খয়বর'– যুদ্ধে জয়লাভ করে বহু ধন সম্পত্তির অধিকারী হন। শুধু তাই নয় রোম, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, জর্ডান প্রভৃতি দেশও মুসলমানদের করায়ত্ত হয়। বিপুল ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য লাভে সমর্থ হন। কোরআনের এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিনত হয়েছে।

টীকা ঃ ১ । 'তরুতলে'–হোদায়বিয়া প্রান্তরে এক বৃহৎ ও শুশীতল 'বাবলা গাছ'।

২ । 'অদূরবর্তী বিজয়'–এক বছর পর সগৌরবে মক্কা বিজয় এবং পরবর্তীতে খাইবার, রোম, পারস্য, মিশর ইত্যাদি।

১ । কূপঃ- সহীহ বুখারীতে কূপের পরিবর্তে 'ডোবা' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২ নং চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানগণ এক বছর পর হজ্ব করার গ্যারান্টি পেল। হজ্ব-পালন হতে বিরত করে নি। এটাও একটি বিজয় যা সত্যে পরিণত হয়েছিল গৌরবের সঙ্গে মক্কা-বিজয়ের মাধ্যমে।

৩নং চুক্তিতে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। এ চুক্তি সম্পূর্ণই মুসলমানদের পক্ষে বলতে হয়। কেননা তারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পূর্বের ন্যায় সাহস পাচ্ছিল না। এটা তাদের দুর্বলতা ও ভীতিরই বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবেও তা ঘটেছিল। দশ বছর দু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এ চুক্তি মেনে নেবার পিছনে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দূরদর্শিতারও প্রকাশ ঘটেছিল। কেননা তিনি জানতেন যুদ্ধ দশ বছর বন্ধ থাকলে তাঁর কার্য সহজতর হবে। দৈনন্দিন মুসলমানের সংখ্যা বাড়বে। শক্তিশালী হবে। প্রকৃত যোদ্ধার সৃষ্টি হবে। বিজয় ও প্রচার তরান্বিত হবে। বেদুইন কোরেশ ও পৌত্তলিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে নির্বংশ হবে। হয়েছিলেও ঠিক তাই।

৪নং চুক্তি বাইরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত কঠিন। যা পূর্বে আলোচনা করেছি। শুধু পরের লাইনটির ব্যাখ্যা দেই নি সেটা হলো যদি কোন মুসলমান মদিনা ত্যাগ করে মক্কা চলে যায় তবে মুসলমানরা বাধা দেবে না। আর মক্কাবাসীরাও তাকে মদিনায় ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) -চিন্তা করে দেখলেন, যে সব আরববাসী মুসলমান হয়েও মক্কায় ফিরে যেতে চায় তারা দুর্বল চিত্ত। ধর্মের প্রাধান্য না দিয়ে, আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি বিশ্বাস না রেখে, যেতে চায় তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়। এদের সঙ্গে রাখাও নিরাপদ নয়। তাদের কোরেশগণ ফিরিয়ে না দিলে মদিনার মুসলমানদের কোনই ক্ষতি হবে না। সেখানে ফিরে গেলে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হবে। তাই এ চুক্তি মুসলমানদের বিপক্ষে নয়। এতে পরাজয়েরও কোন কারণ নেই। বরং আরববাসীদেরই ক্ষতি হয়েছিল। পক্ষান্তরে তারাই পরাজিত হয়েছিল। কেননা তাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা চরম বাধার সৃষ্টি করেছিল। এর সুন্দর রহস্য আমরা খুঁজে পাই সহীহ বুখারীর হাদিস গ্রন্থ হতে সেখান হতে জানা যায়;

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনায় ফিরবার পর আবু বসীর নামে এক কোরাইশী মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট আসলেন। কোরেশগণ দু-ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলেন রসুলের (দঃ) নিকট এই অনুরোধ জানিয়ে "আপনি রক্ষা করুন যে চুক্তি আমাদের সহিত করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঐ দুই ব্যক্তির নিকট দিয়া দিলেন। তাহারা উহাকে লইয়া যুলহুযাইফা পৌঁছিলে সকলেই নিজেদের খেজুর খাইতে বসিল। আবু বসির তাহাদের একজনকে বলিল,-'হে অমুক কসম খোদার আমি দেখিতেছি তোমার এই তরবারীখানি অতি উত্তম। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি তরবারীখানি খাপ হইতে বাহির করিয়া বলিল, হ্যাঁ, কসম খোদার, এখানি খুবই উত্তম। আমি বারবার পরীক্ষা করিয়াছি ইহাকে। আবু বসির বলল,-'আমাকে একটু দেখিতে দাও, আমি দেখি উহা। সে তরবারী খানি আবু বসিরের হাতে দিল এবং আবু-বসির উহা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া নিহত করিল। অপর ব্যক্তি পলাইয়া মদিনার মসজিদে উপস্থিত হইল এবং রসুলুল্লার সঙ্গে দেখা করিল।" সহীহ-বুখারী (তজরীদ)। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। শর্তকাণ্ড পরিচ্ছেদ হাঃ নং-৪। পৃঃ নং ৫৪।

যখন বসির এসে রসুলুল্লার (দঃ)-সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন তখন একথা শুনেও রসুলুল্লাহ (দঃ) তাকে রাখতে পারলেন না। মক্কা ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে তিনি মুসলমান হয়ে মদিনায় এসেছিলেন। কিন্তু চুক্তিনামার শর্ত অনুযায়ী মদিনা হতে ফিরে যেতে হয়েছিল। রসুলের (দঃ) দ্বিতীয়বারের নির্দেশ পেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে মদিনায় রাখা হবে না। উপরে বর্ণিত হাদিসের শেষ অংশে এরূপ ব্যক্ত হয়েছেঃ-

"যখন আবু বসির এ কথা শুনল সে বুঝতে পারল তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে তাহাদের নিকট (কোরেশদের)। সে চলিয়া যাইয়া সমুদ্রের তীরে পৌঁছিল। ওদিকে জান্দাল -বিন-সোহাইলও মক্কাবাসীদের নিকট হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবু-বসিরের সহিত মিলল। এইরূপে যে কেহ কোরাইশ হইতে মুসলমান হইয়া আসিত সেই আবু বসিরের সহিত মিলিত। অবশেষে তাহাদের বেশ একদল হইল। কসম খোদার, যখনই তাহারা শুনিত কোন কোরাইশ কাফেলা সিরিয়ার দিকে যাইতেছে তাহারা ওঁৎ পাতিয়া থাকিত উহাদের জন্য এবং তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের মাল লইয়া যাইত।"

নিত্য দিনের এরূপ ঘটনা আরববাসীদের কানে পৌঁছিলে তারা ভীত হয়ে উঠল। বিদেশে যাবার পথ রুদ্ধ হলো। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হলো। চুক্তির শর্তে ক্রুদ্ধ হলো। কোরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধে আগুনের ঝড় বইতে লাগল। তাই বাধ্য হলো নিজেরাই এ চুক্তি বাতিল করতে। তাদেরই স্বার্থে মদিনাবাসী মুসলমানদের স্বার্থে নয়। এদিকে মদিনাবাসী মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ লাভ করল। দূর-দূরান্তে তাদের যাতায়াত ও ব্যবসায় আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি হতে লাগল।

৫নং চুক্তি অনুযায়ী আরবের যে কোন গোত্র রসুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে অথবা কোরেশদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে। এ চুক্তির ফলে বনু খুযা'আ গোত্র রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে মিলিত হলো। আর বনু-বকর গোত্র কোরেশদের দলে বন্ধন সূত্র স্থাপন করল। বনু-খুযা ও বনু-বকর গোত্রদ্বয় একে অপরের শত্রু ছিল। এ শত্রুতা চলে আসছিল বংশ-পরম্পরায়। এ চুক্তির ফলে বনু-বকর গোত্র চরম সুযোগ মনে করে কোরেশদের দলভুক্ত হলো। মনে করল এদের সহায়তায় 'বনু-খুযাকে'-চিরতরে এ দুনিয়া হতে মুছে দেবে। অকস্মাৎ বনি-খুযার উপর তারা আক্রমণ চালালো। বহু লোককে হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ লুট করল। বনি-খুযা সম্প্রদায় প্রাণ রক্ষার্থে হারাম শরীফে আশ্রয় নিল। সৃষ্টির শুরু থেকেই বিশ্বের প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে এ হারাম শরীফে ছিল পবিত্র স্থান, নিরাপদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। ইতিপূর্বে কেউ এর ভিতর প্রবেশ করে কাউকে নিহত করে নি বা যুদ্ধ করে নি। কিন্তু এ শয়তানের দল বনু-বকরর, আল্লাহর পবিত্র স্থানেরও মর্যাদা দিল না। 'নওফেল'–নামক এক নির্মম-পাষাণ, কাফের সর্দারের ইঙ্গিতে এই হারাম শরীফের ভিতরই বনু-খুযাইয়ার দলকে আক্রমণ করল এবং নৃশংসভাবে কিছু লোককে হত্যা করল। যারা বেঁচে ছিল তারা প্রাণ রক্ষার্থে মদিনা প্রস্থান করল এবং রসুলুল্লাহকে (দঃ) তাদের অবস্থার বর্ণনা দিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)-কোরেশদের নিকট তিনটি শর্ত পেশ করলেন (১) যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ দেওয়া (২) কোরেশদের বনুবকর গোত্রকে সাহায্য করতে বিরত থাকা। (৩) অন্যথায় হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল করা।

বনু-বকর মনে করেছিল কোরেশদের সাহায্য পাবে কেননা বনু-খুযা গোত্র হযরতের (দঃ) দলে মিশেছে। রসুলের (দঃ) এ পত্র তাদের হতবাক করে দিল। 'বনু-বকর'–গোত্র অবশেষে কোরেশদের চক্ষু শূল হয়ে দাঁড়াল। কোরেশদের পক্ষ হতেই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেওয়া হলো। কি রহস্য! যে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের জন্য মদিনার মুসলমানগণ মাত্র

www.pathagar.com

কয়েকদিন পূর্বে ব্যস্ত হয়েছিল, ক্ষিপ্র ব্যাঘ্রের মত লাফালাফি করছিল, মনের দহন জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছিল–ঠিক সেই অবস্থায়ই সৃষ্টি হলো—কোরেশ বেদুইন পৌত্তলিক আরববাসীদের। অন্যদিকে মদিনার মুসলমানদের প্রাণে এলো এক আনন্দের জোয়ার। মক্কা-বিজয়ের নেশা। বিশ্বজুড়ে ইসলাম প্রচারের আশা। আল্লাহর ঘর কাবা তওয়াফ করার এক দুর্বার ভরসা।

কোরআনের **'অদূরবর্তী বিজয়ের'**–ঘোষণা আজ যেন আলোর সূর্য রূপেই উদিত হলো সবার মনের আকাশে। আনন্দের উল্লাস, বিজয়ের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড় মরু সাগর আকাশে বাতাসে। হোদায়বিয়ার সন্ধি কে বলে পরাজয়?

৬নং চুক্তিতে ছিল কোনদলই মেয়াদকালের মধ্যে একে অপরের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এ শর্ত আরবের পাষাণ, ও হিংসুকরাই ভঙ্গ করেছে। গোত্রে গোত্রে হানাহনি, খুনাখুনি যার বর্ণনা উপরে কিছুটা দিয়েছি। ক্ষতি মুসলমানদের হয় নি। হয়েছে প্রভাবশালী ঐ দু-গোত্রের।

৭নং চুক্তিতে হজ্বের সময় মুসলমানদে জান-মালের নিরাপত্তার বিধান ছিল এ শর্তে। প্রয়োজন পড়ে নি, কোরেশদের এ শর্ত মানতে। কেননা এক বছর পর ওমরা হজ্বের কথা ছিল। তার পূর্বেই মক্কা জয় করে মুসলমানগণ বিশ্বজয় করার নেশায় মেতে উঠল। কোরেশদের নিরাপত্তা দেবার প্রয়োজন পড়ল না। বরং হযরতের নিকট হতে নিরাপত্তা পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। নিরাপত্তাও পেল মানুষ হিসাবে, আরববাসী হিসাবে।

৮নং-চুক্তির শর্ত হযরতকে মানবার প্রয়োজন পড়ে নি। কেননা মক্কা বিজয়ের পরে যার ইচ্ছা মুসলমানরা আরব হতে মদিনায় গমন করেছে। রসুলের চিরসঙ্গী হয়ে ধন্য হয়েছে।

সন্ধির ফলাফল

হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে 'মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ' স্বাক্ষর করাতে যে মুনাফেক সোহেলের প্রানে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল, সন্ধির শর্তে মাতাল হয়ে যারা মুহাম্মদের (দঃ) পরাজয় মনে করে লাফালাফি করছিল, হজ্ব পালনে বাধা দিয়ে বাহাদুরী দেখাচ্ছিল,–কোন আরববাসীকে হযরতের (দঃ) দলে মিশবার সুযোগ দিল না বলে গর্বে বুক ফুলিয়ে চলছিল, –মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই তাদের হীন স্বার্থ ও দুরভিসন্ধির মূলোৎপাটন হলো। মিত্র শত্রু হলো। আপনজন পর হলো। অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতায় দিন দিন বেড়ে চলল। অন্তরে বাইরে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। শক্তি সাহস বল ভরসার ভাটা পড়ল। লজ্জা অপমান, ভয়-ভীতিতে শরীর অবসন্ন হতে লাগল। আবু জেন্দাল ও ওৎবা দলের লোকদেরকে গোপন হত্যার কৌশল শুনে আরববাসীদের ব্যবসা বাণিজ্য ডকে উঠল। কোরেশ হাশিম পৌত্তলিক সব দলের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হলো এ সুযোগে মুহাম্মদের (দঃ) আত্মীয় স্বজন প্রীতিভাজন ও আপন জনেরা মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় প্রস্থান করার সুযোগ পেল। কোরেশ দলপতিরা হযরতের মক্কা অভিযানের সংবাদ পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মগোপনের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। হৃদয় মনে একটি সুরই আঘাত হানতে লাগল কেন স্বীকার করি নি–**'মুহাম্মদ-রসুলুল্লাহ'কে**। যে সন্ধির ফলাফল মুহাম্মদের (দঃ) পরাজয় মনে করে তারা ঢাক ডোল পিটেছে–সেই সন্ধি আজ রহস্য হয়ে মুহাম্মদের (দঃ) মহাবিজয় ঘোষণা করে আকাশ বাতাস

www.pathagar.com

প্রকম্পিত করছে। অবিশ্বাসী আবাল-বৃদ্ধ বণিতা আরববাসীর মাথায় একই চিন্তা, মক্কা বিজয় করে মুহাম্মদ (দঃ) কি না প্রতিশোধ নেয়। দেখুন আল্লাহর বাণী কত সত্য–

"বরং আমি অসত্যের উপরই সত্যকে নিক্ষেপ করে যে উহার মস্তক ভঙ্গ করি। তৎপর উহা তখনি অন্তর্হিত হইয়া যায়।"

[কোরআন। সূরা আম্বিয়া। আয়াত ১৮]

ধর্মপ্রচারক মুহাম্মদ (দঃ)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রসুল মুহাম্মদের পক্ষ হতে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে।

"সত্যের অনুসরণকারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার কল্যাণ হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাকে আল্লাহ দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু আপনি যদি এতে অস্বীকৃত হন,–তাহলে আপনার প্রজা সাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হবেন।"

"হে গ্রন্থধারিগণ। এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি; আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করব না এবং আল্লাহর সাথে কাকেও অংশীদার করব না। যদি তারা এতে সম্মত না হয়, –তবে তোমরা তাদের বলে দাও যে,–আমরা মুসলমান, তোমরা এ কথার সাক্ষী থেকো।" [কোরআন-৩:৬৩–আল এমরান। আয়াত-৬৩]

মুহাম্মদ রসুল্লাহ
সিল মোহর

হোদায়বিয়ার সন্ধি শেষে রসুলুল্লাহর (দঃ) মন নিবিষ্ট হলো ধর্ম-প্রচারের দিকে। মহাসত্যের মহাবাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। অসত্যের মাথায় কুঠারাঘাত করে সত্যের পথ দেখাতে হবে। তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত রসুল, মানুষের নবী, সারা বিশ্ব-মখলুকাতের নবী। তিনি কোন সম্প্রদায়, কোন গোষ্ঠী বা সীমাবদ্ধ কোন দেশের জন্য প্রেরিত হন নি। একথাগুলোই যেন তাঁর মনে দোলা দিতে লাগল। তাই আর স্থির থাকতে পারলেন না। মহাবিজয়ের মহাসঙ্কেত তিনি পেয়েছেন-'ফাৎহাম -মুবিন'-(মহাবিজয়) বলে তাঁরই প্রভুর নিকট হতে।

এতদিন ইসলাম প্রচার করেছেন গোপনে, আপনজনের মাঝে। এবার প্রচার করবেন প্রকাশ্যে বিশ্বজুড়ে। প্রতাপশালী রাজা বাদশা, নরপতি ও সম্রাটদের রাজ্যে তাঁদেরই মাধ্যমে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। এর পরের স্থান ছিল চীন, পারস্য ও আফ্রিকার। এ সময় রোম ও পারস্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। রোমীয়গণ পারস্য দখল করে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটায়। একে প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য বলা হয়। পরে এর নামকরণ করা হয়-'বাইজানটাইন'। এই বাইজানটাইনের শাসনকর্তা ছিলেন হিরাক্লিয়াস। পারস্য সম্রাট-খসরুকে, হিরাক্লিয়াস পরাজিত করে তাঁর (খসরুর) অধিকৃত রাজ্যগুলো–মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন সমূহ উদ্ধার করেন।

www.pathagar.com

সম্রাট-হিরাক্লিয়াসের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে পারস্য-সম্রাট খসরুকে পরাজিত করতে পারলে এবং প্যালেস্টাইন হস্তগত করতে পারলে পবিত্র জেরুজালেমে পদব্রজে গিয়ে উপাসনা করবেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি যখন রওনা হয়েছেন তখনই পথিমধ্যে রসুলুল্লাহর (দঃ) পত্রবাহক দাহিয়া-কালবী' (দঃ) সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে পত্রখানা হস্তান্তর করেন। মতান্তরে বসরার খ্রীষ্টান শাসন কর্তা হারিসের মাধ্যমে এ পত্রখানা সম্রাটের হাতে অর্পন করা হয়। যাহোক সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত মুহাম্মদের (দঃ) এ পত্রখানা পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রতাপশালী সম্রাট হয়েও তিনি এ পত্রের মর্যাদা দিলেন। ক্রোধ, আক্রোশ বা হিংসার মনোভাবে জ্বললেন না। কিন্তু তাঁর সহচরগণ হযরত মুহাম্মদের নাম পত্রের শিরনাম দেখে সহ্য করতে পারল না। তাঁরা রাগে অভিমানে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। সম্রাটকে পরামর্শ দিল–"এই অজ্ঞাতনামা ভণ্ড কপটাচারীর উদ্ধত স্পর্ধা নিতান্তই অমার্জনীয়। তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হোক।"

সম্রাট হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও ধর্মপরায়ণ সম্রাট ছিলেন। তিনি বাইবেলে উদ্ধৃত বাণীটির কথা জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে এক ভাববাদী মহাপুরুষের জন্ম হবে। তাঁর হাতেই নিষ্কৃতি পাবে বিশ্বাসী মানবকুল। পবিত্র বাইবেলে পরিষ্কার ভাষায় কোরেশ বংশে জন্ম আরব দেশের এ মহামানব সম্বন্ধে এরূপ উদ্ধৃতি ছিলঃ-

"তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"[১]

"আর এমন ঘটিবার পূর্বে তোমাদিগকে বলিলাম যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের সহিত আর কথা বলিব না; **কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন।**"[২]

উপরে বর্ণিত কথাগুলো 'নতুন বাইবেল'-অর্থাৎ ইঞ্জিল শরীফে রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আগমনবাণী স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন এই বলে–'পিতা আমার নামে সেই সহায়, পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন।'

'জগতের অধিপতি আসিতেছেন।'

পুরাতন বাইবেল অর্থাৎ তৌরাতে হযরত মুসা (আঃ) হযরত মুহাম্মদের (দঃ) আগমণের বার্তা দিয়ে কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ

সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তিনি উহাদিগকে তাহাই বলিবেন। **আর তিনি আমার নামে যে সকল কথা বলিবেন তাহাতে যে কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।**"[১]

(এরূপ অসংখ বাণী আমি 'জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ)'-পুস্তকে উদ্ধৃতি দিয়েছি।)

জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সম্রাট-হিরাক্লিয়াস তাই সভাসদ্‌দের পরামর্শকে গ্রহণ করলেন না। বরং তাঁর বিজ্ঞ পারিষদদের নিয়ে এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেন। এ সভায় আরবে নিযুক্ত দূত ও জেরুজালেমে অবস্থিত মক্কাবাসীদেরও উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ অনুযায়ী সবাই উপস্থিত হলেন। সম্রাট মক্কাবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ-

---

টীকা ঃ ১ -২ বাইবেল-নিউ টেষ্টামেন্ট নতুন বাইবেল। যোহন পরিচ্ছেদ। জগৎ ও আত্মা শীর্ষক অধ্যায়।

১ । বাইবেল তওরাত অংশ। দ্বিতীয় বিবরণ।

www.pathagar.com

"মুহাম্মদের সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় তোমাদের মধ্যে কে আছে? আবু-সুফিয়ান উত্তর দিলঃ- "আমি আছি। মুহাম্মদ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।"

তখন সম্রাট আবু-সুফিয়ানকে নিকটে ডেকে অন্যান্য আরবদিগকে বলতে লাগলেনঃ-

"এই ব্যক্তিকে আমি কতকগুলো প্রশ্ন করব। সে যদি মিথ্যা উত্তর দেয় তা হলে তোমরা তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করো।"

আবু সুফিয়ান মহাসংকটে পড়ল। ভেবেছিল মুহাম্মদের (দঃ) এর নামে প্রাণভরে কুৎসা রটনা করবে। যাদুকর, পাগল ধর্মদ্রোহী বিভিন্ন খেতাব দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করার অনুরোধ করবে। মুহাম্মদকে (দঃ) শাস্তি দিয়ে চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কি বিপদ! কি সংকট! যদি মিথ্যা বলে আর আরববাসীরা এর প্রতিবাদ জানায় তাহলে তাকেই ত শাস্তি পেতে হবে। ফাঁসির কাষ্ঠে তাকেই ত ঝুলতে হবে। লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে তাকেই ত চিরবিদায় নিতে হবে। একি অদৃষ্টের খেলা। এ কোন গ্রহের ফের! আবু সুফিয়ান তার কুটনৈতিক চাল, বুদ্ধিবৃত্তি, বল-ভরসা, আশা-আকাঙ্খা সব হারিয়ে ফেলল। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ঐ সম্রাটের দিকে। দাঁড়িয়ে রইল তাঁর প্রশ্নের অপেক্ষায়। সম্রাট প্রশ্ন করলেনঃ- "যে ব্যক্তি নবী বলে দাবী করেছেন তাঁর বংশ কিরূপ?"

আবু সুফিয়ান উত্তর দিলঃ সম্ভ্রান্ত বংশ।

প্রশ্ন ঃ তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ কোনদিন রাজা ছিলেন কি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ কোন শ্রেণীর লোক তাঁর শিষ্য হচ্ছে?

উত্তর ঃ দরিদ্র শ্রেণীর লোক বেশি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করছে।

প্রশ্ন ঃ তাঁর শিষ্যসংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে, না কমছে?

উত্তর ঃ দিন দিন বাড়ছে।

প্রশ্ন ঃ এই ব্যক্তি কোন দিন মিথ্যা বলেছে কি?

উত্তর ঃ না, জীবনে কোন দিন তিনি মিথ্যা কথা বলেননি। শৈশব হতেই 'আল্-আমিন'-বলে খ্যাত।

প্রশ্ন ঃ কোনদিন তিনি কোন প্রতিজ্ঞা বা সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করেছেন কি?

উত্তর ঃ না, আজ পর্যন্ত তা দেখি নি।

প্রশ্ন ঃ তাঁর সঙ্গে তোমাদের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে কি?

উত্তর ঃ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কে জিতেছে?

উত্তর ঃ কোনটায় তিনি জিতেছেন, কোনটায় আমরা জিতেছি।

প্রশ্ন ঃ লোকটি কি শিক্ষা দিচ্ছেন?

উত্তর ঃ- তিনি বলেন ঃ এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। দেব-দেবী মিথ্যা। আরও বলেন-নামাজ পড়, সত্যকথা বল, সুপথে চল, সচ্চরিত্র হও, পরস্পর মারামারি করো না। মিলে মিশে থাক ইত্যাদি। সত্য আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে। লক্ষ মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না। হযরতের প্রধান শত্রুদের মধ্যে আবু সুফিয়ান দ্বিতীয়। হযরতের জীবন নাশের জন্য সদা সর্বদা যার হৃদয়ে ঝড় বয়, হযরতরে কুৎসা রটনায় যার আনন্দ, মুহাম্মদকে (দঃ) পাগল বলে ঘোষণা করা যার গর্ব কোরেশদের শত্রু বলে হযরতকে বধ করা যার নেশা, ধন-সম্পত্তি উজাড় করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্বভাব–সেই আজ তারই দেশ-বাসীর সম্মুখে কাঠগড়ায় হাজির। মুহাম্মদের (দঃ) সপক্ষে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সত্যবাদী, মিথ্যার মূল উৎপাটনকারী সহজ সরল পথের দিশারী, মানবের বন্ধু, ইহ পরকালের পথ প্রদর্শক বলে প্রমাণ করতে বাধ্য হলো। বিধির কি বিধান!

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ানের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে বিজ্ঞ সম্রাট ও সুবিচারক হিরাক্লিয়াস সমবেত আরববাসীদের সম্বোধন করে বললেনঃ-

"দেখ, এই ব্যক্তি যে সত্য সত্যই নবী এতে কোন সন্দেহ নেই। তোমাদের কথা হতে জানলাম–তিনি সৎ বংশজাত। নবীরা চিরদিনই সৎ বংশজাত হন। তোমরা বলেছ–তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কোন রাজা ছিলেন না। এখান থেকে বুঝতে পারছি পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য নবী সেজে তিনি কোন ছলনা করছেন না। তোমরা বলছ ঃ- দীন দরিদ্রেরাই বেশির ভাগ তাঁর শিষ্য হচ্ছে। যে কোন সত্য ধর্ম সম্বন্ধে চিরকাল তাই ঘটে আসছে। তোমরা বলছ ঃ- জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি বা কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নি। এটাই নবীর লক্ষণ। ভেবে দেখ যিনি মানুষ সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথা বলেন নি, আল্লাহ সম্বন্ধে কেন তিনি মিথ্যা কথা বলতে যাবেন? এছাড়া তিনি তোমাদের মহৎ উন্নত জীবন যাপন করার পরামর্শ দিচ্ছেন। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী পয়গম্বর –সারা ধরণী যার প্রতীক্ষা করছে। আমার সুযোগ শক্তি থাকলে আমি সেই মহাপুরুষের নিকট পৌঁছে তাঁর পদধৌত করে দিতাম।"[১]

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এ সিদ্ধান্ত যে কোন চিন্তাবিদ, জ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও বিচারকদের নিকট মূল্যবান দলিল হিসাবেই লিপিবদ্ধ থাকবে। মূল্য দেবে না তারাই যারা অন্য ধর্মের প্রতি আস্থাবান নয়-ধর্মের প্রতি বৈরী। নিজস্বার্থে পরের সর্বনাশে মন করে তৈরি।

হিরক্লিয়াসের কথায় ঐ স্বৈরাচারী ও হিংসুক কিছু খ্রীষ্টান পাদ্রী ও সভাসদ্‌দের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। বুদ্ধিমান সম্রাট রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে এর সমাধান করলেন। কিন্তু হৃদয়ের মাঝে মুহাম্মদকে (দঃ) শ্রেষ্ঠ নবীর আসনেই স্থান দিলেন–যা অন্য কেউ বুঝল না।

কোরেশদের অত্যাচারে যখন আরবের নবদীক্ষিত মুসলমান স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে প্রস্থান করে তখন তাদের মধ্যে একদল পরিবার পরিজন সহ বাইজানটাইনে গমন করে। এ সামাজ্যের অধিপতি হিরাক্লিয়াস তাদের আশ্রয় দেন। মানবতা ও মহানুভবতার এক দৃষ্টান্ত পরবর্তী শাসকদের জন্য রেখে যান।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর এ দুর্লভ পত্র-সংকলন-টি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত হলো। (প্রথম পত্র)

দুর্লভ পত্র–সংকলন [প্রথম পত্র]

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পত্র

অনুবাদঃ বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির রহিম। আল্লাহর বান্দা ও তার রসুল মুহম্মদের পক্ষ হতে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে। সত্যের অনুসরণকারীদের প্রতি সালাম! অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার কল্যান হবে, ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু আপনি যদি এতে অস্বীকৃত হন, তা হলে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হবেন। "হে গ্রন্থধারিগণ! এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি:

টীকা ঃ ১ । বিশ্বনবী-কৃত গোলাম মোস্তাফা পুস্তকের 'দিকে গেল আহ্বান'-পরিচ্ছেদ হতে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না এবং আল্লাহর সাথে কাকেও অংশীদার করব না। যদি তারা এতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাদের বলে দাও যে, আমরা মুসলমান তোমরা এ কথার সাক্ষী থেকো।" (মোহর) : মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ।

[হিরাক্লিয়াস প্রথমাবধি ইসলামের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কোরেশদের অত্যাচারে তাঁর রাজ্যেই বহু সংখ্যক মুসলমান হিজরত করে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই শাসনকর্তা ইসলামের প্রতি কিছুটা অনুদার হয়ে পড়েন।]

পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট পত্রঃ-

পারস্য সম্রাটের নিকট হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে পত্রটি প্রেরণ করে তার বাহক ছিলেন আবুদল্লাহ-বিন-হুযাফা (রাঃ) পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম'।

'(আল্লাহর নামে –যিনি অসীম করুণাময় ও দয়ালু) এই পত্রটি আল্লাহর রসুল মুহাম্মদের নিকট হইতে পারস্য অধিপতি খসরুর (পারস্য সম্রাটের উপাধি) প্রতি। যিনিই নির্ভুল হেদায়েতের নিকট নতি স্বীকার করেন, সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ এক এবং তাঁর সমতুল্য কেই নেই, এবং তাঁর কোন অংশীদারও নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে বাদশা, আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই। কেননা আল্লাহ আমাকে তাঁর রসুল হিসাবে সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আমি সকল অবিশ্বাসীর জন্য আমার বাণীকে পূর্ণ -করতে পারি। ইসলাম গ্রহণ করুন এবং সমুদয় বিপর্যয় হতে নিজকে রক্ষা করুন। যদি আপনি ইহা অস্বীকার করেন তবে আপনার সকল প্রজার অস্বীকৃতির পাপও আপনার উপর বর্তাবে।"[১]

আবদুল্লাহ-বিন-হুযাফা বর্ণনা করেন যে-যখন তিনি খসরুর দরবারে পৌঁছলেন তখন তিনি বাদশার সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি বাদশাকে পত্রটি দিলেন। বাদশা একজন অনুবাদককে পত্রটি পড়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু শুনে বাদশা খসরু চরম রাগান্বিত হলেন এবং পত্রটি হাতে নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ)-তাদের মুখে একথা শুনে 'খসরুর' মত রাগান্বিত হলেন না। দম্ভোক্তি করে তাঁদের গ্রেফতার করে নিহত করার আদেশ দিলেন না। বরং ধীরচিত্তে বললেন–পরদিন তাদের দেখা করতে। কি মহান! কি ধৈর্যশীল! তিনিই তো মানুষের নবী। সারা বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শক, হিতাকাঙ্খী। সহৃদয়বান বন্ধু। আল্লাহর প্রিয়তম রসুল। তাই তিনি আল্লাহর নিকট রাত্রিতে মোনাজাত করলেন। তাঁর নির্দেশ চাইলেন। আল্লাহ্ জিবরাইল মারফৎ জানালেন–

"আমি তার নিজের পুত্রকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি এবং এই পুত্র তার পিতাকে এ বছরই ১০ই জামাদিউল আউয়াল রোজ সোমবার হত্যা করবে।"

কারো মতে ইলহামটি ছিল নিম্নরূপঃ-

"পুত্রটি তার পিতাকে হত্যা করেছে।"[১]

পরদিন সকালে রসুলুল্লাহ (দঃ)-ইয়েমেন হতে আগত ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে তাঁর নিকট আল্লাহ হতে অবতীর্ণ এ বাণীটি জানালেন এবং বলে দিলেন বাদশা খসরু ঐ দিন তাঁর নিজ

টীকা ঃ ১ । মীর্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহম্মদ কৃত- Introduction to the study of the Holy Quran.

টীকা ঃ ১ । পূর্বে বর্ণিত Introduction to the study of the Holy Quran অনুবাদক মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহম্মদ।

www.pathagar.com

পুত্রের হাতে নিহত হবেন। দূত মারফৎ এ কথাটি একটি পত্রে ইয়েমেনের শাসনর্তাকেও জানিয়ে দিলেন। তিনি পত্রখানা পড়ে বললেনঃ-

"এই ব্যক্তি যদি সত্যই রসুল হয়ে থাকেন—তবে তিনি যা বলেছেন তাই হবে।"

কিছুক্ষণ পরেই পারস্য সম্রাটের একটি পত্র ইয়েমেনের গভর্ণরের হাতে পৌঁছল। এতে দেখা গেল যে পত্রটির উপর যে মোহর দেওয়া আছে তা নতুন। অর্থাৎ পারস্যের নতুন গভর্ণরের সিল ও স্বাক্ষর। তাঁর তখন বুঝতে বাকি রইল না সে রসুলের (দঃ) পত্রে যা বলা হয়েছে—তা সত্য। তিনিই আল্লাহর নবী—হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি তৎক্ষণাৎ পত্রটি খুল্‌লেন। দেখলেন, এতে লেখা আছেঃ-

খসরু সম্রাট **'সিরোস'**–এর নিকট হতে ইয়েমেনের গভর্ণর 'বাযানের' প্রতি। আমি আমার পিতাকে হত্যা করেছি কেননা তাঁর শাসন অন্যায় ও দুর্নীতি এবং অন্যায়ে পরিণত হয়েছিল। হুযাফা (রাঃ) পারস্য হতে ফিরে এসে এ কথা রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ-

"খসরু আমাদের পত্রকে যা করলেন– আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকেও সেরূপ করবেন।" (অর্থাৎ অচিরেই তার সাম্রাজ্যকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেলবেন)।

বাদশা খসরুর এরূপ আচরণের মূল কারণ ছিল হজরতের প্রতি ইহুদিদের জঘন্যতম প্রচার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ। এই ইহুদীরা রোমানদের বিরুদ্ধে এরূপ প্রচার করে পারস্যের রাজ দরবারে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে যা কিছু এরা বলত বাদশা অকপটচিত্তে তা বিশ্বাস করতেন। সত্য বলে ধারণা করতেন। এই ইহুদীরা বাদশাকে এমন ধারণা দিয়েছিল যে মুহাম্মদ (দঃ) পারস্য দখল করে ক্ষমতার অধিকারী হতে চান। এরূপ একটি চক্রান্ত চল্‌ছে। অল্পদিনেই তা বাস্তবে পরিণত হবে। তাই বাদশা খসরু তাঁর অধীনস্থ ইয়েমেনের গভর্ণরকে এই বলে একটি চিঠি লিখে পাঠান যে আরবের কোরেশ বংশীয়, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল বলে দাবী করছে এবং সব শাসকদের ভয় দেখাচ্ছে অতি শীঘ্র দু-জন লোক পাঠিয়ে এ কোরেশ বংশীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার ক'রে তাঁর দরবারে পৌঁছে দেওয়া হোক। ইয়েমেনের বাদশা এ আদেশ পেয়ে তাঁর প্রধান সেনাপতিকে অশ্বারোহী আর একজন সৈন্যসহ হযরতকে গ্রেফতার করতে পাঠালেন। হযরতকে (দঃ) সম্বোধন করে একটি পত্রও তৎসঙ্গে দিলেন। এ পত্রে তাঁকে সৈন্যদের সঙ্গে পারস্য গমন করার নির্দেশ ছিল।

সৈন্যদ্বয় মক্কার পথে রওনা হয়েছিলেন। তায়েফে এসে জানতে পারলেন যে হযরত (সঃ) মদিনায় রয়েছেন। তখন তারা মদিনায় এসে রসুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, ইয়েমনের গভর্নর 'বাযান' কর্তৃক তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। তাঁকে (রসুলুল্লাকে দঃ) গ্রেপ্তার করে পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট হস্তান্তর করার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা (সৈন্যদ্বয়) উপস্থিত হয়েছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেন এ আদেশ মেনে নেন এবং তাঁদের সঙ্গে পারস্য যেতে সম্মত হন। রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন এবং প্রজাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন। এই পত্র পাওয়া মাত্র আপনার সকল কর্মচারীদের ডেকে আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার নির্দেশ দেবেন। একজন আরব নবীকে গ্রেফতারের বিষয়ে আমার পিতার আদেশ প্রসঙ্গে জানচ্ছি যে ঐ সকল আদেশকে আপনি বাতিল বলে গণ্য কবেন।"

[তাবারী–৩য় খণ্ড পৃঃ নং ১৫৭২-৭৪ এবং হিশাম-পৃঃ নং ৬৪]

রসুলুল্লাহর (দঃ) -এ পত্রপাঠ করে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন এবং নিজকে ধন্য মনে করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং তাঁর অনুগত প্রজাদের নির্দেশ দিলেন। রসুলুল্লহকে (দঃ) পত্রে একথা জানিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর রসুল মুহাম্মদের নিকট হইতে

আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী সমীপে ঃ- "যাহারা আল্লাহর বিধান মানে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে সালাম। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার কল্যাণ হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু আপনি যদি এতে অস্বীকৃত হন, তাহলে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হবেন।"

এরপর পূর্বে বর্ণিত কোরআনের বাণী (৩ ঃ ৬৩ আল এমরান। আয়াত -৬৩)

=মুহাম্মদ -রসুলুল্লাহ

সিল মোহর

এ পত্রটির বাহক ছিলেন হযরত আমর-বিন-উমাইয়া। তিনি পত্রখানি সম্রাট নাজ্জাশীর হাতে তুলে দিলে তিনি পত্রখানি হাতে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং রসুলুল্লাহর (দঃ) সম্মানার্থে নিজ সিংহাসন হতে নেমে নিচে বসলেন।

হযরত এ ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের আচার-আচরণ ও সহৃদয়তার কথা পূর্ব হতেই জানতেন। সম্রাটও হযরতের অপূর্ব চরিত্র মানবদরদী, বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও সঠিক পথ-প্রদর্শক বলে জানতেন। তাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করতেন। এ জন্যই পত্রবাহক ও পত্রপ্রেরকের প্রতি এত সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়েছেন।

দিকে দিকে যখন ইসলামের অমিয়বাণী ছড়িয়ে পড়ল, মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন অত্যাচারী কোরেশদের বুকে আগুন জ্বলতে লাগল। নানাভাবে নব কৌশলে নব-দীক্ষিত মুসলিম নর-নারীর প্রাণে আঘাত হানতে লাগল। হযরত এ সংবাদ পেয়ে ব্যথিত হলেন। তিনি তাদের প্রাণ রক্ষা করতে খ্রীষ্টান রাজ্য আবিসিনিয়ার (হাবশায়) গমন করার অনুমতি দিলেন। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে হাবশার সম্রাট নাজ্জাশী তাদের প্রতি অত্যাচার করবেন না। বরং উদারতার মনোভাবেই অত্যাচারিত মুসলমানদের তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেবেন। রসুলের (দঃ) এ চিন্তাধারাটি সঠিক এবং সত্যে পরিণত হয়েছিল।

হযরতের (দঃ) নির্দেশ পেয়ে হিজরীর পঞ্চম সালে ৮৫ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলা হাবশা অর্থাৎ আবিসিনিয়ার দিকে রওনা হয়। এদের মধ্যে হযরত ওসমান (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী রোকেয়াও (রাঃ) ছিলেন। পিশাচ কাফেররা এ সংবাদ পেয়ে সহ্য করতে পারল না। তারা পরামর্শ করে সুচতুর নেতা আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ-বিন-রাবিয়াকে প্রচুর উপঢৌকন সহ সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল। দূত সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে উপঢৌকন সমূহ প্রদান করল। এরপর অনুরোধ জানালো এ সব মুসলমানদের তার হাতে ন্যস্ত করতে। কেননা তারা ধর্মচ্যুত ও বিবাদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী। তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনে সম্রাটকে বুঝাতে চেষ্টা করল। সম্রাট বললেন-'এদের সম্বন্ধে সঠিক তত্ত্ব অবগত না হয়ে আমি তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি না।'

এরপর সুবিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ সম্রাট তাঁর রাজদরবারে মুসলিম দলপতিকে ডাকলেন। মুসলমানদের পক্ষ হতে দলপতি হিসাবে হযতর আলীর (রাঃ) ভাই হযরত জাফর-বিন-আবু তালিব (রাঃ) উপস্থিত হলেন এবং কাফেরদের নির্যাতনের কাহিনী ধারবাহিক রূপে বর্ণনা করলেন। আরও বললেনঃ-

www.pathagar.com

মহামান্য সম্রাট! আমরা অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। আসল সৃষ্টিকর্তাকে জানতাম না। নকল-সৃষ্টিকর্তা দেব-দেবীর পূজা করতাম। মৃত-জন্তুর মাংস ভক্ষণ করতাম অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকতাম। খুন খারাবী করে শত্রুতার সৃষ্টি করতাম। নিজ স্বার্থ উদ্ধারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন-করতাম। হিংসা বিদ্বেষে জ্বলে-পুড়ে মরতাম। এমনি সময়ে আমাদের মাঝে এলেন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি আমাদের স্বজন-নিকট আত্মীয়। আমরা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে জানি। তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। কারো সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেন না। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এই বলেঃ-

"তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর সঙ্গে কাউকেই অংশীদার করো না। তাঁরই এবাদত কর। প্রতিমা পূজা করো না। সদা সত্য কথা বলো। মিথ্যা বলো না। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করো না। এতিমের সম্পত্তি দখল করো না। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত আদয় কর।"

'আমরা তাঁর এসব কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। মুসলমান হয়েছি। মুহাম্মদকে (দঃ) আল্লাহর রসুল বলে স্বীকার করেছি। এ অপরাধেই আমরা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও দেশত্যাগী। এ স্বৈরাচারী পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে আমাদের তুলে দিলে আমাদের জীবনে কি ঘটবে ভেবে দেখুন সম্মানিত সম্রাট। আপনিই ভেবে দেখুন। এরপর কোরআন হতে সূরা মরিয়মের কিছু আয়াত পড়ে রাজদরবারের সবাইকে শুনালেন।

মহাসত্যের এ মহাবাণী সবার হৃদয় স্পর্শ করল। কান্নায় সবার হৃদয় জুড়িয়ে গেল। ধর্মপ্রাণ সম্রাট স্থির থাকতে পারলেন না। চেখের জলে ভেসে গেল তাঁর চোখ-মুখ-বুক। হৃদয়ের নিভৃত কোন্ থেকে বেরিয়ে এলো আপনা আপনি–

"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ"।

কোরেশ দলপতির দূরভিসন্ধি সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হলো। সম্রাট মুসলমানদের তাঁর দেশে নিরাপদে অবস্থানের অনুমতি দিয়ে বললেনঃ-

"কোরেশদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও তোমাদের উপর কোন প্রকার নির্যাতন করতে আমি দেব না।"

কোরেশ দলপতি আমরের কোন যুক্তিই সম্রাট মান্‌লেন না। তিনি আরবদের উপঢৌকন ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। কোরেশ প্রতিনিধিদের অপমান করে তাঁর দেশ হতে বের করে দিলেন।

হযরতের মদিনা প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় মান সম্মান নিয়ে সম্পূর্ণই নিরাপদ ছিল। এরপর তারা যখন মদিনায় গমন করে তখন সম্রাট তাদের সর্বপ্রকার সুবিধে দিয়ে একখানি জাহাজ যোগে হাবশা থেক পাঠিয়ে দিন। রসুলের (দঃ) দ্বিতীয় পত্রের মর্যাদা রক্ষার্থেই এ ব্যবস্থা হয়েছিল। মানবতা, উদারতা ও রসুলের (দঃ) প্রতি শ্রদ্ধার ইতিহাস ইতিপূর্বে একমাত্র সম্রাট হিরাক্লিয়াসই দেখিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য আমরা দোয়া করি। হযরত জাফর-এর নেতৃত্বে মোজাহিরগণ নিরাপদে মদিনা এসে পৌছিলেন। ঐদিন ছিল খাইবার বিজয়ের দিন। আনন্দ উল্লেসে ভরপুর মদিনাবাসীদের মন। ঠিক এমনি সময়ে হাবশা

www.pathagar.com

থেকে মুসলমানদের মদিনা পৌছার সংবাদে মদিনার মুসলমানদের প্রাণে এলো নূতন জোয়ার। রসুলুল্লার নিকট সমস্ত ঘটনা যখন তারা প্রকাশ করল তখন তিনিও অত্যন্ত খুশি হলেন। সম্রাট নাজ্জাশী পত্রে জানিয়েছেন যে–তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও দেখা করতে পারছেন না। বিনয়ের সঙ্গে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর এ পত্র পাঠ করে সবাইকে নিয়ে তাঁর জন্য প্রাণঢেলে দোয়া করলেন। উপস্থিত জনতা এ প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে আনন্দে–আমিন আমিন বললেন।

কথিত আছে নাজ্জশীর মৃত্যু সংবাদ শুনে রসুল (দঃ)-তাঁর জন্য গায়েবী জানাজাও পড়েছেন।

এখানে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যে জাহাজে আবিসিনিয়ার মুসলমানগণ মদিনায় আসলেন ঐ জাহাজেই ছিলেন উম্মে-হাবিবা, আবু সুফিয়ানের কন্যা। উম্মে-হাবিবা তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ সহ মক্কা হতে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। ফলে উম্মে হাবিবা চরম অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করতে থাকেন। হযরত তাঁর এ দুরাবস্থা দেখে মর্মাহত হন। তাঁরই নিকট আত্মীয়ার এ দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তাঁকে বিবাহ করলেন। যে আবু-সুফিয়ান হযরতের চরম শত্রু পরম বৈরী তাঁরই কন্যাকে বুকে স্থান দিলেন মুহাম্মদ (দঃ)। কত মায়া কত উদারতা। শত্রুও তাঁর আপন। মক্কাবাসী কোরেশগণও তাঁর স্বজন। কেউ তাঁর পর নয়। সবাই আদম সন্তান। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টজীব। ধর্মের খাতিরে শত্রু। মানবতার খাতিরে মিত্র।

এ সংবাদে আবু-সুফিয়ানের মন গলে গেল। মাথায় একটি কথাই দোলা দিতে লাগল–'কেন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে এত অভিযান–এত হিংসা। সেত কারো অন্যায় করে নি। সে যদি আমাদের শত্রু মনে করত তা হলে আমার কন্যাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে খতম করত।'

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নের জবানবন্দীতে যেমন তাঁর হৃদয় থেকে মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে সত্যকথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল তাঁর কন্যার আশ্রয়দানের কথা শুনেও তেমনি সৎচিন্তায় মন ভরে উঠেছিল। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে-কলেমা শাহাদত পড়ে মুসলমান হতে বাধ্য হলো। কি লীলা! প্রেমে কি না হয়। ভক্তিতে কি না মেলে! ভালবাসায় কি না পাওয়া যায়।

ইসলাম প্রচারে যে পর্বত সম বাধা ছিল তা অনেক অংশে দূরীভূত হলো। সাম্যের গান গেয়ে ধর্মের পতাকা উড়তে লাগল। দিকে দিকে এর জয়গানে ধরা মুখোরিত হলো। সত্য তার আপন গতিতেই পথ ধরল। বাধা বিপদ অতিক্রম করে ঘোষণা দিল 'মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নবী, মানুষের নবী এ বিশ্বের নবী। ইহকালের বন্ধু। পরকালের বন্ধু। মানবের হিত-কামনাকারী। দু-জাহানের মুক্তির দিশারী।'

www.pathagar.com

মিশরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিসের নিকট পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর বান্দা ও রসুল মুহাম্মদের তরফ থেকে কিবুতি প্রধান মুকাউকিসের কাছেঃ-

"হিদায়তের অনুগামীকে সালাম জানাই; অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুণ নিরাপত্তা লাভ করবেন; আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন কিবুতিদের পাপের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে।" "হে গ্রন্থধারীগণ এসো আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি; আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করব না; এবং আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার করব না। যদি তারা এতে সম্মত না হয় তবে তোমরা তাদের বলে দাও যে আমরা মুসলমান, তোমরা এ কথার সাক্ষী থাকো।" (৩ ঃ ৬৩)

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ
সিল মোহর

দুর্লভ পত্র-সংকলন

মিশরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিসের
কাছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর পত্র[১]

অনুবাদঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর বান্দা এবং রসুল মুহাম্মদের তরফ থেকে কিবুতি প্রধান মুকাউকিসের কাছে–

হিদায়তের অনুগামীকে সালাম জানাই; অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপত্তা লাভ করবেন; আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন কিবুতিদের পাপের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে। "হে গ্রন্থধারিগণ! এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি; আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না এবং আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার করব না। যদি তারা এতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাদের বলে দাও যে আমরা মুসলমান, তোমরা এ কথার সাক্ষী থাকো।"

---

১. হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিরক্ষর ছিলেন। নিজে লিখতে জানতেন না। পত্র দু'টি সম্ভবতঃ অন্য কেউ লিখে দিয়েছেন, নিচের সিলমোহর রসুলুল্লাহর।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ

সিল (মোহর)

[এই পত্র পেয়ে মুকাউকিস প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলেও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এই উপহারগুলির মধ্যে বিখ্যাত অশ্ব দুলদুল ছিল]

এ পত্রখানার বাহক ছিলেন হযরত হাতিম-বিন-বুলতায়া (রাঃ)। তিনি পত্রখানা সম্রাটের নিকট পৌঁছালে সানন্দে তা গ্রহণ করেন এবং দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তিনি হযরতরে প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে পত্রের উত্তর দেন। প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ না করলেও অন্তর থেকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বিশ্বাস করেছেন মুহাম্মদ (দঃ)-কে আল্লাহর প্রেরিত নবী বলে। সত্যের বাহক বলে। তাই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ও সম্মান প্রদর্শন করতে উপঢৌকন পাঠালেন অপরূপ সুন্দরী সম্ভ্রান্ত বংশীয় দু খ্রীষ্টান মহিলা–**'মেরী ও শিরী'**। এইসঙ্গে দূতের সঙ্গে পাঠালেন সুদৃশ্য সাদা রং এর একটি অশ্ব যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রসুল (দঃ) এ নাম রাখলেন **'দুলদুল'**। এ অশ্বই তিনি ব্যবহার করেছেন উপহার প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে। আর **'মেরীকে'**–বিবাহ করে সাদরে গ্রহণ করলেন আপন-স্ত্রীরূপে। **'শিরীকে'**– দিলেন তাঁর প্রিয় সহচর কবি হাসানকে। তিনিও তাকে বিবাহ করলেন।

'মেরী ও শিরীকে'–গ্রহণে হযরত যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা ঐতিহাসিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এর মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি ইতিপূর্বে বিবাহ করে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন ইসলামকে সুদৃঢ় করতে। এর মূল ভিত্তি রচিত করতে। বাকি ছিল শুধু খ্রীষ্টান জাতির সঙ্গে মিলনের সম্বন্ধ স্থাপন করতে। মেরীকে বিবাহ করে তা সম্পন্ন হলো। ঐতিহাসিকগণ ও সহচরগণ সাক্ষি দিয়েছেন যে এ বিবাহের পরে হাজার হাজার খ্রীষ্টান হজরত মুহাম্মদের (দঃ) উদারতা ও অহিংসার চরিত্র দেখে ইসলাম ধর্মে-দীক্ষিত হয়েছে। আমার রচিত 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)'-এর দ্বিতীয় খরের বিবাহ পরিচ্ছেদে এরই উপর আলোচনা করেছি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি এ সব বিবাহের মূলে কি রহস্য নিহিত ছিল যৌবনের তাড়না, না ইসলাম প্রচারের গভীর উদ্দেশ্য?

আম্মানের শাসনকর্তা জিফর ও আবেদের নিকট পত্র ঃ

একই প্রকার বিনয় ও সৌজন্যের ভাষাতেই এ পত্র প্রেরিত হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পক্ষ হতে এ দু-শাসনকর্তার নিকট। পত্র পাঠ করে তারা মুগ্ধ হন এবং বিশ্বাস করতে বাধ্য হন–মুহাম্মদ (দঃ) স্বার্থের লোভে নন সত্য-ধর্ম প্রচারই তাঁর উদ্দেশ্য। বাইবেলের তৌরাত ও ইঞ্জিলে তাঁর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। তাই তাঁরা তাঁকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হযরতের অনুসারী হন। এ পত্রের বাহক ছিলেন হযরত আমর-বিন-আস (রাঃ)। তিনি সুসংবাদ নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে এবং হযরতকে (দঃ) অভিহিত করেন।

www.pathagar.com

বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট পত্র ঃ

এ পত্রের বাহক ছিলেন মুনজির-বিন-আদি। শাসনকর্তার প্রতি পত্রের একই আহ্বান ছিল সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা মুহাম্মদকে (দঃ) নবী হিসাবে বিশ্বাস করতে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। মূর্তিপূজার অসারতা হতে নিজকে দূরে রাখতে। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে।

বাহারাইনের সম্রাট হযরতের পত্রখানা সাদরে গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

ইয়েমেন এর শাসনকর্তার নিকট পত্র ঃ

হুজা-বিন-আলি (রাঃ)। দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

দামেস্কের সম্রাট গাচ্ছানীর নিকট পত্র ঃ

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পত্র পেয়েও তিনি নিজে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলেই জানা যায়।

দ্বিতীয় নাজ্জাশীর নিকট পত্র ঃ

সম্রাট মুনজিরের নিকট দ্বিতীয় পত্র ঃ

এ দুই সম্রাট ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিনা জানা যায় নি।

যা হোক উপযুক্ত বর্ণনা হতে দেখা যায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) – শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন না আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। দিকে দিকে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই এ বাণী পৃথিবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ মহাদেশ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মহানবীর (দঃ) ডাকে সাড়া দেয়। নকল ধর্মের অসারতা বুঝতে পেরে সত্য ধর্ম ইসলামে আকৃষ্ট হয়।

রসুল (দঃ) বলেছেনঃ- "পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা থাকিবে না যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছিবে না।" এ মহাবাণী আজ সত্যের রূপ নিয়ে সারা বিশ্বে এক নব জাগরণ আনছে। ইতিহাস এর প্রমাণ।

মক্কা বিজয়

"অমস্বন্তা সতপতি মার্মহে মে গাব চেতিষ্ঠে অসূরো সঘীনঃ। ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানরঃ ত্রয়ংরুনাশ্চিকেত।"। (ঋগ্বেদ–৫/২৭/১)–

অর্থঃ

"সারথী, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, অতি বুদ্ধিমান, শক্তিমান, দয়ালু মামহ (প্রশংসিত জন–মুহাম্মদ)–তাঁহার বাণী দ্বারা আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। সর্বশক্তিমানের (আল্লাহর) দাস, সর্বগুণসম্পন্ন, বিশ্বের শান্তিবাহক দশ সহস্র সহচর সহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।"

সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বের এক ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হয়েছে 'মামহ' অর্থা মুহাম্মদ (দঃ) দশ হাজার সহচর সহ শত্রুকে পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ব্যতীত বিশ্ব ইতিহাসে এরূপ আর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? কত সম্রাট, কত বাদশা, কত নবী তাঁদের জীবনে যুদ্ধ করেছেন। শত্রুকে নিপাত করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

সিংহাসন অটুট রেখেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক **'দশ হাজার'** একান্ত আপন ও বিশ্বাসী সহচর নিয়ে কে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করে শত্রুর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন? দ্বিতীয়তঃ–উপর্যুক্ত গুণ সমূহে (সারথী, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়.....) বিভোষিত হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে যুগ যুগ ধরে অলংকৃত করেছেন কে? চলুন, আমরা এ ঘটনার বাস্তব ইতিহাস দেখি। হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের প্রতিটি চুক্তির নং বিশদ ভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে। সেখানে ৫ নং চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় অবিশ্বাসী আরববাসী ও হযরতের অনুসারী, আরবে অবস্থিত **'বনি-খোজা'** সম্প্রদায়ের কিরূপ দুর্দশা হয়েছিল,–'বনি-বকর' গোত্রের নৃশংসতা, পাশবিকতা, বর্বরতা ও হিংস্রতার ফলে সেটারও বর্ণনা দিয়েছি। পবিত্র কাবা-ঘরে আশ্রয় নিয়েও তারা রক্ষা পায় নি। কাফের **'নওফেল'**-এর আদেশে নৃশংসভাবে হত ও অত্যাচারিত হয়েছে। এ সংবাদ শ্রবণে দয়ালু মুহাম্মদ–(যা উপরে বর্ণিত দয়ালু মামহ) সহ্য করতে পারলেন না। চুক্তির শর্তে যে কোন দল হযরতের সঙ্গে অথবা কোরেশদের সঙ্গে মিশতে পারবে। এ শর্ত এ বেইমানের দল মানল না। মদিনায় পালিয়ে আসা বনি খোজার কিছু লোক হযরতের নিকট সব ঘটনা জানালে অসহ্য জ্বালায় তার হৃদয় দগ্ধীভূত হলো। সহচরদের প্রাণে আগুন লাগল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সহ্যশক্তির সীমা অতিক্রম করল। প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিটি মুসলিম তৈরি হলো।

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে ব্যথিত হয়েও সাহাবাবৃন্দের ব্যথা অনুভব করেও প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন না। সন্ধির শর্ত ভেঙ্গেও আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করলেন না। সহনশীলতা ও দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়ে কোরেশদের প্রতি তিনটি প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন।

(১) যুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিহত বনি-খোজা-সম্প্রদায়কে রক্তপণ দেওয়া।

(২) বনি বকর গোত্রকে সাহায্য করতে বিরত থাকা।

(৩) অথবা হোদায়বিয়ার সন্ধি নাকোচ করা।

'বনি-বকর গোত্রের প্রতি কোরেশদের ইতিমধ্যেই বিরূপভাব এসেছে। কেননা তারা এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে আরববাসীদের অতিষ্ট করে তুলেছে। কাবা ঘরের ভিতর বনি-খোজাদের হত্যা করে বাপ-দাদার ঐতিহ্যকে বিনাশ করেছে। কোরেশ গোত্রের দলপতিরা একসঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল ৩নং শর্ত গ্রহণ করতে। অর্থাৎ–হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল। দূত মারফৎ হযরত এ সংবাদ পেলে আনন্দিত হলেন। কেননা প্রতিশোধ নেবার জন্য কোরেশদের প্রতি আর কোন বাধা থাকল না। কেমন দূরদর্শী! কেমন নীতিবান! কেমন রাজনীতিবিদ! চলুন, দেখি এ দূরদর্শীতার ফলাফল কি? জয় না পরাজয়?

হযরত (দঃ) সহচরদের ডেকে যুদ্ধের সাজে সবাইকে তৈরি হতে বললেন। এ আদেশে আবাল-বৃদ্ধ নরনারী উল্লাসে ফেটে পড়ল। আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলতে পারবে। ঘর-বাড়িতে আবার তারা ফিরে যাবে। শত্রুকে পরাজিত করে জয়ের নিশান তুলবে। পবিত্র কাবা তওয়াফ করবে–এ আশায় তাদের হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠল। শিরায় উপশিরায় আনন্দের জোয়ার ঢেউ খেল্‌তে লাগল। যুদ্ধের জন্য সবাই তৈরি হলো।

ধুরন্ধর আবু-সুফিয়ান এ সংবাদ পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল করে তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনল। তাই কালবিলম্ব না করে ছুটল মদিনায়। সেখানে গিয়ে নতি স্বীকার করে হযরতকে বললেন–"আমরা বনি খোজা গোত্রের রক্তপন দিতে রাজী। কিন্তু সন্ধিপত্র বাতিল করতে রাজী না।"

www.pathagar.com

রসুলুল্লাহ (দঃ)–বললেন, "তোমরা আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কেন এতদিন বনি-খোজাদের রক্তপণ দাও নি? যদি দিতে তাহলে বুঝতাম তোমরা শান্তি স্থাপনে আগ্রহী। তোমাদের মিথ্যা আশ্বাস আমি মেনে নিতে পারি না।"[১]

আবু-সুফিয়ান হযরতের এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। নিরুৎসাহ হয়ে মক্কার পথ ধরল। যাবার সময় মদিনার মসজিদ প্রাঙ্গনে সবার সম্মুখে বলল-"আমি হোদায়বিয়ার সন্ধিকে পুনরায় বলবৎ করে গেলাম।"[২]

আবু-সুফিয়ানের এ মিথ্যা প্রচারণা বুঝতে কারোই বাকি রইল না। হযরতের মনেও এর বিন্দুমাত্র দাগ কাটল না। মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্তই বলবৎ রইল। সংগোপনে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম তৈরি হলো। সৈন্য সামন্তের দল প্রস্তুত হলো। যুদ্ধের এ সংবাদ মক্কার কোরেশগণ যেন জানতে না পারে তার জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারিত হলো। মদিনার চারপাশে পাহারার ব্যবস্থা হলো যেন কোন লোক মদিনা হতে মক্কায় যেতে না পারে।

হযরতের অতর্কিতে মক্কা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যটি ছিল অতি মহৎ। তিনি ভেবেছিলেন যে, কোরেশগণ এ যুদ্ধের সংবাদ পেলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। বিপুল সাজসরঞ্জাম ও কোরেশ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ফলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। অগণিত মানুষ প্রাণ হারাবে। এটা তিনি দেখতে চান না। বিনা রক্তপাতে কোরেশদের বশে আনতে চান। প্রেম, দয়া, মায়া ও সত্যের বাণী দিয়ে বিজয় আনতে চান। মক্কা দখল করে বিজয় গৌরবে মুকুট পরিধান করতে চান না। কি মহৎ! কি দয়ালু! এজন্যই আল্লাহর পবিত্র বাণীতে বলা হয়েছে—

"ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রহমতুল্লিল আলামিন।" অর্থাৎ–"এবং তোমাকে বিশ্বজগতের করুণা-ব্যতীত প্রেরণ করা হয় নি।" ঋগ্বেদেও–তাঁকে আল্লাহর দাস, সর্বগুণসম্পন্ন; বিশ্বের শানিত বাহক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বিশ্বের মানব সম্প্রদায় লক্ষ্য করুন মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন কি না। মানব দরদী ও শান্তিবাহক হিসাবে তাঁর পরিচয় বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে পেরেছেন কি না। অষ্টম হিজরী। ১০ই রমজান। হযরত (দঃ) তাঁর একান্ত বিশ্বাসী ও অনুগত দশ হাজার–বীর যোদ্ধা নিয়ে মদিনা হতে যাত্রা করলেন। মক্কার অদূরে সন্ধ্যার পূর্বে মার উজ জহরান নামক এক গিরী উপত্যকায় ঘাঁটি স্থাপন করলেন। খাদ্য প্রস্তুতির জন্য যখন পর্বত শীর্ষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো তখন অগ্নিশিখার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে ও আতঙ্কে কোরেশদের হৃদয় কেঁপে উঠল। তাদের বুঝতে বাকি রইল না মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে মক্কা আক্রমণ করতে আসছেন। কি বিপদ! এখন তারা কি করবে? আরব নেতারা স্তম্ভিত। আবু-সুফিয়ান হতভম্ব। স্থির হলো আবু-সুফিয়ানের সঙ্গে বুদায়েল ও হাকিম ইবনে নিজাম গোপনে পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে এবং তত্ত্ব সংগ্রহ করে কোরেশ নেতাদের জানাবে। এর পর তারা প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধ করবে। মুহাম্মদের (দঃ) বাহিনীকে প্রতিহত করবে। কি দুঃস্বপ্ন! কি দুরাদৃষ্ট! গুপ্তচরগণ উপত্যাকায় পৌঁছার পূর্বেই গোপনে রক্ষিত ওমরের (রাঃ) ছদ্মবেশী সৈন্যেরা এদের বন্দী করল। অহঙ্কারী, দাম্ভিক, রসুলের (দঃ) প্রধান শত্রু আবু-সুফিয়ানও তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। তিনজনকে হাত কড়া দিয়ে হাজির করা হলো রসুলুল্লার (দঃ) সম্মুখে। সহচরগণের কি আনন্দ! পাপিষ্ঠ আবু-সুফিয়ান আজ ধৃত! সুদীর্ঘ একুশটি বছর ধরে যে শত্রু মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়েছিল, দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল–হত্যা যজ্ঞ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল,

www.pathagar.com

মুহাম্মদকে (দঃ) চিরতরে পৃথিবী হতে মুছে দিয়ে গৌরব অর্জন করার ফন্দি এটেছিল–'হাবল দেবতার'–জয়গানে ওহদ যুদ্ধের ময়দান কাঁপিয়ে তুলেছিল,-সে আজ শক্তিহীন, অসহায় বন্দী। বাক্‌শক্তি নেই। যুদ্ধে জয়লাভ করার আশা নেই। চোখে-মুখে আলোর দৃপ্তি নেই। লজ্জা-অপমান, ভয়-ভীতিতে শরীর আজ অবসন্ন।

মুহাম্মদ (দঃ) আবু-সুফিয়ানের এ অবস্থা দেখে উল্লসিত হলেন না। প্রকাশ্যে গুলি করে বা ফাঁসী কাষ্ঠে দিয়ে হত্যা করার নির্দেশও দিলেন না। অত্যাচার করে প্রতিশোধ নেবার সামান্যতম ব্যবস্থাও করলেন না। করুণায় হৃদয় বরং বিগলিত হলো। মায়ায় প্রান ভরে গেল। তাই আবু-সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"আবু-সুফিয়ান! এখনও কি তোমার ভুল ভাঙ্গবে না? এখনও কি তুমি আমাকে আল্লাহর রসুল বলে স্বীকার করবে না? এখনও কি দেব-দেবীদের সত্য বলে বিশ্বাস করবে?"[৩]

আবু-সুফিয়ান জড়-সড় হ'য়ে উত্তর দিল–"কিছুদিন যাবৎ এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে। দেব-দেবীকে কি ক'রে আর সত্য বলি? তারা সত্য হলে নিশ্চয়ই—এ বিপদে আমাদের সাহায্য করত।"

আবু-সুফিয়ানের মুখ থেকে এ কথা শুনে রসুলের (দঃ) আনন্দ হলো। খুশিতে হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠল। তিনি বললেনঃ-

"তবে দেরি কেন? এখনি বল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর -রসুলুল্লাহ।"

আবু -সুফিয়ান বাধ্য হলো ঃ- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহা মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।"[৪]

হযরত তাঁর পবিত্র বুকে আবু- সুফিয়ানকে তুলে নিলেন। প্রকৃতির কি লীলা! আল্লাহর কি খেলা! হযরত ওমর মুহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করতে গিয়ে তাঁর পাষাণ হৃদয়কে হত্যা করলেন। দৌড়ে গিয়ে হযরতের কাছে অপরাধী বলে স্বীকার করলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে মুখে আনলেনঃ-'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু -মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।'

একই ঘটনা ঘটল আবু-সুফিয়ানের ব্যাপারে। এ দু-জনই ছিলেন প্রতাপশালী কোরেশ দল নেতা। এঁদের দু-জনের ইসলাম গ্রহণের অর্থ বিজয়। চলুন, দেখি এর পরের ঘটনা কি? 'ফ্যাৎহুম-মুবিন—অর্থাৎ 'মহাবিজয়'–আল্লাহর এ ঘোষণা কোনটি?

আবু-সুফিয়ানের হৃদয়ের আগুন নিভে গেল। জ্বালার উপশম হলো। শান্ত হলো দেহ-মন। অন্তরে এলো করুণার আলো। তাই হযরতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, নম্রতা ও ভদ্রতার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"মুহাম্মদ! তুমি কি কোরেশদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে? তোমার অনুগ্রহ না হলে তোমারই স্বজাতি ও আপনজনেরা যে ধূলিস্যাৎ হবে।"[৫]

কোমল চিত্তের মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি কঠোর নন। বিদ্বেষী নন। জুলুমকারী নন। অত্যাচারী নন। প্রতিশোধ গ্রহণ কারী নন। হিংসুক নন। স্বার্থের লোভী নন। তিনি যে আল্লাহর নবী। মানুষের নবী। সমগ্র-আরবের নবী। বিশ্ব জাহানের নবী। মিলনের দূত। শান্তির বাহক। আল্লাহ ও সৃষ্টজীবের প্রেমিক। আবু-জেহেল, আবু-সুফিয়ান, ওমর, অলীদ, ওৎবাকে-যারা তাঁকে হত্যার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল তাদের যদি ক্ষমা করতে পারেন তবে নিরপরাধ নরনারী কোরেশ বেদুইন পৌত্তলিকদের ক্ষমা না করার প্রশ্নই আসে না।

হযরতের আপন চাচা আব্বাসও ঠিক এই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন এবং রসুলের (দঃ) হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি মনে প্রাণে রসুলকে

www.pathagar.com

(দঃ) আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করলেও বাহ্যত্ব ইসলাম গ্রহন করেন নি। সমাজের ভয়ে অথবা নিজ বংশকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে। বাস্তবেও আমরা তাই দেখেছি। মুহাম্মদকে (দঃ) যারা অত্যাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সাবধান করে দিয়েছেন। অনেক সময় প্রতিশোধ নিয়েছেন। আজ সেই আপনজন, তাঁরই হিতাকাঙ্খী, তাঁরই রক্ষক, বিপদের সাথী আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর চাইতে আনন্দ রসুলের (দঃ) আর কি হতে পারে?

হযরত আব্বাস (রাঃ)–আবু-সুফিয়ানের মার্জিত বক্তব্য শুনে রসুলুল্লাহকে (দঃ) বললেন, "আবু-সুফিয়ান এতদিন ছিলেন কোরেশদলের প্রভাবশালী একজন নেতা। আরবের মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব। মুহাম্মদ তুমি আজ তাকে অনুগ্রহ দেখাও। নতুবা তার মর্যাদা থাকে না।"

রসুলুল্লাহ (দঃ)–"নিশ্চয়ই আমি তাকে সে মর্যাদা দেব।" এরপর আবু-সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"তুমি মক্কায়-ফিরে গিয়ে ঘোষণা করে দাও, যারা আবু-সুফিয়ানের নাম করবে অথবা তার গৃহে আশ্রয় নেবে তাদের কোন ভয় নেই। এছাড়া যারা নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকবে অথবা কাবা-গৃহের শরণ নেবে তাদের আজ-আমি কিছু বলব না।"[৬]

আনন্দে আবু-সুফিয়ানের হৃদয় দুলে উঠল। মুহাম্মদ -যাকে এতদিন শত্রু ভেবেছে সে এত মহৎ, এত উদার, এত করুণাশীল। কথাগুলো চিন্তা করে অনুতপ্ত হলো। নিজের ভুল নিজের চোখে ধরা পড়ে লজ্জিত হলো। অপরাধী হয়ে বিনাশর্তে মুক্তি পাবার আনন্দ, কোরেশ দলপতি হয়েই অবিশ্বাসী কোরেশদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার শক্তি কি করে তার ভাগ্যে জুটল সে নিজেও বুঝতে পারল না। তাই আনন্দ চিত্তে দৃঢ় সংকল্প করল মক্কায় গিয়ে মুহাম্মদের উদারতার কথা প্রাণঢেলে ঘোষণা করবে। করলও ঠিক তাই। মক্কায় গিয়ে কোরেশদের সম্বোধন করে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল ঃ

"হে মক্কাবাসী কোরেশগণ শোন। মুহাম্মদ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের দুয়ারে দণ্ডায়মান। আজ আর কারো নিস্তার নেই। যে কেহ কাবা-গৃহে অথবা আমার গৃহে আশ্রয় নেবে অথবা নিজগৃহে আবদ্ধ থাকবে সেই আজ নিরাপদ। জেনে রেখো আমি আর তোমাদের দলপতি নই। আমি এখন মুসলমান।"[৭]

ভয়-ভীতি ও আতঙ্কে কোরেশ নরনারী ছুটাছুটি করতে লাগল। জীবন রক্ষার আশায় কেউ কাবা-ঘরে, কেউ আবু-সুফিয়ানের ঘরে, কেউবা নিজের ঘরেই দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিল।

রাত্রির অবসানে, ঊষার আলোকে বীর সেনানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। বিভিন্ন দলে দলভুক্ত হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে মক্কা প্রবেশের আদেশ দিলেন। তৌহিদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে আন্দ-উল্লাসের ধ্বনিতে দলে দলে দশ হাজার সৈন্য চলল মক্কার দিকে। হযরত (দঃ) থাকলেন দলের অগ্রে নয় সবার পিছনে। একটি উটের পিঠে। ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র ওসামার সঙ্গে। ভয়ে নয়। ভীতিতে নয়, প্রান বাঁচানোর ইচ্ছাতেও নয়। সাম্যের এক মহান আদর্শ-বিশ্বের বুকে তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

মক্কা-পবিত্র মক্কায় বীর-বিক্রমে ঢুকে পড়ল সেনাদল। বাধা দেবার কেউ নেই। শূন্য নগরী। হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেনাদলকে। অভ্যর্থনা জানাচ্ছে মুহাম্মদকে (দঃ)। কি আনন্দ! কি উল্লাস! কি বিজয়ের ধ্বনি!

www.pathagar.com

যে মক্কার কোল ছেড়ে একদিন হয়রতকে (দঃ) বিদায় নিতে হয়েছিল প্রানের আবেগে, ব্যথায় ও বুকভরা বেদনায় যার জন্য অশ্রুভরা আখিতে বলেছিলেনঃ-

"হে মক্কা! তোমায় না আমি কতই ভালবাসি। সমগ্র বিশ্বের চেয়ে তোমাকে আমি অধিক ভালবাসি। যদি এরা আমাকে না তাড়াতো তাহলে আমি কিছুতেই তোমায় ছেড়ে যেতাম না।"–সেই মক্কা আজ মায়ের মত বুকেটেনে নিচ্ছে। প্রেমের ডোরে তাঁকে বাঁধছে। মায়ার বন্ধনে আবেষ্টন করছে। কৃতজ্ঞাতায় ভরে উঠ্‌ল হযরতের হৃদয়। দু-হাত তুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে করলেন শুকরিয়া আদায়।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)–শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন কাবা-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে। রসুলুল্লাহ (দঃ) সহচরদের নিয়ে ঢুক্‌লেন এ পবিত্র প্রাঙ্গনে তওয়াফ করলেন আল্লাহর ঘর আনন্দে ও ভক্তিতে। যে সব কোরেশ নর-নারী এ গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে, তাদের শরীর কেঁপে উঠ্‌ল। ভয়-ভীতিতে অনেকেই জ্ঞান হারা হলো। তাদের ধারণা মুহাম্মদ (দঃ) আজ কাউকেই রেহাই দেবে না। প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। অপরাধের অন্তর জ্বালায় তারা তাই জ্বলে পুড়ে মরছিল। কিন্তু দেখল এর বিপরীত। সবার কণ্ঠে–"লাব্বায়েক। আল্লাহুমা লাব্বায়েক। লাব্বায়েকা লা-শরিকা লাকা-লাব্বায়েক। ইন্নাল হামদা আন-নিয়ামাতালাকা আলমুলক। লা-শরিকালাকা।" অর্থাৎ,

"আমি তোমার সম্মুখে হাজির! হে আল্লাহ, -আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি তোমারই ডাকে সাড়া দিয়েছি। তোমার কোন অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা ও সম্পদরাজী তোমার এবং সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্য তোমার, বান্দা হাজির।"

হত্যা নয় জুলুম নয়, পাশবিকতা নয়, হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়। প্রতিশোধেরও নির্দেশ নয়। বিনা রক্তপাতে, বিনা-যুদ্ধে তিনি হলেন জয়ী। মহাবিজয়ী! দশজাহার সৈন্যের বাহিনী মক্কা-নগরের দশ জন কোরেশ কাফেরকেও হত্যা করল না। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল না। নারীর ইজ্জত নিয়েও ছিনি মিনি খেলল না। বন্দী করেও হাজতে পাঠাল না। দয়ালু মুহাম্মদ (দঃ) অভিযানের পূর্বেই তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শান্তিতে অভিযান চালাতে। নৃশংশতা ও বর্বতার হাত থেকে সরে থাকতে। রক্তের খেলা হতে নিজেদের মুক্ত করতে। তাই শঙ্কিত হলেও কোরেশদের নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকা দূর হলো। আনন্দের আতিশয্যে কাবায় আশ্রিত ও ঘরে বদ্ধ কোরেশ নরনারী হযরতের সহচরদের সঙ্গেই যোগ দিল, কণ্ঠে নিল-'আল্লাহু-আকবর'-ধ্বনি–যে ধ্বনিতে দশ হাজার বীর সেনানী আকাশ-বাতাস, সাগর-মরু, পাহাড়-পর্বত কাঁপিয়ে তুলল।

ঠিক সে সময় নামাজের সময় হলো। বেলালের সুমধুর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে সবাই কাবা প্রাঙ্গনে সমবেত হলো। হযরত তাদের ইমাম হয়ে নামাজ শেষ করলেন। সাম্য, শান্তি ও হযরতের (দঃ) প্রতি অসীম শ্রদ্ধা দেখে কোরেশগণ মুগ্ধ হলো। এমন দৃশ্য জীবনে তারা দেখে নি। তাদের প্রাণেও এলো রসুলের (দঃ) প্রতি চরম বিশ্বাস ও ভক্তি। তিনি নমাজ শেষে দেখলেন আশ্রিত নরনারী অবাক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কি যেন বলবে। কি যেন আশা করে তাঁর নিকট হতে। হযরত করুণ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলেন–"হে কোরেশগণ! বল, আজ তোমরা কি ভাবছ? সমবেত কণ্ঠে সবাই উত্তর দিল–"ভাবছি আমাদের অদৃষ্টের কথা। দীর্ঘদিন ধরে আমরা তোমার প্রতি যে অত্যাচার করেছি তার কি কি শাস্তি দেবে তাই ভাবছি।"৮

www.pathagar.com

বিজাতী হোক, স্বজাতি হোক, –এরাতো সবাই তাঁর আপন। সবাই একই মাটিতে জন্মলাভ করেছে। একই আবহাওয়ায় এই মরুর বুকে লালিত পালিত হয়েছে। এরাতো মানুষ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তারা ঘৃণিত নয়। হযরতের হৃদয় তাই বিগলিত হলো। বললেন-

"আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নেই। তোমাদের সব অভিযোগ, সব ত্রুটি মাফ করলাম। **যাও, তোমরা আজ থেকে মুক্ত।**" বিশ্বের রাষ্ট্রপতিরা দেখুন। এমন করুণা, এমন দয়া, এমন মায়া শত্রুদের প্রতি কে দেখিয়েছে? এমন ইতিহাস কে রচনা করে বিশ্বের অমর হয়ে আছেন? নিজ স্বার্থে কি তারা না করছেন? অতীতের ইতিহাস টেনে লাভ নেই। এই কয়েক মাস পূর্বে স্বার্থবাদী, বর্বর আমেরিকানরা ইরাকের উপর কি হামলাই না চালালো। হাজার হাজার বার বোম্বিং করে সম্পদ ধ্বংস করল। অগণিত নর-নারীর জীবন নাশ করল। অত্যাচার, অবিচার, পাশবিকতা ও হিংস্রতার পরিচয় দিয়ে রেকর্ড ভঙ্গ করল। লাভ হয়েছে কি? এই বর্বর জাতি ১৯৪৫ সনে একই কারণে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাশাকির বুকে এটম বোমের আঘাতে এক নিমেষেই কিয়ামত ডেকে আনল।

কুখ্যাত ইয়াহিয়া মুসলমানের সিল বুকে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী নর-নারী মুসলমান এর উপর যে তাণ্ডবলীলা দেখালো তারও ইতিহাস লেখা থাকবে যুগ যুগ ধরে। এরা বেইমান এরা শয়তান। এরা কারুণ ফেরাউন, আদ-সামূদ, নাদির, চেঙ্গিস-খাঁ, হালাকু খাঁ ও হিটলারে বিষাক্ত রক্তের বংশধর। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য যারা অন্যের সর্বনাশ করে তারা পশু, তারা নরাধম।

'যাও, তোমরা আজ থেকে মুক্ত'–হযরতের এ আশ্বাস বাণী দেহ-মনকে পুলকিত করল। ষাট হাজার আরববাসীর মুখে এনে দিল মুক্তির বাণী ঃ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।" কোরআনের–**'ফাৎহু-মোবিন'**–এর অর্থ (মহাবিজয়) আজ পূর্ণ হলো। সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বের দেবের বাণী–**'দশ হাজার সৈন্য নিয়ে (মুহাম্মদ) খ্যাতি অর্জন করেছেন।'**–কথাটিও সার্থক হলো।

স্বার্থক হলো অথর্ব বেদের বাণীঃ-

"ঊর্দ্ধোনু স্রষ্টা ৩ স্তির্যঙ্ সৃষ্টা ৩ সর্বাদিশঃ পুরুষ আবির্ভূবা। ৩ পুত্রং যো ব্রহ্মাণো বেদ যস্যা পুরুষ উচ্যনে ।। ২৮ ।।

"ইহা (এই ঘর) উচ্চ করিয়া নির্মিত হউক বা না হউক, ইহার দেওয়াল সোজা হউক বা না হউক, ইহার প্রতি কোনেই খোদার নিদর্শন হয়। যে ব্যক্তি খোদার এই ঘর চিনিয়া লয়, –সে ঠিকই চিনিয়া লয়, কারণ সেখানে খোদাকেই স্মরণ করা হয়।"

পবিত্র কাবা ঘরের যে বর্ণনা বেদে বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক। এ কাবা পৃথিবীর কোন সুরম্য হর্ম্ম বা সুশোভিত ও নয়ন অভিরাম তাজমহল নয়। চক্ষু ঝলসানো প্রাসাদও নয়–নিজের নমুনা নিজেই। এর দেওয়ালও সমান্তরাল নয়। একটির দৈর্ঘ ৩০ ফুট অপরটির ২৮ ফুট। প্রস্থ একটির ২৬ ফুট অপরটির মাত্র ২৪ ফুট। স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত নয়। সাধারণ প্রস্তর নির্মিত একটি গৃহ। চারি দেওয়ালের গৃহ বলে এর নাম কাবা। অপরদিকে বিশ্লেষণ করলে দাড়ায় 'কা+আবা'-কাবা। অর্থাৎ গৌরবান্বিত বা অপরূপ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। অপর নাম 'বায়তুল্লাহ'-অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। বেদে ঠিক এই কথাই শেষ লাইনে বলা হয়েছে। এর উপর ইন্‌শা আল্লাহ পরবর্তী পুস্তকে **'হজ্বে মক্কা মদিনা'**–(যা এখনও আরম্ভ করি নি দোয়া প্রার্থী)-বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করব (আমিন)।

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়

মক্কা ও কাবা–দুটি শব্দই আকর্ষণীয়। দুটি শব্দের মধ্যেই রয়েছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মুক্তির আস্বাদ। এ নাম দুটি উচ্চারণ করলেই যেন মন পবিত্র হয়। এর দর্শন লাভ করলেই অন্তর পুলোকিত হয়। জীবনের পাহাড় সম পাপরাশি নির্মূল হয়। স্বর্গের জ্যোতিঃ হৃদয় স্পর্শ করে একে আলোকিত করে। দু-হাতের প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে পাপ মুক্ত করে। বেহেশতের অঙ্গীকার দিয়ে পরকালের কঠিন শাস্তির চিন্তা হতে মুক্ত করে। একথাও ধর্মগ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে। অথর্ব বেদের ২৯ ও ৩০ নং ছত্রে এর উল্লেখ আছে। বিষয়টি পাঠক বৃন্দের জন্য তুলে ধরতে বাধ্য হলাম।

(১) "যে ব্যক্তি আল্লাহর এই পবিত্র-গৃহ চিনিয়া লয়–যে গৃহ জীবন্ত– আল্লাহ এবং ব্রহ্ম তাহাকে দিব্য চক্ষু, মুক্তি ও সন্তানাদি দ্বারা আশীর্বাদ করেন।" ।। ২৯।।

(২) "যে এই পবিত্র-গৃহ চিনিতে পারে, তাহার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ও দিব্যজ্ঞান তাহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করে না।" ।। ৩০।।

এবার দেখি কোরআনে আল্লাহ পাক কি বলেছেন ঃ—(১) "এবং যখন আমি কাবা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম করিয়াছিলাম, এবং মোকামে এব্রাহিমকে প্রার্থনা স্থল নির্ধারণ করিয়াছিলাম। এবং ইব্রাহিম ও ইসমাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে,–তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফ-কারী ও এতেকাফকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।" (২ঃ ১২৫)

(২) নিশ্চয় মানবমণ্ডলীর জন্য যে আদি-গৃহ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল তাহা **মক্কার অন্তর্ভুক্ত, উহা সৌভাগ্যযুক্ত এবং বিশ্বগজগতের পথ-প্রদর্শক। তন্মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ মোকামে এবরাহিম অবস্থিত, এবং যে উহার মধ্যে প্রবেশ করে সে শান্তিপ্রাপ্ত হয়** এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহে হজ্ব করা সেই সকল মানুষের কর্তব্য যাহারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ।" (৩ ঃ ৯৬)

কোরেশদের শান্তনার বাণী দিয়ে হযরত ঢুকলেন কাবা ঘরে। এ গৃহের বৈশিষ্ট্য কি , গুরুত্ব কি তার পরিচয় তুলে ধরতেই ধর্মগ্রন্থ সমূহের সাহায্য নিয়েছিলাম। শুধু কোরআনের বাণী তুলে ধরলে হিন্দু-খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ও পৌত্তলিক সম্প্রদায় বিশ্বাস করবে না। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন জেরুজালেম ও অন্যান্য উপাসনাগার এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে কাবার গুরুত্বকে খাটো করবে।

ধর্মগ্রন্থসমূহের উদ্ধৃত বাণীর সারাংশ হতে আমরা দেখলাম–বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র এ কাবা। স্বর্গের নিদর্শন -এ কাবা। মহামিলনের কেন্দ্রস্থল –এ কাবা। প্রার্থনার সন্ধিস্থল এ কাবা। মানব জাতির পিতা ইব্রাহিমের (আঃ)–আবাসস্থল এ কাবা। প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষেরই আকর্ষণীয় ও বরণীয় এ কাবা।

এ পবিত্র কাবা-ঘরেই ছিল ৩৬০ টি পাষাণ মূর্তি। হোবল-লাত দেবতা মোকামে ইব্রাহিমের (আঃ) স্থান দখল করে গৌরবে পৌত্তলিক ও কোরেশদের উপর হাজার হাজার বছর আধিপত্য বিস্তার করে আসছিল। এদের করেছিল বাধ্য ও অনুগত। শয়তান দেবতাদের গলায় মালা দিয়ে দূর থেকে হাসছিল।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ওমরকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেন এদের মাথায় কুঠারাঘাত করতে। খণ্ড-বিখণ্ড করে বালির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে এদের নিশ্চিহ্ন করতে। রসুলের (দঃ) –হৃদয় এবার করুণায় বিগলিত হলো না। মায়ার স্পর্শে প্রাণ

www.pathagar.com

উথলিয়ে উঠল না। কোমলতার হৃদয়ে কোরেশদের যেমন মধুর স্বরে শান্তনা দিলেন, ঠিক তেমনি কঠোর হৃদয়ে এ দেবতা ও পাষাণ প্রতিমাদের ধ্বংসের নির্দেশ দিলেন। 'লাত'-দেবতার আত্মগোপন করার সুযোগ মিলল না। পালাবার বুদ্ধি মাথায় জুট্‌ল না। পাষাণ দেবতা জড়-দেবতা হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

হযরত ওমর (রাঃ)– রসুলের নির্দেশ পালন করলেন। এদের মুণ্ডুচ্ছেদ করে কাবা ঘর থেকে বহিষ্কার করলেন। কেউ এ আঘাতে কাঁদল না চিৎকার করে কোরেশদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল না। নিজেরাই এরা প্রমাণ করল–আমরা পাষাণ। আমরা নকল দেবতা। আমরা অসত্যের প্রতীক। 'আমাদের কোন শক্তি নেই।' আমরাই সেই শয়তান ইবলিসের বন্ধু। মানুষকে বিভ্রান্ত করে নরকের পথে তুলে দেই।'

এবার অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস জন্মাল। চেতনা ফিরে এলো। দেবতার পরাজয়ে ব্যথিত হলো না। কেউ কাঁদল না। সাহায্য করতেও এলো না। বরং হতবাক হলো। মুহাম্মদ (দঃ) কে আল্লাহর নবী বলে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করল। দলে দলে **'আল্লাহু আকবর'**–ধ্বনি দিয়ে মুহাম্মদের (দঃ)-পবিত্র হাত ধরে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করল। কি অপূর্ব দৃশ্য! কি অপূর্ব বিজয়!

হযরতের (দঃ) অভিযান ছিল–সত্যের পক্ষে। অসত্যের বিপক্ষে। এ অভিযানে তিনি হলেন বিজয়ী। মহাবিজয়ী–যে ঘোষণা কোরআনে দেওয়া হয়েছিল–**'ফৎহ-মোবিন'**–বলে। আর তৌরাতে বলা হয়েছিল এই বলেঃ-

"এক বছর কাল মধ্যেই কেদরের'[১১] (কোরেশদের) সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে। আর কেদর বংশীয় বীরগণের অল্প ধনুর্দ্ধর অবশিষ্ট থাকিবে। কারণ সদাপ্রভু ইস্রাইলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন।"[১২]

আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো। আনন্দ চিত্তে উদাত্ত কণ্ঠে আল্লাহর বাণীই সমবেত জনতাকে শুনিয়ে বললেনঃ-

"সত্য আগমন করিল ও অসত্য অন্তর্হিত হইল।"[১৩]

উদার দৃষ্টিতে, মায়ার টানে, প্রেমের আকর্ষণে, ভালবাসার নিদর্শনে তিনি যে ইতিহাস রচনা করলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে চিরদিন। নির্যাতন সহ্য করে, শত্রুকে ক্ষমা করে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে, কাবাকে চিরমুক্ত করে–বিশ্ব মানবকে যে পথ দেখালেন–তা আলোর পথ, মুক্তির পথ। মহান আদর্শের পথ। তাই চলুন, কৃতজ্ঞ ভরে এ রসুলের (দঃ) প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সালাম জানিয়ে ও দরূদ পাঠ করে ধন্য হই।

"আচ্ছালাতো আস্-সালামো আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া হাবিবুল্লাহ। আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া খাতেমুন নাবেইন আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া-রহমতুল্লিল আলামীন।'

টীকা ঃ ১-৯। কোটেশনগুলো-বিশ্ববানবী' কৃত গোলাম মোস্তাফা হতে সংগৃহীত।

১০। কোরআন সূরা বনি ইসরাইল। আয়াত -৮১।

১১। কেদর-অর্থ কোরেশ। বাইবেলের ভাষায়।

১২। বাইবেল। যিশাইর পরিচ্ছেদ। ২১/১৬-১৭

www.pathagar.com

বিদায় হজের বিদায় বাণী

দশম হিজরী শেষ। জিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখ। হযরত যাচ্ছেন হজ্ব যাত্রায়। কি আনন্দ তাঁর মনে! কি উল্লাস তাঁর হৃদয়ে! এ আনন্দের শরীক হলো লক্ষ লক্ষ মুমেন মুসলিম নর-নারী। কি অপূর্ব এ দৃশ্য! দুঃখের অশ্রুতে যে বক্ষ সিক্ত করে একদিন তাঁকে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছিল–আনন্দের বন্যায় বুক ভাসিয়ে বিজয়ীর বেশে সেই মক্কার দিকেই তিনি আবার চল্‌লেন। তৌহিদের কল্লোল ধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। সাম্যের জয়গানে নেচে উঠল বিশ্বের দিগ্‌-দিগন্ত। সফলতার জয়ধ্বনিতে হেসে উঠল তপ্ত মরুর বিশাল বক্ষ।

মানুষে মানুষে আজ ভেদাভেদ নেই। নারী পুরুষে পার্থক্য নেই। ধনী-গরীবে প্রভেদ নেই। ইতর-ভদ্র, বাদশা-গোলাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মুখে একই সুর, একই বাণী, একই ধ্বনি–'লাব্বায়কা! 'লাব্বায়কা! মুক্তির নেশায় একই আশা ভরসা নিয়ে চলল তারা কাবার দিকে।

পাঁচই জেলহজ। হজরত মক্কায় প্রবেশ করলেন। মাতৃভূমির মায়ার ক্রোড়ে বক্ষ রেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। –বল্‌লেন,

"হে মক্কা! নগরী সমূহের মধ্যে তুমি কত উৎকৃষ্ট এবং আমার কাছে কতই না প্রিয়! যদি আমার কওম আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত তবে কিছুতেই আমি অন্যত্র বাস করতাম না।" (তিরমিজি)।

সম্মুখেই দেখ্‌তে পেলেন যুগ-যুগের ঐতিহ্যবাহী ঐ কাবা—প্রাণের কাবা! আনন্দে হৃদয় মন উথলে উঠল। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে হাত তুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলেন–

"হে আল্লাহ! তুমি এই কাবাকে চিরকল্যাণ ও চির শান্তির আবাসে পরিণত কর। যারাই এখানে হজব্রত পালন করতে আসবে তাদের তুমি অপার শান্তি ও মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি ক'রো।"

অতঃপর হযরত কাবা গৃহে পৌঁছিলেন। এর স্তম্ভকে চুম্বন করে সাত বার কাবার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন তারপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমের নিকট অগ্রসর হলেন। কাবা ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তীস্থলে দু-রাকাত নামাজ আদায় করে সাফার নিকটবর্তী হলেন এবং পাঠ করলেন,

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন গুলোর অন্তর্ভূক্ত।"

হজের দিন আসল। বিপুল সমারোহে লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনতার সঙ্গে তিনি হজব্রত পালন করলেন। কাবা আজ মুক্ত! কাবা আজ -মুখরিত। মূর্তি নেই; পাষাণ প্রতিমা নেই। লাত দেবতার শেষ চিহ্নটুকুও আর নেই। আছে শুধু তৌহিদবাদ, আছে আল্লাহর রসুল, আছে তাঁর প্রিয় উম্মত। এ যেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক মিলন কেন্দ্র, সাম্যবাদের এক মহামিলন স্থান, দুনিয়ার এক অপূর্ব বেহেশত।

মিনার পাহাড় থেকে হযরত চললেন আরাফাতের ময়দানে। 'কাসাওয়ার'–পৃষ্ঠ হতে তিনি অবতরণ করলেন এবং উপত্যকার পাদদেশে উপস্থিত হলেন। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বিদায় সায়াহ্নে হযরত তাঁর বিদায় বাণী দিলেনঃ-

www.pathagar.com

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি একক। কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সমগ্র বাতিল শক্তিকে পরাভূত করিয়া তাঁহার একক শক্তিরই প্রমাণ করিয়াছেন।

ওহে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা শোন আমি জানি না যে ইহার পরে আবার আমরা এইভাবে কোন মজলিসে একত্র হইতে পারিব কি না। (এবং হয়ত এবারে এই হজের পরে পুনরায় হজ আদায় করিতে পারিব কিনা।)

ওহে মানব সম্প্রদায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছি। এবং তোমাদিগকে সমাজ ও বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা পৃথক ভাবে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশি ভয় করিয়া চলে এবং তাঁহার কথা বেশি স্মরণ করে। সুতরাং কোন আরববাসী অন্য কোন অনারব বা আজমী লোকের তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহে। পক্ষান্তরে কোন অনারব বা আজমী ব্যক্তিও তদ্রূপ আরববাসী কোন লোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও শ্বেতকায় কোন লোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। হাঁ– মর্যাদা ও সম্মানের যদি কোন মাপকাঠি থাকে তবে উঁহা একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারী। সমগ্র মানবজাতি এক আদমেরই সন্তান এবং আদমের প্রকৃত স্বরূপত ইহাই যে তাঁহাকে মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে। এক্ষণে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবী, রক্ত ও বিত্ত-সম্পত্তির সকল দাবী ও সকল প্রতিশোধ আমার পদতলে স্থাপন করা হইল। কাবার হেফাজত ও হাজীগণের পানি পান করানোর ব্যবস্থা পূর্ববৎ বহাল রইল।

ওহে কোরাইশ মণ্ডলী! এমন দশা যেন না হয়–তোমরা যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে তখন ত তোমাদের ঘাড়ে দুনিয়ার বোঝা চাপান থাকিবে, আর, অন্যলোকজন আখেরাতের সম্বল লইয়া উপস্থিত হইবে। অবস্থা যদি সত্যই তেমনি দাঁড়ায় তবে আমি তোমাদের কোনই কাজে লাগিতে পারিব না।

হে কোরাইশগণ! আল্লাহ্ তোমাদের মিথ্যা অহঙ্কার ও অহমিকা নির্মূল করিয়া দিলেন। যেন বাপ-দাদার কীর্তি কাহিনী লইয়া গর্ব অহঙ্কারের কোন অবকাশ রহিল না। হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের অদ্যকার এই পবিত্র দিনের মত এই পবিত্র মাসের মত এবং এই পবিত্র শহরের মত—তোমাদের পরস্পরের রক্ত ও ধন-সম্পত্তি পরস্পরের জন্য হারাম।

তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে এবং তিনি তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

মনে রাখিও, আমি তোমাদিগকে যাহা বলার সব-কিছুই বলিয়া দিয়াছি। খবরদার! আমার পরে যেন পথভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর মারামারি ও হানাহানি আরম্ভ করিয়া না দাও।

যদি কাহারো নিকট কিছু আমানত রাখা হয় তবে সেই আমানতী জিনিস –যে ব্যক্তি আমানত রাখিল তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া তাহারই কর্তব্য।

হে মানবমণ্ডলী! প্রতিটি মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই। নিজের দাস-দাসী সম্পর্কে তোমরা খেয়াল রাখিবে। উহাদিগকে তাহাই খাইতে দাও যাহা তোমরা খাও। তোমরা যাহা পরিধান কর তাহাদিগকেও তাহাই পরিধান করিতে দিবে।

জানিও অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আমার পদতলে দলিত ও মথিত হইল এবং

www.pathagar.com

অন্ধকার যুগের রক্তের দাবীও আজ হইতে চিরতরে রহিত হইল। এবং সর্বপ্রথম রক্তপাত আমাদের মধ্যে হারেছের পুত্র ইবনে রাবিয়ার হত্যা। উহার ক্ষতিপুরণ আমি রহিত করিয়া দিলাম। প্রতিশোধের প্রথম দাবী যাহা বাতিল করিলাম উহা আমার নিজ বংশের দাবী। অন্ধকার যুগের সুদপ্রথাও রহিত হইল। সর্বপ্রথমে আমি যে সুদ বাতিল করিলাম উহা আব্বাছ বিন আব্দুল মুত্তালিব বংশের প্রাপ্য সুদ এক্ষণে উহা খতম হইয়া গেল।

ওহে মানবগণ! মহামহিম আল্লাহ প্রত্যেকটি হকদারকে তাহার ন্যায্য অংশ বা অধিকার নিজেই দান করিয়াছেন। সুতরাং এখন কোন ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীর জন্য অছিহত প্রযোজ্য নহে।

সন্তান তাহারই নামে পরিচিত হইবে–যাহার শয্যায় সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। যাহার উপরে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হইবে তাহার শাস্তি প্রস্তরখণ্ড তাহাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর দরবারেই হইবে।

যে কেহ নিজ বংশ পরিচয় বদল করে কিংবা কোন গোলাম যদি নিজ মনিবের বদলে অপর কাহাকেও মনিবরূপে পরিচয় দেয় তবে তাহার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

কর্জ অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। ধার হিসাবে গৃহীত জিনিসপত্র দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। উপহারের বিনিময়ে দান করা দরকার। যদি কেহ কাহারো জামিনদার হয় তবে শর্ত পালন করিতেই হইবে।

কোন ভাই এর সন্তুষ্টি ব্যতীত তাহার নিকট হইতে কোন জিনিস গ্রহণ করা জায়েজ নহে। তবে সন্তুষ্ট চিত্তে যদি কিছু দান করা হয় সে কথা আলাদা। তোমরা নিজেদের উপরে জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত হইও না।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহার কোন জিনিস অন্য কাহাকেও দেওয়া জায়েজ নহে।

ওহে মানব সম্প্রদায়! রমণীদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহর যামিন গ্রহন করিয়াছ এবং আল্লাহর বাণীদ্বারা তাহাদের দেহকে তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছ। তোমাদের প্রতি তাহাদের কর্তব্য এই যে তাহারা তোমাদের শয্যায় এমন কাহাকেও স্থান দেবে না যাহা তোমরা অপছন্দ কর। যদি তাহারা এরূপ করে তবে তাহাদিগকে প্রহার কর তবে বিষমভাবে নহে। এবং তোমাদের প্রতি কর্তব্য এই যে তোমরা ন্যায্য ভাবে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিবে। তাহাদের সহিত তোমরা সদ্ব্যবহার কর। কারণ তাহারা যে তোমাদেরই অনুগত। নিজেদের জন্য তাহারা কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখিবে। আমার কথা তোমরা উত্তমরূপে বুঝিয়া লও। আমি তাবলিগের হক আদায় করিয়াছি।

আমি তোমাদের জন্য এমনই একটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি যেন তোমরা গোমরাহ না হও–অবশ্য যদি তোমরা উহার উপর কায়েম থাকে। উহা আল্লাহর কিতাব। হাঁ, দেখ তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিবে না। কারণ তোমাদের পূর্বেও লোকজন এই সকল কারণেই নির্মূল হইয়াছে।

www.pathagar.com

এক্ষণে শয়তানের জন্য এমন আশাও রহিল না যে এই নগরীতে উহার ইবাদত করা হইবে। তবে এমন আশংকা অবশ্যই রহিয়াছে যে সকল বিষয়ে তোমরা তেমন কোন গুরুত্ব দাও না–কেবল সে ক্ষেত্রেই উহার কথা মান্য করা হইবে। সে ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবে। সুতরাং তাহার কবল হইতে তোমরা নিজেদের ঈমানকে হেফাজত করিবে।

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজেদের পালনকর্তার ইবাদত কর। পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় কর। একটি মাস রোজা রাখ। নিজেদের ধন-সম্পত্তির জাকাত সন্তুষ্টচিত্তে দিতে থাক। নিজ মাবুদের ঘরে হজব্রত পালন কর। নিজেদের ব্যবস্থাপকগণের কথা মান্য কর–তবেই না তোমরা মাবুদের জান্নাতে দাখিল হইবে।

এক্ষণে অপারাধী তার নিজ অপরাধের জন্যই দায়ী হইবে। এক্ষণে পিতার বদলে পুত্রকে পাকড়াও করা হইবে না কিংবা পুত্রের জন্য পিতাকে দায়ী করা হইবে না।

শোন এখানে যাহারা উপস্থিত রহিয়াছ তাহাদের কর্তব্য ঃ এই নির্দেশ ও বাণীসমূহ তাহাদিগকে পৌঁছিয়ে দাও যাহারা এখানে উপস্থিত নাই। হয়ত অনুপস্থিত লোকদের মধ্যেই কেহ তোমাদের তুলনায় ইহা উত্তমরূপে বুঝিবে এবং পালন করিতে যত্নবান হইবে।

ওহে মানবগণ! তোমাদিগকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। বল, তোমরা আমার সম্পর্কে কি উত্তর দিবে?

সমবেত জনতা উত্তর দিল ঃ আমরা এই সাক্ষ্য দিব যে আপনি আমানত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আপনি রেসালতের হক আদায় করিয়াছেন আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া হুজুর সাল্লেল্লাহু আলাইহে আস-সাল্লাম স্বীয় শাহাদত আঙ্গুলী আসমানের দিকে তুলিলেন এবং জনতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,

ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী হও। ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী হও। ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী হও।"

যে বাণী আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হলো যে বাণী অমর ও অক্ষয় হয়ে চিরদিন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রাণে জাগরুক থাকল, যে বাণীর গুণে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কলুষ কালিমার অবসান ঘটল–যে বাণী বিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর কাছে সাক্ষী হয়ে বিরাজমান রইল–সে বাণী বরণীয় ও গ্রহণীয় হয়েই থাকবে আমাদের প্রাণে। এ জগৎগুরুর– আকর্ষণীয় বাণী আমাদের হৃদয়কে শুধু আলোকিতই করল না –সারা বিশ্বমখলুকাতে এনে দিল সাম্যবাদ, ভ্রাতৃত্ব, উদারতা, ন্যায়-পরায়নতা, শৃঙ্খলা ও বিশ্বাস। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, মুক্তির পথে ও আল্লার পথে এ বাণী এক আলোক-উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, সুন্দুর ও সরলপথ। জীবন যাত্রার পথে এ বাণী কন্টকহীন, হিংসা-বিদ্বেষহীন, কপটতাহীন, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদহীন, ধনী-গরীবের পার্থক্যহীন এক পরম চিরসুখকর ব্যবস্থা। মুক্তি পেল দাস দাসী, মুক্তি পেল যুগ-যুগের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত নারী। রক্তপাত মদ খাওয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া এ বাণী করল হারাম জুলুম-অত্যাচার, অবিচার ও ব্যভিচারের মাথায় হানল কুঠারাঘাত।

www.pathagar.com

পড়ুন ঃ

বিশ্বজাহানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখকের আরও কয়েকখানি বই ঃ

১। **পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে** (যে বইট পৃথিবীর ৭০টি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিবিসি (লন্ডন) হতে লেখকের নাম প্রচারিত হয়েছে। ৫০ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে সপ্তম সংস্করন বের হয়েছে)– বাংলাদেশ আর প্রথম সংস্করণ কলকাতা হতে।

২। **বিজ্ঞান না কুরআন?**
(যে বইটি চিন্তা জগতে বিপ্লব এনেছে। লাইব্রেরী অফ আমেরিকায় স্থান লাভ করেছে। ইংরাজিতে অনুবাদ হয়েছে)

৩। **বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)**—সিরিজ (১ হতে ৪র্থ খণ্ড) (এতে রয়েছে রসুলুল্লাহর (দঃ) অমিয় বাণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ভারত থেকে যে বইটিকে কেন্দ্র করে লেখককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, অদৃশ্য বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ) রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে।

৭। **জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ)**
কোরআন-হাদিস, বেদ–বাইবেল জিন্দাবেস্তা ও বিশ্বমনীষীদের মন্তব্য নিয়ে রসুলের (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

৮। **পরী কথা বলে**। কল্পনার নাটক নয়। বাস্তব ও চমকপ্রদ সব ঘটনা। নারী-পুরুষ, সাংবাদিক সাহিত্যিক সবাইকে পরী কথায় ও সেবায় অবাক করে দিয়েছে। এতে আরও রয়েছে সোলায়মান (আঃ) ও বিলকিসের কাহিনী, হযরত ঈসা (আঃ) এর আশ্চর্য সব ঘটনা। রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি জ্বেন-পরীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা)

৯। **জাপানে যা দেখলাম**
(ভ্রমনকাহিনী। ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্যই রয়েছে প্রচুর খোরাক জানবার ও শিখবার)

১০। **ঝংকার**–(কবিতা। আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, ভক্তিমূলক ও কেনর জবাব কবিতা সমূহ যা সবাইকে চিন্তার খোরাক জোগায়।

১১। **রক্তের বদলে ঃ** (১৯৭১-এ সংঘটিত মুক্তি যুদ্ধের করুন ইতিহাস। এ ইতিহাস জানবার প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের) ভবিষ্যতে বংশধরদের জন্য সংরক্ষণ করুন।

১২। **তরঙ্গ ঃ** আধুনিক ও ইসলামিক গান

১৩। **মুক্তির পথ ঃ** বিভিন্ন জাতির জন্য। কোরআন হাদিস-বেদ বাইবেল অনুযায়ী।

১৪। **বেহেশত দোজখ**-পাপ পুণ্যের উপহার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com